গান্ধী ও মার্কস

কিশোরলাল মশরুওয়ালা

গান্ধী ও মার্কস

ভূমিকা

আচার্য বিনোবা ভাবে

গ্রন্থকার

কিশোরলাল মশরুওয়ালা

অনুবাদক

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন : ১৩৭৬

দাম : পাঁচ টাকা

[নব জীবন ট্রাষ্টের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত]

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে
প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস ১৫এ ক্ষুদিরাম
বোস রোড কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

যিনি গান্ধীজীকে চিনিয়েছিলেন,

আমাদের সেই সন্তোষদা (শ্রীকান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়)

শ্রদ্ধাস্পদেষু

উপক্রমণিকা

পরলোকগত কিশোরলালভাই অর্থাৎ শ্রীকিশোরলাল ঘনশ্যাম মশরু-ওয়ালাজীর জন্ম হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর এক সম্ভ্রান্ত গুজরাটি পরিবারে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর অসীম পাণ্ডিত্য, অপূর্ব কর্মনিষ্ঠা এবং অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের জন্য অত্যল্পকালের ভিতরই গান্ধীজীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। গান্ধীজী ও তাঁর কর্মসূচীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়তে থাকে এবং অবশেষে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনজীবীর ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরিভাবে দেশহিত-ব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কর্মী হয়ে পড়লেন।

একালে অজাতশত্রু ব্যক্তির বিরলসংখ্যক নিদর্শন খুঁজতে হলে প্রথমেই-কিশোরলালভাই-এর কথা মনে আসে। তাঁর চারিত্র-মাধুর্যের জন্য আদর্শ-গত কারণে তাঁর তীব্রতম বিরোধীরাও তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত মিত্রতার গৌরব লাভ করতেন। তাঁর এই রাগদ্বেষহীন স্বভাবের প্রভাব তাঁর রচনাবলীর ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। বহুদিন যাবত তিনি গান্ধীজী-প্রতিষ্ঠিত হরিজন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনার্থ মহাত্মাজীর নোয়াখালি পরিক্রমার সময় থেকে শুরু করে আমৃত্যু (১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর) তিনি হরিজন পত্রিকার সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব বহন করেন। এই সময়ের ভিতর যে অসংখ্য বিতর্কমূলক বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, তার কোন একটিতে কেউ কখনও ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষুন্ন হবার কারণ খুঁজে পান নি। সাংবাদিকতার এক সুমহান্ আদর্শ তিনি ভারত তথা বিশ্বের সামনে পেশ করেন।

জ্ঞান ও কর্মের অতি সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। একদিকে অনন্ত জ্ঞানতৃষ্ণা ও তার অনুসন্ধান এবং অন্যদিকে অবিশ্রান্ত কর্মযজ্ঞের আহ্বান তাঁর জীবনে মূর্ত হয়েছিল। বহুদিন যাবত তিনি গান্ধীজীর একান্তসচিব ছিলেন এবং গান্ধীজী যে কী কঠোর মনিব, তা সকলের জানা আছে। গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের সভাপতির গুরুদায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হয়। একাধিক গঠনমূলক কর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনের সময় তাঁকে কারাবরণ

করতে হয়। এরই ভিতর আবার তিনি হরিজন এবং গান্ধী সেবাসঙ্ঘের মুখপত্রের সম্পাদনা এবং "গান্ধী বিচার দোহন", "স্ত্রী পুরুষ মর্যাদা", "প্র্যাকটিক্যাল নন-ভায়লেন্স" ইত্যাদি বহু দর্শন, ধর্ম, শিক্ষা, সমাজসংস্কার এবং রাজনীতি-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে প্রায় ৪০ বছর যাবত তিনি প্রচণ্ড হাঁপানি রোগে ভুগছিলেন এবং তাঁর সাধারণ স্বাস্থ্যও অত্যন্ত দুর্বল ছিল।

শত কর্মব্যস্ততা এবং দুর্বল স্বাস্থ্য তাঁর মুখের হাসিটি কেড়ে নিতে পারে নি। তাঁর রসিক মনটির পরিচয় তাঁর সংস্পর্শে একবার যিনি এসেছেন, তিনিই পেয়েছেন। "আশ্রম কা উল্লু" ছদ্মনামে তিনি গান্ধী সেবাসঙ্ঘের মুখপত্রে নিয়মিত ভাবে যে রস-রচনা লিখতেন, তার উচ্চশ্রেণীর রসবোধের কথা তাঁর রচনাবলীর পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। প্রচণ্ড হাঁপানির আক্রমণে শয্যাশায়ী হয়েও তিনি রসিকতা করার কোন সুযোগ ছেড়ে দিতেন না। মৃত্যুকেও তিনি হাসিমুখে বরণ করেছিলেন।

গান্ধীজীর আদর্শ ও মতবাদের তিনি যে সঠিক ভাষ্যকার ছিলেন, এ কথা গান্ধীজী স্বয়ং স্বীকার করতেন। সুতরাং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁর এই শেষ গ্রন্থে তিনি যে যথোচিত দক্ষতা ও প্রামাণিকতার সঙ্গে গান্ধীজীর নীতি ও জীবনদর্শন উপস্থাপিত করেছেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মার্কসবাদকে তিনি যে রকম সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে পাঠকদের সামনে পেশ করেছেন, তাতে তিনি যে মার্কসবাদের প্রতি অবিচার করেন নি, এ কথা নিশ্চয় বলা চলে। বর্তমান ভারতে মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদের তুলনামূলক বিচার চিন্তাশীল ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে অতীব চিত্তাকর্ষক বিষয়। আশা করা যায়, এ অনুবাদ গ্রন্থখানি শিক্ষিত বাঙালী সমাজে উভয় মতবাদের অসম্পৃক্ত আলোচনার ভিত্তি বলে আদৃত হবে।

গ্রন্থটির ভূমিকা লেখক আচার্য বিনোবা ভাবে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ভূদান যজ্ঞের সূত্রপাত ও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর নৈতিক শক্তি ও আদর্শবাদের উত্তরাধিকারী এই ঋষিকল্প মনীষী ও কর্মযোগীর পরিচয় উত্তরোত্তর শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙলার সকলেই পাচ্ছেন।

অভিন্নহৃদয় সহকর্মী শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শক্রমে বইটির শেষে "মার্কসবাদের গতি-প্রকৃতি" শীর্ষক অধ্যায়টি আমি সংকলিত করেছি। মূল গ্রন্থে এটি নেই। মার্কসবাদীদের নিজেদের ভাষায় মার্কসবাদ সম্বন্ধে

জানতে এতে সহায়তা হবে বলে আশা করা যায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নির্মল-কুমার বসু মহাশয় এ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কল্যাণীয়া শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায় সমগ্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। গ্রন্থটির অংশবিশেষ মাসিক "কথা সাহিত্য" এবং "দৈনিক জন-সেবকের" কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

খাদিগ্রাম
পোঃ দাড়', মুঙ্গের।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

গান্ধী শতবার্ষিকীর বৎসরে বিশ্বের দুই মহামানবের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনার এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত পরিমার্জন ও সংস্কার করা ছাড়াও এতে তিনটি নূতন পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। এর প্রথমটি স্বয়ং গান্ধীজীর লেখা এবং পরলোকগত আর. কে. প্রভু কর্তৃক "কমিউনিজম অ্যাণ্ড কমিউনিস্টস" নামে ইংরাজীতে সঙ্কলিত। দ্বিতীয়টি আমার লেখা একটি মৌলিক প্রবন্ধ "মার্কস ও গান্ধী"। তৃতীয়টির লেখক কেরলের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শ্রীযুক্ত অচ্যুত মেনন। এই রচনাটি পাঠকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে। বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব ছাড়াও এটি এই সত্যের দ্যোতক যে মার্কসবাদী মহলে গান্ধীবাদের পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। শুধু যে ভারতেই এই পর্ব শুরু হয়েছে তা নয়—বিশ্বের তাবৎ দেশের যুক্তিশীল মার্কসবাদীরা গান্ধীজীর মত ও পথ সম্বন্ধে নূতন করে ভাবছেন। এইজন্য ভিয়েৎনামের নেতা সদ্য পরলোকগত হো-চি-মিন গান্ধীজীকে কেবল তাঁরই নয় সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুক্তি-যুদ্ধের গুরুর মর্যাদা দেন। মিখায়েল শোলোকভের মত মার্কসবাদী সাহিত্যিক ও মনীষী গান্ধীজীর চরখায় ভারতের বাঁচার মন্ত্র আবিষ্কার করেন। সোভিয়েট এনসাইক্লোপেডিয়াতে গান্ধীবিরোধী মন্তব্য প্রত্যাহার করে তাঁর যথার্থ মূল্যায়নের প্রয়াস হয়। এ জাতীয় উদাহরণের সংখ্যা আর না বাড়িয়ে মার্কসবাদীদের দ্বারা গান্ধীবাদের মূলতত্ত্ব নূতন করে আবিষ্কার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত হবে না যে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এবার হয়ত মানব-কল্যাণের জন্য উভয় মতবাদের মূলতত্ত্বের সিন্থেসিস বা সমন্বয় একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই গ্রন্থের প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক মহাশয় স্বয়ং গান্ধীপ্রেমী। তাঁর পরামর্শে বর্তমান সংস্করণে এই তিনটি নূতন পরিশিষ্ট যোগ করা হল। আশা করি এই রচনাগুলি পাঠকদের আলোচ্য বিষয় বুঝতে আরও সহায়তা করবে।

চারু-নীড়, কামডহরি
গড়িয়া, ২৪ পরগণা।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

॥ ১ ॥

বর্তমানের অখণ্ড মহিমা

সৃষ্টিকে তো চিরকালই অনাদি আখ্যা দেওয়া হয়, এমন কি আমাদের এই যে পৃথিবী, এও প্রাচীন শাস্ত্রী এবং আধুনিকপন্থীদের মতে দু কোটি বছরের পুরাতন। বলা হয়ে থাকে যে পৃথিবীতে প্রথমে প্রাণের কোন চিহ্ন ছিল না। এ ছিল সূর্যের মত এক জ্বলন্ত অগ্নিগোলক। ক্রমশঃ শীতল হতে হতে এই গ্রহ যখন জীবনধারণের উপযোগী হল, তখন জীবের সৃষ্টি হল। বৈজ্ঞানিকদের অভিমত এই যে, আমাদের এই মানব-জাতিরও ধরাপৃষ্ঠে পাঁচ দশ লক্ষ বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘকালব্যাপী মানব-জাতির প্রবাহে দু-দশ বছরের আর মূল্য কী? কিন্তু বিগত দুই শতাব্দী আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, আমার মনে হয়, মানব-সভ্যতার অর্ধেকের উপর ইতিহাস এই দুই শত বৎসরের কাহিনীতে পূর্ণ।

সর্বদাই বর্তমান কালের মহত্ত্ব থাকে। এ অতীতের ফল আর ভবিষ্যতের বীজ। দুই দিক থেকেই এর বৈশিষ্ট্য অদ্বিতীয় বলে প্রতীয়মান হয়। ভূত এবং ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে বিরাজিত হবার কারণে স্বভাবতই একে বিপ্লবের কাল মনে করা হয়। এ বিপ্লব কল্যাণজনক অথবা অকল্যাণকর—নবজীবনের সূচনাকারক ও বিকাশের বাহন অথবা তার বিনাশের কারণ—যে কোন কিছু হতে পারে। বর্তমান সময় সর্বদাই বিপ্লবলগ্ন বলে পরিগণিত হয়। শুধু তাই নয়, এ একেবারে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।' গত ষাট-পঁয়ষট্টি বছর ধরে প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে আসছে। কিন্তু তথাপি 'এবারের' কংগ্রেস বহু বিষয়ে অন্যান্য বারের চেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে মনে করা হয় না কী? এত দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। একটি ঘরোয়া উদাহরণই নিন না কেন! কোন মায়ের যখন ছেলে হয়, তখন তিনি কি এই কথা মনে করেন না যে, আর কোন মায়ের এবংবিধ সন্তানের মুখদর্শনের সৌভাগ্য হয় নি? এ ছাড়া অনেক মা এই মর্মে অনুরোধ করে থাকেন যে, আমার সন্তানের এমন একটি নাম দিন, যা ইতঃপূর্বে অপর কোন শিশুর হয় নি।

মূল কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমান কাল শুধু বিপ্লবের নয়, অপূর্ব বিপ্লবের

মহালগ্ন। জনৈক বন্ধু বলেন, "আমরা আপনার পুরোনো 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' বুলি শুনতে চাই না। এবার আমরা তিনবার 'ক্রান্তিঃ ক্রান্তিঃ ক্রান্তিঃ'-র (বিপ্লব ! বিপ্লব ! বিপ্লব !) উদ্‌ঘোষ করব।" আমি বললাম, "একবার ক্রান্তি বলাই তো যথেষ্ট। তিনবার এ ধ্বনি তুললে আপনারা যে মূল জায়গা থেকেই পিছনে হটে যাবেন। শান্তির কিন্তু এসব ভয় নেই। এ সদা-প্রাচীন। ক্রান্তি পুরানো হলে বাসি হয়ে যায়। এইজন্য তিনবার বলার কোন অর্থ হয় না। শুধু একবারই ক্রান্তি শব্দ উচ্চারণ করে আর এর নাম পর্যন্ত নেওয়া উচিত নয়।"

এ কালের মহত্ত্ব প্রাচীন কাল কোথা থেকে পাবে? একথা আলাদা যে ঐ প্রাচীনকাল যখন বর্তমান ছিল, তখন তারও অপূর্ব মহত্ত্ব ছিল। এর উপর আবার যদি বর্তমান কাল বা বর্তমান মুহূর্ত দুঃখের হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। দুঃখের নিশি শীঘ্র ভোর হয় না। দুঃখের একটিমাত্র কাহিনী একাধিক সুখস্মৃতিকে অবলুপ্ত করে মনোরাজ্যে বিজয়গর্বে কুচকাওয়াজ করে। সুখের গুরুতর প্রসঙ্গ বিস্মৃতির জঠরে নীরবে আত্মলোপ করে। দুঃখের প্রসঙ্গের বিস্মরণ হয় তখনই, যখন তার থেকেও অধিক দুঃখদ প্রসঙ্গের আবির্ভাব হয়। সুখের সাধ্য নেই যে দুঃখ দূর করে। পক্ষান্তরে অতীত সুখানুভূতির কারণে দুঃখবোধের তীব্রতা বাড়ে। দুঃখ দূরীভূত হতে পারে তীব্রতর দুঃখ দ্বারা। বিগত এক দেড় শতাব্দী আমাদের বর্তমান কাল। সুতরাং আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাল যে সমগ্র মানবেতিহাসকে গ্রাস করবে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

॥ ২ ॥

কারাগারের বিদ্যাপীঠ

এ যুগে এমন কী ঘটনা ঘটল যে, বর্তমান কালকে দুঃখের বলে বলতে হবে? সুখের উপচার বৃদ্ধি পেয়েছে। সুখের উপকরণের স্তূপ নির্মিত হয়েছে। এই ঘটনার জন্যই এত বেশী দুঃখ সৃষ্টি হয়েছে। সুখ এবং দুঃখকে পরস্পর-বিরোধী বলা হয়; কিন্তু আসলে এরা পরস্পরের জনক। সুখ, দুঃখ সৃষ্টি করে; আর দুঃখ থেকে জন্ম হয় সুখের। পুনর্জন্ম যখন হবে তখন হবে; কিন্তু এখন তো প্রথম জন্মোৎসবই চলছে! এই সুখের পশ্চাদ্ধাবন করে কি পরিমাণ বাধাবিপত্তি ও কষ্ট পেতে হচ্ছে! সুখের নামোচ্চারণ করা মাত্র

এর ভাগ-বাঁটোয়ারার এক বিরাট প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। দুঃখকে নিয়ে এমন কোন বিপদে পড়তে হয় না। ইচ্ছা করলে যে কেউ এর সবটা হজম করে দিতে পারে। এর দিকে কারও দৃষ্টি যায় না। কদাচিৎ কোন মহাত্মা বা কোন মহামূর্খের নজর যদি এদিকে যায়ও, তবে তাকে প্রচলিত বিধির ব্যতিক্রম মনে করতে হবে। "স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" এ-জাতীয় মহাপুরুষ দুর্লভ। আমাদের এই যুগ সুখের স্তূপ রচনা করে সেই বোঝার নীচে সমগ্র বিশ্বের জনসাধারণকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। চিনির বস্তা বলদের পিঠে চাপল আর মালিকের পেটে চলে গেল। মালিকের পেট এত চিনি খেয়ে খারাপ হল, আর এত চিনি বয়ে বলদের পিঠ ভাঙল। এত মিষ্টি যে এই চিনি, তা-ই এই ভেলকি দেখিয়ে দিল! সুখের বিভাজনকালে কেউ সিংহের কেউ বা শিয়ালের ভাগ চাইল, ভেড়া বেচারীর জন্য আর কিছু থাকল না। উলটে ঐ ভেড়াই বরং দুজনের ভাগে পড়ল। এই হচ্ছে এ যুগের অভিশাপ, লক্ষ লক্ষ লোকের চোখে অশ্রু ঝরাবার কাহিনী। এর হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ কোথায়? সকলের সামনেই আজ এই প্রশ্ন। এরই জন্য আজ বহুবিধ আন্দোলন, আলোড়ন আর বিক্ষোভ চলছে। এরই জন্য চতুর্দিকে এত হাহাকার।

সত্যাগ্রহী বন্দীর দ্বারা আকণ্ঠ পূর্ণ ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দের জেল। বাইবেলে আমরা পড়েছি যে মোহোন্মত্ত জনতা কিভাবে একটি চোরকে মুক্তি দিয়ে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার দাবি করে। সরকারও ঐভাবে বহু চৌর্যাপরাধে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্ত করে সত্যাগ্রহীদের জেলে পুরেছিল। মানুষে বোঝাই অতবড় ঐসব ঘরে কি কি হত আর কি না হত, তা সকল শব্দকে নিজ প্রশস্ত বক্ষে আশ্রয়দানকারী ঐ অসীম নীলাকাশই বলতে পারে। কেউ কেউ ফলিত জ্যোতিষ-চর্চা শুরু করলেন। তাঁরা সকলের মুক্তি-দিবস সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগলেন। তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী একের পর এক মিথ্যা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র নৈরাশ্য বোধ না করে তাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান গভীরতর করতে লাগলেন। কিন্তু নিরাশা প্রকাশ না করলেও তো তা গোপন থাকার জিনিস নয়। ইউরোপের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি। আমাদের কাছে কিন্তু এক একটি মাস পাষাণভারের মত বোধ হত। অবশেষে কেউ কেউ ধর্মানুষ্ঠানে মগ্ন হলেন। কেউ কেউ পাক-প্রণালীর পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। অনেকে আবার এতদুভয়ের নির্বিরোধ

সমন্বয় করলেন। এইভাবে বন্দীরা আরও নানারকম কাজ খুঁজে নিল। কিন্তু এত সব করা সত্ত্বেও সকলের কাজ জুটত না। কেউ কেউ বেকার রয়েই গেলেন। তাঁরা তাই বুদ্ধের মত কোমর বেঁধে ভারত তথা বিশ্বসংসারের সর্ববিধ শোকতাপের কারণ আবিষ্কারে মগ্ন হলেন।

বিশ্বাসবশত যাঁরা এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, গান্ধীজী-প্রদর্শিত পথেই এ সমস্যার সমাধান হবে, তাঁরা নিজ অন্তরের দোষানুসন্ধান করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, "পথ যে এই, এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের পদক্ষেপ ত্রুটিশূন্য নয়। এই দেখুন না, আমরা জেলে এসেছি সত্যাগ্রহী হয়ে, অথচ গোপনে বাইরে সংবাদ সরবরাহ করছি। এই হচ্ছে আমাদের 'সত্য'! আর আমাদের 'আগ্রহ'-শক্তি এত প্রখর যে এই দুচার মাসেই হাঁফিয়ে উঠেছি। আমরা শুধু নামেই সত্যাগ্রহী। এইরকম ভাঙাচোরা সাধনে কি আর সিদ্ধি লাভ করা যায়? সুতরাং আজ যে আমরা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করার সুযোগ পেয়েছি, তার সদ্ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণ বিকাশ করতে হবে।" এই অভিমত ব্যক্ত করে তাঁরা সংযম অবলম্বন করলেন এবং জেলের "টাস্ক" (কাজ) পুরো করার পর কাতাই, ধুনাই, বুনাই এবং সাফাই-এর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

অন্য অনেকের কাছে এ অন্তর্বৃত্তি মনঃপূত হল না। "আপনারা রাজনৈতিক সংগ্রামে সত্য ও অহিংসার সূক্ষ্ম ও নির্ভুল আচরণের কথা বলেন। বিশ্বের ইতিহাসে বহু রাজনৈতিক সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। আপনারা বলুন যে আমাদের এই সংগ্রামে আমরা যে পরিমাণ সংযম পালন করেছি তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় সংযম পালনের উদাহরণ বিশ্বের ইতিহাসে কুত্রাপি আছে কী? অহিংস সংগ্রামের সাফল্যের জন্য যদি মানুষের সর্বজনমান্য স্বভাবই পালটে দেবার কথা ওঠে, তা হলে অহিংস সংগ্রাম মায়ামরীচিকা বলে প্রমাণিত হবে। সদ্‌গুণাবলীর বৃদ্ধি ঘটাতে ঘটাতে সমগ্র জনতাকে কতদিন ধরে আপনারা ত্যাগের শিক্ষা দেবেন? দুর্জনের হৃদয় কবে পরিবর্তিত হবে? আর এই প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের দুঃখমোচন হতে কতদিন লাগবে? অদূর ভবিষ্যতে কি এসব ঘটার সম্ভাবনা আছে? অন্যপথ পাওয়া যায় নি বলে আমরা গান্ধীজীর পন্থা অবলম্বন করেছিলাম। রাস্তা যে ভাল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে পথে যদি আমাদের অভীষ্টসাধন সম্ভব না হয়, তবে ভাল বলেই কি শুধু আপনাদের ওপথে চলতে হবে? ওদিকে রাশিয়ার দিকে

তাকিয়ে দেখুন। দেখতে দেখতে সেখানে কী বিপ্লব ঘটল! মহান দেশের চেহারাই ওরা পালটে দিয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বকে তারা দীক্ষিত করার আশা পোষণ করে। আর আমরা এদিকে সত্য অহিংসা এবং কারাবিধি পালন করার চক্রে আবর্তিত হচ্ছি। এভাবে কি হবে? আপনারা বলছেন যে চার মাসও ধৈর্য ধারণ করতে পারি না। কিন্তু দেশের প্রতিটি কর্মীর মাসের পর মাস কারাগারে আটক থাকা কি সামান্য কথা? আর তা ছাড়া বাইরে কোন রকম আন্দোলন জারী থাকলে কথা আলাদা ছিল। বাইরে সব খাঁ খাঁ করছে আর আমরা এধারে সংযম পালন করছি! বাইরের শ্মশান-শূন্যতা এবং আমাদের সংযমের সমন্বয়ে কি স্বরাজ পাওয়া যাবে? এইজন্য নিজেদের পথভ্রান্ত মেনে নিয়ে আত্মসংশোধনের পরিবর্তে পন্থা সংশোধন করা প্রয়োজন। আমাদের আত্মায় কোন মলিনতা নেই। ও তো যা ছিল তাই আছে।" এই বলে এঁরা সমাজবাদী ও সাম্যবাদী সাহিত্য পাঠ আরম্ভ করলেন। প্রলয়কালে পৃথিবী জলমগ্ন হয়ে গেলে মার্কণ্ডেয় যেমন সেই অগাধ বারিরাশিতে একাকী সন্তরণ করেন, তেমনি কারাগারের ঐ নির্জনতাবাসে তরুণের দল সমাজবাদী ও সাম্যবাদী গ্রন্থসাগরে সাঁতার দিতে লাগলেন।

আর বস্তুত এই সাহিত্য কখনও গভীর আবার কখনও কখনও অগভীর হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রের মতই অপার। জনকয়েক মার্কস-রচিত 'ক্যাপিট্যাল' সাগরে অবগাহন করলেন। অনেকে রাশিয়ায় প্রকাশিত মাপ-জোখ করা গভীরতর প্রচারসাহিত্যে আত্মনিমজ্জন করতে লাগলেন। প্রাচীন পৌরাণিক কালের পর সাহিত্যে যতই পুনরুক্তি ঘটে থাকুক না কেন, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সতত সাহিত্যপ্রসারের অদম্য উৎসাহ অদ্যাবধি কমিউনিস্ট ছাড়া আর কেউ দেখতে পারেন নি। শ্রোতা বা পাঠক যতই বিস্মৃত হোক না কেন, পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হলে কথিত বিষয়ের কিছু-না-কিছু রেশ তাদের মাথায় থেকেই যাবে, এই বিশ্বাসে সেই সব প্রাচীন ও এই আধুনিক (রাশিয়ান) ঋষি অনুপ্রাণিত। পুরাণ-পাঠক এই বিশ্বাসে সকল কষ্ট বরণ করতেন যে মরণের পর স্বর্গলাভ হবে। আর রাশিয়ায় এক স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হয়েছে এই কল্পনায় আমাদের এইসব সাথী বিপুল সমাজবাদী সাহিত্য অধ্যয়নের বেদনা সহ্য করতেন! ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের একক সত্যাগ্রহের সময় জেলে জনৈক কমিউনিস্ট বন্ধু আমাকে বলেন, "মনে হয় আপনি এ যাবত কমিউনিস্ট সাহিত্য পড়েন নি। পড়ার মত জিনিস এ।" আমি জবাব দিলাম, "আমি যখন সূতা কাটি, তখন

আপনি ওসব আমায় পড়ে শোনান।” তারপর তিনি নিজ পছন্দসই সাহিত্য আমাকে পড়ে শোনাতে লাগলেন। ইতঃপূর্বে আমি বাইরে থাকতেই এইসব নবীন মনীষীদের সংহিতা মার্কসের “ক্যাপিট্যাল” সময় করে পড়ে নিয়েছিলাম। এইজন্য সে বন্ধুটি যা পড়ে শোনালেন, তা বুঝতে আমার কোন কষ্ট হয় নি। দৈনিক এক-দেড় ঘণ্টা পাঠ চলত। কয়েকমাস এই কার্যক্রম চলল। তিনি যেসব বই পড়ে শোনাতেন, তা ছিল বাছাই-করা। তবুও তাতে যেসব পুনরুক্তি আছে, তার ছাপ আমার মনে গভীরভাবে পড়েছিল। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আমার তরুণ বন্ধুদের মন এই পুনরুক্তির প্রভাবমুক্ত নয়, বরং এর প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ।

॥ ৩ ॥

দুটি মূল নীতি

গুণবিকাশ ও সমাজ-রচনা, এই দুই মৌলিক বিচারধারা আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত চলে আসছে। গুণবিকাশবাদী বলেন, “মনুষ্যজীবন ও মানবসমাজের বিকাশ নির্ভর করে মানুষের চরিত্রশক্তি, নৈতিক বল ও আত্মোন্নতির প্রচেষ্টার উপর। কারও ব্যক্তিগত জীবন নিজ নৈতিক স্বভাব দ্বারা নির্ধারিত হয়। আবার গুণের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সহজেই সমাজদেহও রূপান্তরিত হয়। এইজন্য লোকহিতকামীদের সমগ্র প্রচেষ্টা গুণবিকাশের উপরই নিবদ্ধ করা উচিত। বাইরে থেকে সমাজে পরিবর্তনসাধন করার চেষ্টার কোন অর্থ হয় না। এ শুধু অহমিকা। বেদান্তের ‘জগদ্ব্যাপারবর্জ্যম্’* সূত্র ভক্তের সীমারেখা-নির্দেশক। অহিংসা, সত্য, সংযম, সন্তোষ, সহযোগ ইত্যাদি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধানের প্রতি নিষ্ঠা দৃঢ় করা ও আমাদের প্রাত্যহিক আচরণে এইসব বৃত্তির অধিকাধিক প্রয়োগ করার চেষ্টা করাই হচ্ছে আমাদের কাজ। এটুকু করতে পারলে বাকী সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সন্তানকে দুধ খাওয়াবার কথা মাকে বলতেই হয় না। দুঃখ হলে কাঁদতে হয়, একথা ছোট ছেলেদের শেখাবার দরকার হয় না। বাৎসল্য থাকলে নিজে নিজেই দুধ খাওয়াবে। দুঃখ হলে আপনিই চোখে জল আসবে।”

---

* অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় শক্তি ছাড়া ভগবানের অন্যান্য ক্ষমতা ভক্ত পেতে পারে।

এইভাবে পৃথিবীতে এক বিচারধারা চলে আসছে ও প্রত্যেকটি সাধু-সন্তের হৃদয়ে সহজেই এ ভাব মূর্ত হয়ে ওঠে। গীতায় নৈতিক গুণাবলী ও জ্ঞানলক্ষণের যে দীর্ঘ তালিকা আছে তার প্রত্যেকটির উপর জ্ঞানদেব যে সুন্দর টীকা ও ভাষ্য রচনা করতে পেরেছিলেন, তার মূলে ছিল এই বিচারধারা।

কমিউনিস্টদের তত্ত্বজ্ঞান ঠিক এর বিপরীত। তাঁরা বলেন, "আপনারা যাকে গুণবিকাশ আখ্যা দেন, যদিচ তার জন্ম চিত্তে, কিন্তু চিত্ত এর জনক নয়। এর সৃষ্টি পরিস্থিতিবশ। মন স্বয়ং পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তিত হয়। 'ভৌতিকম্ চিত্তম্'—অর্থাৎ চিত্ত পঞ্চভূতাত্মক। শিশুরা যে শ্মশ্রু-গুম্ফমণ্ডিত ব্যক্তি দেখে ভয় পায়, তার কারণ তো এই যে, শিশুর মায়ের দাড়ি-গোঁফ থাকে না। মায়ের যদি দাড়ি-গোঁফ থাকত, শিশু তাহলে চাঁচা-ছোলা মুখ দেখেই ভয় পেত। আপনারা বলছেন যে, দুঃখ পেলে আপনা-আপনি চোখে জল আসে। কিন্তু ছুঁচ ফুটালে যে আবার আপনিই দুঃখ হয়। মন বলে কি কোন স্বতন্ত্র পদার্থ আছে নাকি? আসলে এ হচ্ছে শুধু সৃষ্টির এক প্রতিবিম্ব, ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়। ছায়ার নিয়মে বস্তু চলবে, না বস্তুর দ্বারা ছায়া চালিত হবে? রাতে ঘুম ভাল হলে মনে আনন্দ হয় ও সদ্‌গুণাবলী প্রকাশ পায়। একটু পরে খিদে পেলেই রজোগুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর আহারান্তে তমোগুণ বেড়ে যায়। তবে আর আপনারা গুণের কি মহিমা কীর্তন করেন? যোগ্য পরিস্থিতির নির্মাণ হলে যোগ্য গুণেরও নির্মাণ হতেই হবে। সুতরাং পরিস্থিতির পরিবর্তন করুন, শীঘ্রাতিশীঘ্র পরিবর্তন করুন ও যেন তেন প্রকারেণ পরিবর্তন করুন। বৃথা মোহজালে আর আবদ্ধ থাকবেন না। মানুষের মন যেমন আছে তেমনি থেকে যাবে। কোন মতেই পশু-প্রবৃত্তি বা কাল্পনিক দেবভাব প্রাপ্ত হবে না। মানব-মন নিজ সীমার ভিতর বিচরণশীল। পরিবেশের উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে সঙ্গে, এর যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি বা অবনতি হয়। এর জন্য চিন্তা করার দরকার নেই। সমাজরচনা-পদ্ধতির রূপান্তরের জন্য যদি হিংসার শরণ নিতেই হয়, তবে 'হায়, হায়, সব সদ্‌গুণ ধ্বংস হল'—এই রব তুলবেন না। এইটুকু ভেবে তৃপ্তি লাভ করুন যে কুপদ্ধতির অবসান ঘটল। এর জন্য যেটুকু হিংস আচরণ করতে হল, তা সাধারণ হিংসা নয়। এ হচ্ছে উঁচুদরের হিংসা আর একেও এক সদ্‌গুণের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এইটুকু জেনে রাখলে, আপনারা যে চরিত্র-বিকাশ নিয়ে এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাও আপনা-আপনি হবে।”

সুতরাং এই হচ্ছে দুটি মূলনীতি। বাকী সবকিছুর স্থান এতদুভয়ের মাঝখানে। নিজ নিজ সুবিধানুযায়ী আর সবকিছু এর মাঝে আসন পরিগ্রহ করে। কেউ বলেন, “একথা আমরা অস্বীকার করি না যে, সমাজের সংগঠন পরিবর্তন করারও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু বিশিষ্ট নৈতিক গুণবিকাশের সঙ্গে সমতালে এ কাজ করতে হবে। সমাজে কতিপয় শাশ্বত মূল্যবোধ থাকে। এই মূল্যবোধ খুইয়ে যে-কোন উপায়ে বিশেষ এক ধরনের সমাজ-রচনার প্রচেষ্টা সুদের লোভে মূল খোয়াবার মত হবে। সমাজ-সংগঠন মোটেই শাশ্বত বস্তু নয়। দেশকাল অনুসারে এর পরিবর্তন হয় এবং হওয়া উচিতও। এক চিরকালোপযোগী সমাজ-ব্যবস্থা রচনা করে তারপর আরামে ঘুম লাগাব—এমন কখনও হতে পারে না। সমাজব্যবস্থাকে দেবতার আসন দেবার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। আর সমাজরচনা করবে কারা? মানুষই না এ কাজ করবে? তাহলে মানুষ যেমন হবে, সমাজও হবে তেমন—তার অনুরূপ। সুতরাং চরিত্রবল ও নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রেখে, শুধু বজায় রেখে কেন, এর ক্রমবিকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে এরই বলে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা উচিত। এ জাতীয় পরিবর্তন শ্লথগতিতে হলেও তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। ধীরে ধীরে চিবিয়ে খেলে ভাল হজম হয়। আর এখনকার এই ধীর গতিই অবশেষে বিদ্যুৎবেগে কার্যসাধক বলে প্রতিভাত হবে। আমরা যখন নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রশক্তি বাড়াবার কথা বলি, তখন আমাদের মনের কোণে কোথাও দেবতা হবার কথা থাকে না। ওরকম অহংকারে আমাদের কাজ নেই। আমরা যখন মানুষ, তখন যতই আমাদের সদ্‌গুণাবলীর বিকাশের জন্য চেষ্টা করি না কেন, দেবতা হবার কোন আশঙ্কাই নেই! সেইজন্য আমরা যত অধিক মাত্রায় গুণোৎকর্ষ করতে পারি, তা করে চলি। সমাজ-সংগঠন ভাল হলে যে সদ্‌গুণের বিকাশ হয়, একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু উচিত মাত্রায় সদ্‌গুণের বিকাশ হলেই যে শুধু সমাজ-রচনার প্রগতি হওয়া সম্ভব, এ কথা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের তুলনায় অধিকতর মৌলিক সত্য। সদ্‌গুণ-নিষ্ঠা হচ্ছে বনিয়াদ আর সমাজ-সংগঠন হচ্ছে ইমারত। বনিয়াদকে ভেঙ্গে ফেলে ইমারতকে কীভাবে শক্তিশালী করা যাবে?”

এ কথায় আর একদল বলেন, "আমরাও একথা মানি যে সমাজ-রচনায় প্রগতি আনার জন্য শাশ্বত মূল্যবোধ কায়েম রাখা উচিত এবং সদ্‌গুণ-নিষ্ঠাকে পদদলিত করা উচিত নয়। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে নৈমিত্তিক কাজের জন্য দরকার পড়লে নিত্যকর্ম বাদ দিতে হয়। আপনারা প্রার্থনাকে নিত্যকর্ম মনে করেন। কিন্তু আপনাদের প্রার্থনার সময় কোথাও আগুন লাগলে আপনারা তা নিভাতে যাবেন কিনা? আগুন নিভাবার পর শান্তিতে বসে প্রার্থনা করা যাবে। একে নিত্য-নৈমিত্তিক বিবেক আখ্যা দেওয়া উচিত। সর্বত্র এইভাবে বিচার করতে হয়। কমিউনিস্টরা মনে করেন যে, ক্রান্তি বা বিপ্লব আনয়নের জন্য হিংসাত্মক উপায়াবলম্বন অনিবার্য ও হিংসা ছাড়া ক্রান্তি হতেই পারে না। আমরা এ কথা মানি না। আমাদের বিশ্বাস ভারতের মত দেশে এবং যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন না করে শুধু ব্যালট-পেপারের শক্তিতে বিপ্লব সাধন করা সম্ভব। এর অনুকূল জনমত তৈরী করতে দশ বিশ বছর লাগলে ক্ষতি নেই। আমরা ধৈর্য-সহকারে লোকমত তৈরী করতে থাকব। কিন্তু ধরুন যদি শাসন-বল্লাধারী দল নির্বাচনের পবিত্রতা বজায় না রাখে ও নির্বাচন-সংগ্রামে শাসন-ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তাহলে এরকম অবস্থায় সাধন-শুদ্ধির উপর জোর দেবার অর্থ হচ্ছে নিরন্তর মার খাবার রাস্তা খুলে দেওয়া। সুতরাং নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য উপায় অবলম্বন করা আমাদের কাছে অনুচিত বোধ হয় না। আমরা একে নৈমিত্তিক ধর্ম মনে করি। ইচ্ছা করলে আপনারা একে আপদ্‌ধর্ম বলতে পারেন। কিন্তু দোহাই আপনাদের, অধর্ম বলবেন না। এইটুকুর জন্য শাশ্বত মূল্যবোধ ভেসে যাবার কারণ নেই। নৈমিত্তিক কারণের জন্য কথঞ্চিৎ পথভ্রষ্ট হলেও পরে তা ঠিক করে নেওয়া যাবে। শাসনক্ষমতার হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বত মূল্যবোধকে আরও দৃঢ়মূল করা যাবে। খোঁটা পোঁতার সময় আমরা তাকে একটুখানি নেড়ে নিয়ে আরও গভীরভাবে পুঁতে থাকি। একেও ঐ রকম ভাবুন। অহিংসার মঙ্গলের জন্যই এই স্বল্পকালীন হিংসার শরণ নেওয়া। অন্যথায় অহিংসা আমাদের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাবে। ডালপালা ছাঁটাই করলে গাছ তেজের সঙ্গে বাড়ে। গাছের শিকড়ে কুড়াল মারা আর ডাল ছাঁটাই করা— এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা আদি অহিংসার মূলেই কুঠারাঘাত করছে। হিংসার অপরিহার্যতা স্বীকার করে

কমিউনিস্টরাও এর মূলে আঘাত হানছেন। তাঁদের মনোবাসনা এরকম না হলেও বাস্তব ফল হচ্ছে এই। সুতরাং আমরা ও-কথা মানতে পারি না। কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধের নামে সমগ্র সমাজের অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ করে রাখা ও দীর্ঘকাল ধরে দরিদ্রদের প্রতি উৎপীড়ন হতে দেওয়া আমাদের মতে নৈতিকতা নিয়ে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। এ ছাড়া অপর রাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিরোধ ও অন্তর্বিপ্লব দমন করার জন্য অস্ত্রবল প্রয়োগ করতে হলে, তাকে হিংসা মনে না করে দণ্ডধর্ম বলে বিবেচনা করা উচিত। আমাদের মতে, এইটুকু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বিশ্বের অন্য সব ক্ষেত্রে অহিংসাত্মক সাধন প্রয়োগ করা অত্যন্ত সমীচীন।"

সন্ত এবং কমিউনিস্টদের নীতি দুটি মৌলিক। মাঝের এই দুই বিচার-ধারাকে আমরা নৈতিক ভূমিকা আখ্যা দিতে পারি। এর মধ্যে প্রথমোক্ত নৈতিক ভূমিকার প্রতিপাদন গৌতম-বুদ্ধ ও গান্ধী এদেশে সুষ্ঠুভাবে করেছেন। আরও কয়েকজন ধর্মসংস্থাপক এর শরণ নিয়েছেন। তবে মাত্র অল্প কয়েকজন স্মৃতিরচনাকারী এর সমর্থন করেছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় নৈতিক ভূমিকার প্রতিপাদন বহু স্মার্ত করে গেছেন। আজ ভারতের অধিকাংশ কংগ্রেসী ও কংগ্রেসের বিভিন্ন উপশাখার কর্মী ও স্বজাত্যভিমানী ভারতের সমাজতন্ত্রীরা এই ভূমিকার উপর দণ্ডায়মান বলে মনে হয়। অনেক গান্ধীবাদী নামে অভিহিত ব্যক্তিও ঘুরে ফিরে এখানে এসেই দাঁড়ান।

এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কিশোরলালভাই তাঁর রচনায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহী নৈতিক ভূমিকা ও সামাজিক পুনর্গঠন দ্বারা বিপ্লবসাধনের কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণের তুলনামূলক বিচার করেছে বলে মনে হয়।

॥ ৪ ॥

মার্কস এবং গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী এবং মার্কস উভয়েই ছিলেন মনীষী। এ যুগের উভয়ের মতবাদের তুলনামূলক বিচারের চেয়ে চিত্তাকর্ষক বিষয় আর কী হতে পারে? বিগত এক দেড় শতাব্দীর মনুষ্য-জীবন নিয়ে যদি বাছাই করা যায়, তবে খুব বেশী হলে হয়ত এই দুই মহাপুরুষের নামই হাতে থাকবে। লেনিন মার্কসের ভিতরেই এসে যান এবং টলস্টয় নিঃসন্দেহেই গান্ধীকে প্রভাবিত করেছেন। এই দুই বিচারধারা পরস্পরকে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে সম্মুখীন হয়েছে।

আজ বাইরে থেকে হয়ত মনে হয় যে, বিশ্বের মল্লভূমিতে রাশিয়ার নেতৃত্বে সাম্যবাদী এবং আমেরিকার নেতৃত্বে গণতন্ত্রের আবরণের অন্তরালে পুঁজিবাদ তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, এই দ্বিতীয় দল একেবারেই মেকী পালোয়ান; কারণ এদের ভিতর আর জীবনীশক্তি নেই। তাই আমার মনে হয়, অস্ত্রবলে স্ফীত হয়ে তারা যতই রণহুংকার ছাড়ুক না কেন, তাদের কমিউনিস্টদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা নেই। পক্ষান্তরে গান্ধীজীর মতবাদ যদ্যপি বিশ্বে এখনও কুত্রাপি সংগঠিত রূপে দাঁড়িয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে না, তবু তার ভিতর প্রাণবন্ত আদর্শ আছে বলে কমিউনিজমকে গান্ধীবাদের সঙ্গে লড়তে হবে। এই বিশ্বাসে প্রবুদ্ধ হয়েই কিশোরলালভাই এই ক্ষুদ্র লেখমালায় উভয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত রসে এমন ভরপুর যে, কিশোরলালভাই-এর বৈশিষ্ট্য "নীরস" রচনা-শৈলীর প্রভাব এতে পুরোমাত্রায় থাকলেও পাঠক সমগ্র পুস্তকখানি না পড়ে থাকতে পারবেন না। কিশোরলালভাই ইতঃপূর্বেই "গান্ধী বিচার দোহন" করে বসে আছেন; স্থতরাং তিনি যেভাবে এ গ্রন্থে গান্ধীবাদের বিশ্লেষণ করেছেন, তাকে প্রামাণিক বলা চলতে পারে। তাঁর মার্কসবাদের বিশ্লেষণ অতটা প্রামাণ্য বলে ধরে না নিলেও আমার মতে তিনি যাতে মার্কসবাদের প্রতি অবিচার না হয়, তার জন্য যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেছেন।

বিশ্বের কথা যদি আমরা ছেড়েই দিই, তবু ভারতে অন্ততঃ আজ গান্ধীবাদ ও সাম্যবাদের তুলনা এক দৈনন্দিন আলোচনার বিষয় হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ পদ্ধতিতে উভয় মতবাদের তুলনাত্মক মূল্যাঙ্কন করে থাকেন। গান্ধীজীর মতবাদের চতুর্দিকে আধ্যাত্মিক তেজোবলয় দেখা যায়, আর সাম্যবাদের পিছনে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার শক্তিশালী পটভূমি রয়েছে। গান্ধীবাদ ভারতের স্বরাজপ্রাপ্তির গৌরব হাসিল করে অবাস্তব মতবাদের অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়েছে, আর সাম্যবাদ চীনের পুরাণের যুগের মানুষদের তারুণ্য-মন্ত্রে সঞ্জীবিত করে তাৎকালিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে। এইজন্য কারও কারও মনে এই ইচ্ছা জাগে যে, সম্ভব হলে এই দুই মতবাদের সমন্বয় করা যাক। এই মনোভাবের ফলে "গান্ধীবাদ অর্থাৎ হিংসা-বর্জিত সাম্যবাদ" ইত্যাদি স্থূল সূত্র সৃষ্টি করা হয়। আসলে এই দুই মতবাদের মধ্যে মতৈক্য হতেই পারে না। এদের বিরোধ মৌলিক কারণে। এই গ্রন্থে

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে দেখান হয়েছে যে উভয় মতবাদ পরস্পরের চরম বৈরী।

একবার আলোচনা চলছিল যে, "গান্ধী ও সাম্যবাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু অহিংসার।" আমি বললাম, "ধরুন দুজনের নাক, কান, চোখ, মুখ, সবই এক রকমের। এদের ভিতর এতটা সাদৃশ্য যে প্রয়োজন হলে রাজনৈতিক চাতুরীর জন্য একজনকে অপরকে স্থলাভিষিক্ত করা যায়। এদের মধ্যে তফাত অতি সামান্য—একজন শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করছে ও অপর জনের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে। এর পরিণামস্বরূপ একজনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ভোজ্যোপকরণ এবং অপরজনের শ্মশান-যাত্রার ব্যবস্থা হচ্ছিল।" অহিংসার এই "ছোট্ট" প্রভেদটুকু বাদ দিলে গান্ধীবাদ ও সাম্যবাদের যে সমানতা পরিদৃষ্ট হয়, তা এই জাতীয়। কিশোরলালভাই তো নাক, কান, চোখ সর্বত্রই পার্থক্য দেখিয়েছেন। উপর উপর একরকম দেখালেও জীবিত ও মৃত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে তো পার্থক্যসৃষ্টি হবেই।

সাম্যবাদ খোলাখুলি এক আসক্তিপূর্ণ (রাগ-দ্বেষযুক্ত) মতবাদ হওয়ায় আমি কখনও তাত্ত্বিক দৃষ্টি থেকে এর বিবেচনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নি। সাম্যবাদীরা অবশ্য এর চতুর্দিকে এক লম্বা-চওড়া তত্ত্বজ্ঞানের প্রাচীর খাড়া করেছেন ; কিন্তু ওর ভিতর তত্ত্বজ্ঞান বলে কোন পদার্থ নেই। কারণ এর ভিতর কারিগরির নাম-গন্ধ মাত্র নেই, আছে শুধু বাজীকরবৃত্তি। এ যেন পীতজ্বরগ্রস্তের দৃষ্টি। উদাহরণস্বরূপ "সংঘর্ষ" বলে যে পরম তত্ত্ব তাঁরা মানেন, তার কথা ধরা যেতে পারে। তাঁদের মতে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছু নেই, অর্থাৎ "নান্যদ্ অস্তি।" পরমাণুবাদী কণাদ যেমন মৃত্যুকালে "পীলবঃ পীলবঃ পীলবঃ" অর্থাৎ পরমাণু, পরমাণু, পরমাণু জপ করতে করতে কালগ্রাসে পতিত হন, এইসব সংঘর্ষবাদীরাও ঠিক তেমনি। সদ্যোজাত শিশুর জন্য যে মাতৃস্তন দুগ্ধরূপী জীবন-রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, এ বিচিত্র ব্যাপার তাহলে কেমন করে ঘটে? তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাহলে একে মাতৃস্তন ও শিশুর অধরের এক মহান সংঘর্ষের পরিণাম আখ্যা দিতে হবে! আমি তো স্রেফ রসিকতা করে এ উদাহরণ দিলাম; তাঁরা কিন্তু সত্যসত্যই একথা স্বীকার করে নেবেন। সারাংশ হচ্ছে এই যে, আমাদের মতে যা সহযোগিতা, তাকেও যখন সংঘর্ষ মনে করা হয়, তখন সত্যকার প্রতিকার তাঁদের চোখে কী বিরাট সংঘর্ষরূপে প্রতিভাত হবে!

তাহলে ডঃ রঘুবীরের ভাষায় তাকে "প্রসংঘর্ষ" আখ্যা দিতে হবে! এই রকম অলীক মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করাও মুশকিল। তাঁদের সম্বন্ধে অবশ্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তত্ত্বজ্ঞানের অনুরূপ আচরণ করার প্রয়োজনীয়তা তাঁদের নেই। নিশ্চিন্ত আচরণের সমর্থনে তাঁরা তত্ত্বজ্ঞান আবিষ্কার করে থাকেন।

তাঁরা প্রায়ই এ বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন যে মন আগে না বস্তু আগে। একমাত্র বিকৃতমস্তিষ্ক ছাড়া সবাই এ কথা স্বীকার করবেন যে বস্তু থেকে মনের সৃষ্টি। মন থেকেই যদি বস্তুর উদ্ভব হত, তবে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের আর প্রয়োজনীয়তা কী ছিল? তবে যদিও বস্তু থেকেই মনের উদ্ভব, তবু এতদুভয় থেকে এক পৃথক সত্তা হচ্ছে আত্মা। কিন্তু কমিউনিস্ট ল্যাবরেটারীতে তো আত্মার পাত্তা নেই, এবং কেউ যদি তাঁদের এর অস্তিত্বের প্রমাণ দেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁরা তা অস্বীকার করেন। এইরকম লোকেদের উদ্দেশ্য করে শংকরাচার্য বলেছিলেন, "ভাই তোমার সঙ্গে আমার কোন মতবিরোধ নেই; কারণ আত্মাকে অস্বীকারকারী তুমিই স্বয়ং আত্মা। তাকে স্বীকার করলে তোমার স্বীকৃতির ফলে তার অস্তিত্ব সিদ্ধ হবে। আর তাকে অস্বীকার করলেও অস্বীকৃতির ফলে তার অস্তিত্ব সিদ্ধ হবে।" যে বলেছে যে, "আমি ঘুমিয়ে পড়েছি", সে যে ব্যক্তি সাড়া দিচ্ছে, ঠিক তারই মত জেগে আছে। বস্তু ও মন উভয়কে আকৃতিদানকারী এই আত্মারূপী তৃতীয় সত্তাকে অস্বীকার করে কমিউনিস্টরা সমাজের নবনির্মাণের চক্রে পড়ে সুনীতির কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা দেন না। আমরা যাকে আধ্যাত্মিক সদ্‌গুণ আখ্যা দিই, তাঁদের মতে তা আর্থিক পরিস্থিতিবশত সৃষ্ট আচরণ।

অনাত্মবাদী আদর্শে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। নাপিত কত চুল ছাঁটে, কে তার হিসাব রাখে? ব্যক্তি যায় আসে; কিন্তু সমাজ চির-চলমান। সুতরাং সমাজ ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তির কোন মূল্য নেই।

সগরপুত্র যেভাবে গঙ্গোত্রীর আবিষ্কার করেছিলেন, এই নবীন তত্ত্ববেত্তারাও সেইভাবে সমগ্র মানবেতিহাসের মূল ধারা খুঁজে বার করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, জ্যা-মুক্ত শরের মত আমাদেরও গতিমুখ পরিবর্তন করা অসম্ভব। পূর্ব ইতিহাসের প্রবাহ আমাদের কার্যকলাপের দিশা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমাদের আর কর্ম-স্বাতন্ত্র্য নেই। প্রথমে রক্ত-গঙ্গা

বইবে, তারপর প্রবাহিত হবে দুগ্ধ ও মধুর প্রবাহ এবং সর্বশেষ সকলের গৃহ-প্রাঙ্গণ দিয়ে তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি নির্মল বারিধারা প্রবাহিত হবে। এসব আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে। ইতিহাসের ধারা পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও এ নিয়ে গবেষণার ফলে এঁরা ইউক্লিডের জ্যামিতির মত বিপ্লবের এক সুব্যবস্থিত শাস্ত্র আবিষ্কার করেছেন। বিপ্লব প্রথমে কোথায় কোথায় হবে, মার্কস এরও ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর উক্তি সত্য প্রমাণিত হয় নি। তবে এটা জ্যোতিষশাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি মাত্র। কিন্তু এইটুকুর জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র তো আর ভ্রান্ত বলা যেতে পারে না। যেমন যমরাজের আমন্ত্রণ এড়াবার উপায় নেই, ঠিক তেমনি বিপ্লবের ভবিষ্যৎও এধার ওধার হবার নয়। এমতাবস্থায় বিপ্লবসাধনে অংশ গ্রহণ করা, তাকে মূর্ত করার জন্য আগুয়ান হওয়ার ক্ষমতাই শুধু আমাদের আছে। আর আমাদের কাজও স্রেফ এইটুকু।

এই গোঁড়া মতবাদের সঙ্গে যে গান্ধীবাদের সমন্বয় হতে পারে না, এই কথা সপ্রমাণ করার জন্য কিশোরলালভাইএর ক্ষুদ্র এই প্রয়াস।

॥ ৫ ॥

বদ্ধ-শাস্ত্র ও মুক্ত বিচারধারা

কথিত আছে যে রাম না হতেই রামায়ণ রচনা হয়েছিল এবং পরে শ্রীরামচন্দ্র অক্ষরে অক্ষরে বাল্মীকির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে চলেছিলেন। এইজন্য তাঁকে বিন্দুমাত্র অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। বই দেখে দেখে তিনি কাজ করতে লাগলেন এবং তার পরিণামও তিনি বই থেকে আগে জেনে গিয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর দুশ্চিন্তার কোন কারণ সৃষ্টি হয় নি। কমিউনিস্টদের ব্যাপারও ঠিক এইরকম। মার্কস যা লিখে গিয়েছিলেন, লেনিন তাই করলেন। আর তাই আমাদেরও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে। মার্কসের রচনা ও লেনিনের কার্যে কোথাও যদি কখনও পার্থক্যের আভাস দৃষ্টিগোচর হয়, তবে কমিউনিস্ট পণ্ডিতেরা অমনি কথঞ্চিৎ পরিশ্রম করে প্রমাণ করে দেন যে, উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এ অবশ্য কোন কঠিন কাজ নয়; কারণ, আমরা জানি যে স্মৃতি শ্রুতি-বচনেরই অনুরূপ হওয়া উচিত। তাই স্মৃতি-বচন অধিকতর স্পষ্ট হলে শ্রুতির অর্থ

তার মত করে নিলেই কাজ চলে যায়। আর এটুকু হল তো সব "লাইন ক্লিয়ার!"

গান্ধীবাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সাম্যবাদ যদি মজবুত পাথরের চকমিলান দালান হয়, গান্ধীবাদ তবে সতত পরিবর্তনশীল "এমিবা"। গান্ধীজীরই বক্তব্য নিয়ে যদি আলোচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে তারও বিকাশ হয়েছে। তাঁর পরবর্তী বক্তব্যের সঙ্গে যদি কোন পূর্ব-কথনের মিল না থাকে, তবে উভয়ের ভিতর সঙ্গতি-বিধানের প্রয়াস করার প্রয়োজন নেই। শেষের কথা প্রামাণ্য বলে মনে করে প্রথমের কথা ছেড়ে দাও—বলেই গান্ধীজী খালাস। তাঁর বৃহত্তম সংগ্রামসমূহ পরিচালন-কালেও পরিকল্পনা-বিধান বা পূর্ব-প্রস্তুতির বালাই থাকত না। যাঁর বক্তব্য হচ্ছে "পরবর্তী পদক্ষেপই যথেষ্ট", তাঁকে ভগবান আর এক পা দেখাবেন কেন? সে যাই হক, তাঁর শেষের কথাই যে শেষ কথা, তাও কি জোর করে বলা যায়? এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "আমার কথাকেই বেদ-বাক্য মনে কোরো না। নিজ-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ কর। আমি যতদিন বেঁচে আছি, আমার কাছে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে থাক। আমার মৃত্যুর পর তোমরা সবাই স্বতন্ত্র।" এইজন্য তাঁর অনুগামীদের মধ্যে কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। পরিহাস করে একজন আমাকে বলেন, গান্ধীজী গীতা-ভক্ত ছিলেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাথীরাও সব গীতা-ভক্ত এবং এঁদের প্রায় সকলেই গীতা সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু লিখেছেন। কিন্তু কারও গীতার ভাষ্য অপরের ভাষ্যের সঙ্গে মেলে না।" এই ঠাট্টার কথা আমরা অবশ্য ধরব না; কারণ, এতে তো গীতার শব্দসম্ভারের ব্যাপকতা ও বহুমুখীতা ছাড়া অন্য কিছুর প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এ-কথা তো সত্য যে জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত যে কোন বিষয় সম্বন্ধে, এমন কি খাদির মত সর্বোদয় আদর্শের মূলীভূত তত্ত্ব সম্বন্ধেও গান্ধীজীর প্রত্যেকটি ঘনিষ্ঠ সাথী যে একমতাবলম্বী হবেন, একথা বলা চলে না। এইজন্য যখন একদল তাঁর কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে, তাঁর মতবাদের শাস্ত্রীয় এবং প্রামাণ্য সংকলন হওয়া উচিত, তখন তিনি তার জবাবে বলেছিলেন, "প্রথমত: এর জন্য আমার সময় নেই, আর দ্বিতীয়তঃ আমার প্রয়োগ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও শেষ হয় নি। এর থেকে ধীরে ধীরে সময় হলে শাস্ত্র তৈরী হয়ে যাবে।" তিনি যে কারণ দেখিয়েছিলেন, তা তো একেবারে যথার্থ। তবে আর

একটা কারণে তাঁর জবাব আমার খুব ভাল লেগেছিল। প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় পরিভাষার সংকলন করে হবে কী? হবে শুধু এই যে এর বিরুদ্ধ ভাষ্যের জবাব দেওয়া চলবে। অস্ত্রের দ্বারা যেমন অস্ত্রবল ক্ষীণ হবার বদলে শক্তিশালী হয় এবং এক এক সমস্যা থেকে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়, তেমনি একটি পরিভাষার সঙ্গে অপর পরিভাষাকে লড়িয়ে দিলে কোন কিছু স্পষ্ট হবার বদলে কূটতর্কের ধূলিজালে চতুর্দিক অন্ধকার হবে। এইজন্য বিচার-ধারাকে পরিভাষার ছাঁচের ভিতর ঠুকে-পিটে বসিয়ে দেবার চেষ্টা না করে তাকে বাধা-বন্ধনহীন রাখাই অধিকতর লাভজনক। তবে এর ফলে হয়ত নানা পন্থের সৃষ্টি হতে পারে এবং বুদ্ধের শিষ্যদের মত চার ভাগে বিভক্ত হবার বদলে গান্ধী-শিষ্যদের হয়ত দশ মত ও দশ পথ হতে পারে। এ অবস্থায় গান্ধীজীর উপদেশানুসারে যার যার নিজের বুদ্ধিতে চলাই সর্বাপেক্ষা সঠিক উপায়।

॥ ৬ ॥

গান্ধীবাদের ত্রিবিধ আধার

গান্ধী-দর্শনের মুক্ত এবং স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম বজায় রেখে কিশোরলালভাই একে কথঞ্চিৎ সুসংবদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। বর্ণব্যবস্থা, ন্যাসবাদ (ট্রাস্টিশিপ) ও বিকেন্দ্রীকরণ—এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে তিনি এর একটি কাঠামো রচনা করেছেন। এবার এর একটু নিরীক্ষণ করা যাক।

বর্ণব্যবস্থার প্রাচীন বিশ্বাসে নূতন অর্থভরে বা শব্দটির অন্তর্নিহিত যথার্থ কল্পনা অনুযায়ী গান্ধীজী বর্ণব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছেন। আমার বিশ্বাস এও তাঁর এক অহিংসার প্রয়োগ। কোন সমাজে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত শব্দ ও তার অন্তর্নিহিত কল্পনাকে নস্যাৎ করার পরিবর্তে সেগুলিকে বজায় রেখে তার অর্থের বিকাশ ঘটান, তাদের বিকশিত রূপ দেওয়া ও তাতে নবজীবনের সঞ্চার করা আমার মতে অহিংসারই এক প্রক্রিয়া। ভারতীয় ঐতিহ্যে যে সমন্বয়-আদর্শের নিদর্শন পাওয়া যায়, তার সবটুকু এই অহিংসার প্রক্রিয়া থেকে সৃষ্ট। এই প্রক্রিয়ার এমন কি পুরাতন শব্দে নূতন অর্থ-সংযোজনের অহমিকারও স্থান নেই। এ শুধু প্রাচীন শব্দের মূল অর্থ ব্যক্ত করা। গীতায় যজ্ঞ আদি শব্দের অর্থের বিকাশ করা এর উদাহরণ। অবশ্য এ প্রক্রিয়ায় শব্দের অর্থ বিকৃত হবার আশঙ্কা থাকে। সেক্ষেত্রে তাকে

অহিংসার প্রয়োগের বদলে অসত্যের প্রয়োগ আখ্যা দিতে হবে। কোন শব্দের অর্থ বিকৃত না করে শ্রদ্ধার সঙ্গে শব্দার্থের যদি স্বল্পমাত্র দোহন করা যায়, তবে তাকেই অহিংসার প্রক্রিয়া বলতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রোড়ে গান্ধীজীর জন্ম এবং এরই ছত্র-ছায়ায় তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। আর মুখ্যতঃ তিনি যাঁদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, তাঁরাও এই ভারতীয় সংস্কৃতির অমৃত-ধারাপানে পুষ্ট। আমার বিশ্বাস এইজন্যই তিনি বর্ণ-ব্যবস্থার কল্পনাকে স্বীকার করে নেন। অর্থাৎ গান্ধীজীর জন্ম যদি অন্য কোন সমাজে হত এবং সেই সমাজের জন্য যদি গান্ধীজীকে বলতে হত, তবে অহিংস সমাজ-রচনার অনিবার্য অঙ্গ হিসেবে বর্ণব্যবস্থার কল্পনা যে তাঁর মনে স্বতন্ত্র রীতিতে আসতই, এ কথা জোর করে বলা যায় না। তবে এটুকু নিশ্চয় বলা চলে যে, এই কল্পনার সারাংশ সেই অবস্থাতেও অন্য কোন শব্দের মারফত তাঁকে গ্রহণ করতে হত। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বর্ণ ও বর্ণব্যবস্থা—এই শব্দ দুটি যাঁদের মনঃপূত নয়, তাঁরা যেন অন্ততঃ গান্ধীজী এই শব্দ দুটি ব্যবহার করার জন্য ঘাবড়ে না যান। শব্দ নিয়ে টানাটানি করে লাভ নেই। আমাদের কাজ এর মর্মার্থ নিয়ে। বর্ণব্যবস্থার সার হচ্ছে: (১) পারিশ্রমিকের সমতা, (২) প্রতিযোগিতার অবসান, (৩) পুরুষানুক্রমিক সংস্কারকে কাজে লাগাবার উপযুক্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা। আমাদের মতে অহিংস-সমাজ-রচনার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট।

ন্যাসবাদের ব্যাপারও বর্ণব্যবস্থার মত। এ শব্দটিও অনেকের ভাল লাগে নি। 'বর্ণধর্ম' শব্দটি নিঃসন্দেহে মূলতঃ সদ্‌বিচার ও সুব্যবস্থার ভাবোদ্যোতক। কিন্তু ন্যাসবাদ সম্বন্ধে নিশ্চয় জোর করে সে-কথা বলা চলে না। অর্থাৎ সৃষ্টির লগ্ন থেকেই এ শব্দটির দুরুপযোগ হয়ে আসছে। কিন্তু আইনের ভাষায় এর প্রয়োগ সদর্থে হয়ে থাকে। তাই ব্যবহারজীবী হবার কারণে এ শব্দটি গান্ধীজীর মনে ধরে। আর স্বয়ং সত্যোপাসক হবার জন্য এর মূল শুদ্ধ অর্থই তিনি গ্রহণ করলেন। আমি আইনের ছাত্র নই। তাই গান্ধীজী এই শব্দটিকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমার মনে এ দাগ কাটল না বা আমাকে খুব একটা আকর্ষণ করতে পারল না। তবুও গান্ধীজী যে অর্থে এর প্রয়োগ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আমার ভুল ধারণা হয় নি। গীতার অপরিগ্রহ ও সমভাব ইত্যাদি শব্দ তাঁর মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এবং বাস্তব জীবনে এইসব বৃত্তির আচরণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা করার কালে তিনি

আইনের ন্যাসী শব্দের সহায়তা পেলেন। আত্মকথায় গান্ধীজী লিখেছেন যে গীতা অধ্যয়নের ফলে ন্যাসী শব্দের অর্থ তাঁর কাছে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয় এবং এর ফলে অপরিগ্রহের সমস্যারও সমাধান হয়। সারাংশ হচ্ছে এই যে, গান্ধীজীর দৃষ্টিতে শুধু সমাজের বর্তমান স্থিতিই নয়, যে কোন পরিস্থিতিতে দেহধারী মনুষ্যের পক্ষে অপরিগ্রহ আচরণের বাস্তব পন্থা হচ্ছে ন্যাসী হিসেবে নিজের যাবতীয় শক্তির উপযোগ করা। কিশোরলালভাই যেভাবে এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করেছেন, একটি শিশুও তা বুঝতে পারবে। আমার মনে হয়, তাঁর বিশ্লেষণের পর আর কোন রকম বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ নেই।

সম্পদের বিষমতা কৃত্রিম ব্যবস্থার ফলে হয়েছে বলে এর কথা বাদ দিলেও মানুষের শারীরিক এবং বৌদ্ধিক ক্ষমতার বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে দূর হতে পারে না। মানা গেল যে শিক্ষণ ও নিয়মনের ফলে এই বিষমতার কিয়ৎ পরিমাণ হ্রাস সম্ভবপর। কিন্তু আদর্শ স্থিতিতেও যে এ বৈষম্য একেবারে থাকবে না, এমন কল্পনা করা যায় না। এইজন্য বুদ্ধি, শরীর বা সম্পদ—এই তিনের মধ্যে যে যা পেয়েছে, তাকে সে যেন 'সর্বজনহিতায়' প্রাপ্ত সম্পত্তি বলে বিবেচনা করে। শুদ্ধ ভাষায় এরই নাম ন্যাসবাদ। কিন্তু দুর্জনের হাতে পড়ে এ শব্দটি এমনভাবে কলুষিত হয়ে গেছে যে, এখন এর উদ্ধার প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হয়। আমি তাই এর বদলে "বিশ্বস্ত বৃত্তি" নামক ভাবোদ্দীপক সংজ্ঞাপদটি ব্যবহার করে থাকি। স্বাবলম্বনের সাধারণ ভাষ্য হিসেবে আমরা মেনে নেব যে কেউ যেন কারও ভরসায় না থাকে। কিন্তু সত্য সত্যই যদি এমন অবস্থা কোনদিন হয় যে কেউ কারও পরোয়া করে না, তাহলে সে এক নরকসদৃশ ব্যাপার হবে। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতা ও মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের এবং প্রতিবেশীর প্রতি অন্য প্রতিবেশীর পারস্পরিক নির্ভরতা থাকবেই। শুধু তাই নয়, ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রও পরস্পরের প্রতি এইরূপ ভরসা রাখবে। বিপদের আশঙ্কা আছে ভেবে যদি আমরা পরস্পরের প্রতি এইরূপ আস্থা স্থাপন করতে অসমর্থ হই, তবে বুঝতে হবে যে আমরা মানবতা থেকে নিম্নস্তরে নেমে বিষয়টির বিচার করছি। শিক্ষণ দ্বারা এইরূপ বিশ্বস্ত বৃত্তির পুষ্টি সাধন করা যেতে পারে। এর পরিবর্তে একেবারে বিশ্বাসের ঝঞ্ঝাট বাদ দিয়ে সমগ্র সমাজকে ছাঁচে ঢালাই করে যন্ত্রবৎ করে দেবার নীতিতে বিশ্বাস করা বুদ্ধিবৃত্তির দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণার পরিচায়ক।

পারস্পরিক বিশ্বাসের আধারে সমাজ-রচনার অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেকের বিবিধ শক্তির সুপরিকল্পিত স্থান-নির্দেশ। সংস্কৃত "লোকসংগ্রহ" শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিগত অপরিগ্রহের অর্থ হচ্ছে, বিশ্বস্ত বৃত্তি সহকারে সকলের হিতার্থে নিজ শক্তিকে কাজে লাগান। লোকসংগ্রহের এক মৌলিক তত্ত্ব এ। ন্যাসবাদ শব্দটি পছন্দসই না হলে তাকে বর্জন করুন। তবে এইটুকু শুধু মিনতি যে, এ তত্ত্ব যেন বিসর্জন দেবেন না।

বিকেন্দ্রীকরণের কথা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ শব্দটি একেবারে নূতন হবার জন্য এর সঙ্গে কোন ভালমন্দ ভাব বা সংস্কার যুক্ত নেই। এ শব্দটি যেমন নূতন, এর অন্তর্নিহিত কল্পনাও নবীন। যন্ত্রযুগের আবির্ভাবের পূর্বে সবকিছুই বিকেন্দ্রিত ছিল। সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে গান্ধীজী আর নূতন কি বলেছেন ? যন্ত্রযুগের পূর্বে বিকেন্দ্রীকরণ ছিল না ; কিন্তু সবকিছু বিকেন্দ্রিত ছিল। শুধু গ্রামে গ্রামে শ্রমশিল্প বিকেন্দ্রিত পদ্ধতিতে চললেই বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে গেল বলা চলে না। বিকেন্দ্রীকরণে বিকেন্দ্রিত শ্রমশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দৃষ্টির একটি ব্যাপক পরিকল্পনাও অন্তর্নিহিত আছে। এইরূপ পরিকল্পনার অভাবে বিকেন্দ্রিত শ্রমশিল্পকে বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ-ব্যবস্থাই আখ্যা দিতে হবে। এই জাতীয় বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ যন্ত্রযুগের আগে ছিল। স্বভাবতই যন্ত্রযুগের প্রথম আঘাত এদের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এগুলি তছনছ হয়ে গেল। বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা কিন্তু পৃথক। স্বয়ং তছনছ না হয়ে যন্ত্রযুগকেই এ ছিন্নভিন্ন করবে। আধুনিক যন্ত্রযুগ শুধু নামেই যন্ত্রযুগ। আসলে এ অত্যন্ত অযন্ত্রিত। সাম্যবাদীরা এর বদলে সু-যন্ত্রিত যন্ত্রযুগ চান। কিন্তু অস্ত্রেরই মত যন্ত্রও মনুষ্যসৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং এ অমানুষিক। সুতরাং এর মানবীকরণ এক প্রকার অসম্ভব। পক্ষান্তরে মানবকেই এ তার হাতের পুতুলে পরিণত করে। এখানে অস্ত্র শব্দের অর্থ হচ্ছে সংহারক আয়ুধ। শল্য-চিকিৎসকের করধৃত উপকারক অস্ত্র এর থেকে ভিন্ন। এইভাবে যন্ত্র বলতে এখানে মানুষকে বেকার, অলস অথবা জড় বস্তুতে পরিণতকারী লুণ্ঠনকারী যন্ত্রই বুঝতে হবে। এ ক্ষেত্রে যন্ত্র শব্দের অর্থ মনুষ্য-হস্তে শোভিত মনুষ্যমাত্রকে সহায়তাদানে উন্মুখ মানব-স্বভাবের পরশে ধন্য উপকরণ নয়। একটিমাত্র উদাহরণ দিতে হলে হুইলব্যারোর (এক প্রকারের এক চাকার গাড়ী) নাম বলতে হবে। আমরা একটি কূপ খনন করছি। তার মাটি সরাবার কাজে প্রত্যহ এই যন্ত্রটি আমাদের কী

পরিমাণ সাহায্য করছে, তা আমি স্বচক্ষে দেখছি। এর কার্যকলাপ দেখে মনে মনে আমি গুনগুন করতে থাকি, "নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র"। হুইলব্যারোও যন্ত্রযুগের অবদান। সুতরাং আমরা যখন বলি যে বিকেন্দ্রীকরণ যন্ত্রযুগকে চুরমার করে দেবে, তখন তার অর্থ এই যে যন্ত্রযুগের কাছ থেকে এইভাবে কাজ হাসিল করে তাকে আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেব। আর এইভাবে কাজ আদায় না করলে যন্ত্রযুগকে ভাঙ্গাও যাবে না। কিন্তু এরকম শক্তি অর্থাৎ যন্ত্রযুগকে হজম করার ক্ষমতা প্রাচীন বিকেন্দ্রিত শ্রমশিল্পের ছিল না। বিকেন্দ্রিত শ্রমশিল্প ও বিকেন্দ্রীকৃত শ্রমশিল্পের মধ্যে এই এক মৌলিক শক্তিভেদ বিদ্যমান। এইজন্য বিকেন্দ্রীকরণ শব্দ এবং তৎসংশিষ্ট অর্থ, উভয়ই নূতন। এই বিশ্লেষণের প্রতি দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হবে যে, বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়, তার অধিকাংশই কঠিন শিলার উপর তলোয়ার চালাবার মতই অকার্যকরী।

তবে বিকেন্দ্রীকরণকে শুধু শ্রমশিল্পের গণ্ডিতে সীমিত রাখলে চলবে না। বিকেন্দ্রীকরণ-প্রক্রিয়া রাজসত্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অহিংস সমাজ-রচনার আদর্শ ঘোষণাকারীরাও কখনও কখনও এ কথা ভুলে যান। সময় সময় তাঁদের কণ্ঠে এই দাবি ধ্বনিত হয় যে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ করে সেই বিকেন্দ্রীকরণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য (অন্ততঃ সাময়িকভাবে) শক্তিশালী-কেন্দ্রীয় শাসন চাই। সাম্যবাদীরাও কল্পনা করেন যে রাজসত্তা শেষ পর্যন্ত রৌদ্রে রাখা ঘি-এর মত গলে যাবেই। কিন্তু এ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা চান যে রাষ্ট্রসত্তা শুধু জমাট ঘি-এর মতই হবে না, বরং ট্রটস্কির মাথায় যে লোহার হাতুড়ির ঘা পড়েছিল— তারই মত কঠিন ও মজবুত হবে। অতি প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সকল রাজনৈতিক মতবাদের "দায়িত্বশীল" দাদার দল "শুধু পরিবর্তনের কালটুকুর জন্য" এইরকম পরস্পরবিরোধী পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু শুধু গান্ধীজীই আদি, মধ্য, অন্ত—অর্থাৎ সকল অবস্থাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা পেশ করেছেন। তবে আমাদের এইসব বন্ধুর বক্তব্য হচ্ছে, "হয় একে আপনারা রাম-রাজ্যের চিত্র মনে করে প্রাচীন ত্রেতা-যুগে সরিয়ে দিন, আর নয় ভাবী সর্বোদয়ের পরিকল্পনা মনে করে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখুন। কিন্তু দোহাই আপনাদের, এখনকার মত এসব ভাষায় কথা বলা ছাড়ুন।"

॥ ৭ ॥

হিংসা বিচার

গান্ধী-দর্শন ও সাম্যবাদের ভিতর অনেক বিষয় বিরোধ থাকলেও কোথাও কোথাও এ দুয়ের মধ্যে ঐক্যও আছে। আর সে ঐক্য অতীব মহত্ত্বপূর্ণ। রাম-রাবণের ভিতরও কবি "র" কার সাম্য দেখেছিলেন। আর এ তো স্পষ্টতঃ সম্ভাবনা-প্রেরিত লোক-কল্যাণকামী মতবাদ। এদের ভিতর কেন তবে মিল থাকবে না? নিপীড়িতদের পক্ষাবলম্বন করা উভয়েরই স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। 'কুমারসম্ভবে' কালিদাস লিখেছেন, "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতিন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥" অর্থাৎ অনেক গুণের ভিতর দু-একটি দোষ সহজেই বিলীন হয়ে যায়; বরং এর জন্য গুণসমূহ অধিকমাত্রায় সুশোভিত হয়ে ওঠে। এর বিপরীত কথাটাও সত্য। অর্থাৎ দু-একটি উচ্চগ্রামের গুণের কারণ সমস্ত দোষ আত্মগোপন করতে পারে। এটা হচ্ছে উচ্চগ্রামের বৈশিষ্ট্য। সমগ্র বিশ্বে দরিদ্রদের আজ এমন দীন দশা যে, মাতার মত ব্যাকুলতার সঙ্গে যে-ই তাদের রক্ষণাবেক্ষণই নয়, তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করার সাহস এবং উৎসাহপূর্ণ কর্মোদ্যমের পরিচয় দেবে, অমনি তার সাতখুন মাপ। বলতে হবে সে যেন সর্বপাপহারী হরিনাম গ্রহণ করেছে!

গান্ধী-দর্শন ও সাম্যবাদ জননীর মত আকুল আগ্রহে দরিদ্রদের উদ্ধার করতে চায়। কিন্তু কখনও কখনও মাতার অন্ধ স্নেহ ত্বরিৎ ফললাভের মোহচক্রে পড়ে স্থায়ী পরিণামকে উপেক্ষা করে থাকে। সাম্যবাদেরও এই দশা হয়েছে। শুধু মাতার ব্যাকুলতায় সংকটত্রাণ সম্ভব নয়। ব্যাকুলতায় তো শুধু সমস্যা দূরীকরণের উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিপদ-বাধা অপসারিত করার জন্য চাই গুরুর কুশলতা।

জনৈক নৈষ্ঠিক অথচ স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন কমিউনিস্টের সঙ্গে আমার আলোচনা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হিংসাকে কি সর্বসাধারণের আয়ুধ বলা চলে?" তিনি উত্তর দিলেন, "সাধারণভাবে অবশ্য হিংসা সর্বসাধারণের অস্ত্র হতে পারে না। তবে বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ উপায়ে জনসাধারণকে হিংসার জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে।"

আমি বললাম, "ধরে নিন যে বিশেষ অবস্থার জন্য তাদের তৈরী করা যেতে পারে; কিন্তু তবু এতে তাদের সাহায্য হবে কি প্রকারে? একবার

রোজগার করে আজীবন বসে বসে খাবে—এ তো আর চলবে না। তেমনি একবার এই উপায়ে বিপ্লবের আবাহন করার পর আর কিছু না করা সত্ত্বেও যে চিরকাল তা ফল দিতে থাকবে, তা তো বলা যায় না। যে শক্তি স্বভাবতঃ আমাদের ভিতর নেই, তার ভরসায় কোন কাজ করতে গেলে শেষ পর্যন্ত এটা যাদের স্বভাব-ধর্ম, তাদেরই হাতে ক্ষমতা চলে যাবে। ধার-করা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করতে নামলে আজ না হক কাল কারবার তো পুঁজির মালিকের হাতে চলে যেতে বাধ্য। আর যদি বলেন যে জনসাধারণের স্বভাবই বদলে দেবেন, তাহলে আমার জবাব হচ্ছে এই যে, তা অসম্ভব। তবে যদি কোন দিন তা সম্ভবও হয়, অর্থাৎ সারা সমাজ ক্রুর স্বভাব হয়ে যায়, তবে তাকে এক ভয়ংকর ঘটনা বলতে হবে। এ ঘটনার পরিণাম আপনাদের কল্পনার চেয়েও ভীষণ হবে।"

তিনি বললেন, "হতে দিন ওরকম। যে কোন পরিণাম আসুক না কেন, আজকের অবস্থা তো বদলাতে দিন। আমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট।"

আমি উত্তর দিলাম, "ক্ষণিকের জন্য হয়ত এই মধুর ভ্রম হবে যে আজকের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পরক্ষণেই আবার দ্বিগুণ জোরে পূর্ব স্থিতিই ফিরে আসবে।"

তাঁর জবাব হল, "আসে আসুক। পরের কথা পরে ভাবা যাবে।"

আমি বললাম, "এটা কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচায়ক হল না। এ তো ব্যাকুলতা-তাড়িত বুদ্ধির ভাষা। সাম্যবাদীরা তো বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দাবি করেন।"

তিনি বললেন, "অবশ্যই করে। সাম্যবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে, 'একবার হাতে ক্ষমতা পেলে আমরা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করব।' আমি অবশ্য চিরস্থায়ী ব্যবস্থার কথা বিশ্বাস করি না। কারণ এ বিশ্বে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তবুও ধনীক সম্প্রদায়কে তো এবার অন্ততঃ শ্রী-রহিত করা দরকার। ভবিষ্যতের সমস্যার সমাধানের ভার ভবিষ্যদ্বংশীয়দের হাতে।"

গোঁড়া কমিউনিস্ট হয়ত পূর্বোক্ত কমিউনিস্ট বন্ধুটিকে কাঁচা কমিউনিস্ট আখ্যা দেবেন। আমি তো এরকম লোকেদের "ভ্রান্ত স্থিতির মধ্যেও চৈতন্য-শীল" বলব। সাম্যবাদী তত্ত্বজ্ঞান যদি চিরকালের জন্য পোক্ত ব্যবস্থা করার দাবি করে, তাহলে বলতে হবে কমিউনিস্টরাও এক অফিংএর গুলি আবিষ্কার করেছেন। সাধারণ কমিউনিস্টদের মনোভাব হচ্ছে, "সময় চলিয়া যায়, নদীর

স্রোতের প্রায়, যে জন না বুঝে তারে ধিক্ শত ধিক্।" মাতার ব্যাকুলতা এর ভিতর আছে; কিন্তু গুরুমাতার দূরদৃষ্টির নামগন্ধ নেই।

॥ ৮ ॥

দ্বিবিধ সাধন

সে যাই হক, স্বরাজপ্রপ্তির পর ভারতে অজ্ঞান জনসাধারণের দশা আজ অত্যন্ত শোচনীয়। তারা যে কোন প্রকারে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি চায়। বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে বাছবিচার করার ক্ষমতা তাদের নেই। আর এর অবকাশও তাদের নেই। তাদের অবস্থা হচ্ছে—যে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করে, সেই তাদের ভগবান। সুতরাং পুস্তকের উপসংহারে কিশোরলালভাই যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, তার কথা ভুললে চলবে না। শুধু সাম্যবাদের বিরোধ করে বা তাঁদের দর্শনকে নস্যাৎ করে অথবা তাঁদের উপর দণ্ডশক্তির দমনের রথচক্র চালিয়ে কোন ফল হবে না। বর্ষা-সমাগমে যেমন স্ফীতকায় নদনদী ও সর্বপ্রকার জলধারা সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি স্বরাজে প্রত্যেকটি সেবকের সেবাধারা দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত এবং গ্রামীণ জনতার প্রতিই প্রবাহিত হওয়া উচিত।

সৌভাগ্যক্রমে এত দুর্দশা সত্ত্বেও জনসাধারণের মন এখনও বিষিয়ে ওঠে নি। গ্রামবাসীদের মনে এখনও এমন ভক্তি আছে যে, তারা মনে করে যে কোন কালে যদি তাদের উদ্ধার হয়, তবে তা গান্ধীজী-নির্দিষ্ট পথেই হবে। বর্তমান সরকারের কর্ণধারগণ সকলেই গান্ধীজীর সহযোগী। দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কংগ্রেস। এর এত যশ-প্রতিপত্তির পিছনেও গান্ধীজী। সর্বোদয় আদর্শের গঠনমূলক কর্মীরা তো একেবারে গান্ধী-আদর্শের ধ্বজাধারক। ভারতের সমাজতন্ত্রীরাও গান্ধীজীরই সন্তান এবং তাঁরা ঘোষণা করে থাকেন যে, এ দেশে সত্যাগ্রহী সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপনা করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। নিজ নিজ পৃথক আদর্শ বজায় রেখেও যদি এঁরা সকলে মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যথাশক্তি জনসাধারণের সেবায় লেগে পড়েন, তাহলে দুঃখ, দারিদ্র্য ও দৈন্য কি আর দেশবাসীকে চোখরাঙানি দিতে পারবে? অথচ এই চারটি শক্তি আজ চার রাস্তা ধরেছে এবং পঞ্চম শক্তি রঙ্গভূমিতে দৌড়ে আসছে! কিন্তু কি এই পঞ্চম শক্তি? উপনিষদের ভাষায় "মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"—ধাবমান পঞ্চম শক্তি হচ্ছে মৃত্যু।

একজন যদি বলে যে, জনসাধারণ সত্যসত্যই অনাহারে মারা যাচ্ছে, তাহলে দ্বিতীয় জন অমনি জবাব দেয়, "না, না, অনশনে মরবে কেন? কোন-না-কোন রোগে মারা যাচ্ছে।" অনাহারী ব্যক্তিরও মৃত্যুর আগে কোন-না-কোন রোগ হয়েই থাকে। এ যেন স্বামী রামদাসের কথার মত :

"নাই আহার,
নাই ঠাঁই মাথা গুঁজিবার।
কেমনে বল তবে গাই?
ভিক্ষা কোথা গেলে পাই?"

এই অবস্থা আজ দেশে চলেছে।

আমি কিন্তু এর জন্য কারও প্রতি দোষারোপ করি না বা নিরাশও হই না। দোষ এইজন্য দিই না যে বিরাট দেশের সমস্যাও বিরাট হয়ে থাকে। সুতরাং এত বড় দেশে যে মতভেদও বিরাট হবে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? হতাশা আমার ভিতর নেই। যতক্ষণ আমার হাতে একটি কোদালও থাকবে, আমি হতাশ হব কেন? আমাদের ওখানে একবার আলোচনা হল যে স্থানে স্থানে কূপ খনন করলে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বেড়ে যাবে এবং বুভুক্ষিতের সংখ্যা হ্রাস পাবে। সেইজন্য এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমি বললাম, "আমরাই তো সরকার। সরকার কি আর কোন পৃথক সত্তা? এস, আমরাই কূয়া খুঁড়ে নিই।" কাজ শুরু হল। কিন্তু কূপ-খননকারীদের তিলমাত্র পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। কোদাল তবু নিজের কাজ করে চলল। খননকারীরা জলের হদিস না জানলে কি হবে, কোদাল কিন্তু সে খবর রাখত। কোদাল তাই মাটি খুঁড়েই চলল এবং দেখতে দেখতে জলের দর্শন পাওয়া গেল। আশেপাশের লোক তীর্থ-বারি বিবেচনা করে সে জল পান করা শুরু করল। তখন সে গ্রামের মোড়ল বলল, "বৃদ্ধ কোটী বাবাও (পবনারের ৮০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ বিনোবা-ভক্ত কর্মী) যখন কূয়া খোঁড়ার জন্য খাটতে পেরেছেন, তখন আমরাই বা কেন একটা কূয়া খুঁড়তে পারব না?" মোড়লমশাই নিজেদের গ্রামে কূয়া খোঁড়া শুরু করে দিলেন। পবনারের পার্শ্ববর্তী সুরগাঁও-এর যুবকরা তো ভেলকি দেখিয়ে দিল! তারা বলল, "আজ দেওয়ালীর ছুটি। চল সব, বাবাজীর কূয়ায় কাজ করে আসি।" আর আমাদের কোন খবর না দিয়েই দশ পনের জন যুবক আমাদের কূয়ায় এসে হাজির হল। তারপর প্রত্যেকে চার ঘণ্টা সেখানে পরিশ্রম করে কোন

রকম আত্মপ্রচার না করে নীরবে ফিরে গেল। জনসাধারণের হৃদয়ে ঈশ্বর যখন এমন দিব্য প্রেরণা সৃষ্টি করেন, তখন আর নিরাশ হবার কারণ কী? রামদাস জিজ্ঞাসা করছেন, "ভিক্ষা কোথা গেলে পাই?"—কার দুয়ারে হাত পাতব? আমেরিকার কাছে? যারা স্বরাজ পেয়েছে তারা কি কখনও অপর দেশের কাছে হাত পাতে? তাই আসুন, আমরা শ্রম-দেবতার উপাসনা করব। আর চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাইব। শ্রম-দেবতা তো বলছেনই যে, চাইলে পাবে, খুঁজলে মিলবে।

আমি তো অন্ততঃ "কাঞ্চন মোহ মুক্তি" এবং "শরীর শ্রম" ছাড়া ভারতের মুক্তির অন্যবিধ পথ দেখি না। আমার মতে এরই ভিতর গান্ধী-বিচারের সার নিহিত। সাম্যবাদের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে এবং সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ—উভয় সমস্যারই সমাধান এর ভিতর বিদ্যমান।

পরম ধাম, পবনার বিনোবা
২৫-১১-১৯৫০

গান্ধী ও মার্কস

॥ ১ ॥

প্রয়োজনীয়তা

অনেকে বলেন যে, সাম্যবাদ থেকে হিংসা বাদ দিলে সাম্যবাদ ও গান্ধীবাদ সমরূপ ধারণ করে। তাঁদের মতে গান্ধীজীকে অহিংস সাম্যবাদী বলা চলে। তাঁদের ধারণা গান্ধীজী ও সাম্যবাদীদের ভিতরে অন্তিম লক্ষ্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা নেই। তফাত শুধু লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থা নিয়ে। সাধনশুদ্ধি, অর্থাৎ সত্য অহিংসার উপরই গান্ধীজী জোর দিতেন। সাম্যবাদ যদি এইটুকু মেনে নেয়, তাহলে গান্ধীবাদ ও সাম্যবাদ একই জিনিস হয়ে দাঁড়ায়।

উপরি-উক্ত বিচারধারার সমর্থনে গান্ধীজীর কথা উদ্ধৃত করা হয়।* নিজ আদর্শের সমর্থন পেলে গান্ধীজী অন্য কোন চিন্তানায়কের সঙ্গে তাঁর বা তাঁর মতবাদের তুলনা করা আপত্তি করতেন না। কেউ যদি বলতেন যে, তিনি পুঁজিপতি, জমিদার এবং রাজা-মহারাজদের বন্ধু, তবে তিনি তাতেও রাজী ছিলেন। আবার কেউ যদি এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা, অর্থাৎ তিনি দরিদ্র-নারায়ণের যথার্থ সেবক ও খাঁটি সাম্যবাদী বলতেন, তবে তিনি সেকথাও ঠিক মনে করতেন। কেউ বলত যে, তিনি খাঁটি সনাতনী, বৈষ্ণব বা প্রথম শ্রেণীর বেনিয়া, তবে তাতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। আবার কেউ যদি বলত যে তিনি হিন্দুধর্ম-সংস্কারক, অথবা খাঁটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা শূদ্র, তবে তিনি তাতেও রাজী ছিলেন। কখনও কোন জৈন খুশী হয়ে বলতেন যে, গান্ধীজী খাঁটি জৈন, কোন খ্রীষ্টান আবার হয়তো বলতেন যে, তিনি তো একজন সৎ খ্রীষ্টান এবং হয়তো কোন মুসলমান বলতেন যে, তিনি আদর্শ মুসলমান। গান্ধীজী এসব উপমাকে অনেকটা মেনে নিতেন। কারণ এসব উদাহরণ তাঁর আদর্শের সম্যক উপলব্ধির সহায়ক হত।

---

* নিজের সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী মিত্রদের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে গান্ধীজী বরাবরই এই দাবি করতেন যে, তিনি তাঁদের চেয়ে বেশী সাম্যবাদী বা সমাজবাদী। লক্ষ্য সকলের একই। শুধু লক্ষ্যে পৌছাবার উপায় ও কর্মপদ্ধতিতে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।" (গান্ধীজীর সাম্যবাদ —প্যারেলাল। হরিজন ৩১-৩-৪৬) "নিজেকে আমি কমিউনিস্টও বলে থাকি।" ("চার বৎসর পর"—প্যারেলাল। হরিজন ৪-৮-৪৬)

তবে এসব উপমাকে ভাসাভাসা তুলনা বা রূপক মনে করাই সমীচীন। কিন্তু যেখানে বিধিবদ্ধ মতবাদ উপস্থিত করতে হবে, সেখানে এ জাতীয় অতীব সরল ব্যাখ্যা বা পরিভাষা বিভ্রম ঘটাতে পারে। এরকম তুলনা দুটি সিদ্ধান্তের আদর্শগত পার্থক্যকে গোপন করে দেয় এবং এর ফলে কোন সিদ্ধান্তই স্বরূপে প্রকট হতে পারে না। গান্ধীবাদকে হিংসাবিরহিত সাম্যবাদ আখ্যা দিলে শ্রবণকারীর মনে এই ধারণা হয় যে, সাম্যবাদে যেটুকু হিংসার ময়লা আছে, তা পরিষ্কার করে দিলে গান্ধীবাদ ও সাম্যবাদ একই রূপ পরিগ্রহ করে। এই জাতীয় সমীকরণ-পদ্ধতি যদি ঠিকও হয়, তবু স্মরণ রাখতে হবে যে, এই "হিংসা-বিরহিত" ছোট্ট ব্যাপারটি ছোট্ট মোটেই নয়, এ এক উত্তুঙ্গ-শিখর শৈল। এই পার্থক্যটুকুর মধ্যে এত বিশাল অর্থ অন্তর্নিহিত যে, এরকম তুলনা শেষ পর্যন্ত নিরর্থক প্রমাণ হয়। লাল মানে সবুজ-বিযুক্ত হলদে ও নীল বা কীট হচ্ছে সর্প-বিযুক্ত বিষ বলা আর পূর্বোক্ত উপমা পেশ করা সম-পরিমাণে ভ্রমাত্মক।

এইভাবে সহজ ব্যাখ্যা করার লোভ আমাদের মধ্যে এইজন্য হয় যে, পাকে-প্রকারে আমাদের মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে গেছে যে, আজকালকার জনসাধারণ মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের কথা পছন্দ করে ও ভাবে যে শেষ পর্যন্ত মানুষের দুঃখ দূর করার নিদান ওর থেকেই পাওয়া যাবে। সুতরাং সর্বসাধারণের রুচিগ্রাহ্য করতে হলে গান্ধীবাদকেও সাম্যবাদের ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া এই বিচারধারায় লোকের মনে আরও একটি ভয় আছে। তাঁরা মনে করেন, সাম্যবাদ জিনিসটি ভাল হলেও চঞ্চলগতিতে আমাদের সমাজে এর আসার দরকার নেই এবং তাঁদের মতে গান্ধীবাদে এমন কিছু আছে, যা কিনা এই গতির বেগ ধীর করতে পারে ও ফলে ধীরে-সুস্থে ধাপে ধাপে সমাজ-পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। এইজন্য সমাজবাদ স্থাপনা করতে হলে মাঝে গান্ধীবাদকে রাখা লাভদায়ক। এইভাবে গান্ধীবাদকে সমাজবাদের হাতিয়ারে পরিণত করার মনোবৃত্তি দেখা দেখা যায়।

আমার মতে এ মনোভাব যথার্থ নয়। নিজ আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক বিশ্বাস এবং বিচার ও আচারে জনসাধারণের যেসব বড় বড় বিপ্লব সাধন করা কর্তব্য, তাদের দৃষ্টি এর ফলে তা থেকে দূরে চলে যায়। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ক্রান্তিকারী ব্যাপার তো ব্যক্তির জীবনে বিপ্লব সাধন করার প্রচেষ্টা। কারণ শেষ পর্যন্ত এই মৌলিক পরিবর্তন থেকেই তো সব

বিপ্লবের জন্ম হবে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের জন্য আমরা যে বিপ্লব চাই, তার বীজ তো এইখানে। এই মৌলিক সিদ্ধান্তের প্রতি জনমানস কেন্দ্রিত হওয়া প্রয়োজন। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে গান্ধী ও মার্কস, লাল সবুজের মত পৃথক। তবে হ্যাঁ, এমন এক জাতীয় চক্ষুরোগ আছে, যার ফলে মানুষ লাল ও সবুজের পার্থক্য বুঝতে পারে না এবং দুই রঙকেই কালচে মনে করে। কিন্তু লাল আর সবুজের মধ্যে যতটুকু মিল, তার চেয়ে বেশী মিল গান্ধী ও মার্কসের ভিতর নেই।

আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার করা উচিত। গান্ধী ও মার্কসের ভিতর যদি শুধু অহিংসারূপী সাধনের জন্য পার্থক্য থাকে এবং সমাজবাদী জীবনব্যবস্থা রচনা করা যদি কংগ্রেস বা "গান্ধীবাদীদের"ও অন্তিম লক্ষ্য হয়, তবে অহিংস উপায়ে এ আদর্শে উপনীত হবার অনুকূল সময় এখনই। কারণ হচ্ছে এই যে, আজ ভারতের শাসন-বল্লার কর্ণধার হচ্ছেন এমন সব ব্যক্তি, যাঁরা গান্ধীজীকে "রাষ্ট্রপিতা" বলে মনে করেন এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁরা গান্ধীজীর নাম ও আদর্শের দোহাই পেড়ে থাকেন। সুতরাং সাম্যবাদীদের হাতে ক্ষমতা গেলে তাঁরা যা করতেন, সরকার স্বয়ং আগে থেকে তার সব কিছু করে তাঁদের আন্দোলনকে নিরর্থক করে দিতে পারেন এবং তাঁদের ভিত্তিই এইভাবে নষ্ট করে দিতে পারেন। হিংসাত্মক বিপ্লবের কথা তখনই ওঠে, যখন সরকারী ব্যবস্থা সাম্যবাদে বিশ্বাসীদের অনুকূল প্রতীয়মান হয় না এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে যখন ক্ষমতা হাতে পাবার আশা আর জনসাধারণের মনে থাকে না। কিন্তু যদি গান্ধীবাদ ও সাম্যবাদে কোন পার্থক্যই না থাকে, তবে একথা বলা যেতে পারে যে, বর্তমান সরকারের লক্ষ্যও সাম্যবাদ স্থাপন করা এবং সে অবস্থায় সরকার ও সাম্যবাদীরা সহযোগী কর্মী হয়ে পড়েন। তবে হ্যাঁ, সে অবস্থাতেও একটু বিবাদ থাকতে পারে—রাজসত্তা 'ক'-এর হাতে থাকবে, না 'খ'-এর হাতে? কিন্তু সে অবস্থায় জনসাধারণই বোধ হয় সাম্য-বাদীদের বলে দেবে, "আমরা আপনাদের পদ্ধতি চাই না। কারণ আপনারা যে অর্থব্যবস্থার প্রচার করেন, আমরা আগেই তা পেয়ে গেছি।"

কিন্তু এরকম কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আর এর কারণ হচ্ছে এই যে, গান্ধী ও মার্কসের ভিতর যে পার্থক্য, তা গণিতশাস্ত্রের সমীকরণের মত সহজ, সরল ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। বিভেদের মূল আরও গভীরে। এই বিষয়টি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য। আর এ রচনার উদ্দেশ্যও এই।

॥ ২ ॥

এক চৈতন্য সত্তা

গান্ধীজী ও মার্কসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, জীবন ও জগতের প্রতি উভয়ের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী। সাধ্য (এণ্ডস) ও সাধন (মীনস) বা রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, ধার্মিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে দু'জনের মধ্যে যেটুকু প্রভেদ দেখা যায়, তার সৃষ্টি এই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। সত্যি কথা বলতে গেলে শুধু মার্কসের সঙ্গেই গান্ধীজীর এই দৃষ্টিকোণের পার্থক্য নয়, পুঁজিবাদ বা যন্ত্রশিল্পবাদের সঙ্গেও তাঁর পার্থক্য এইখানেই।

পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের ভিতর যত মতানৈক্য বা সংঘর্ষের বীজ থাকুক না কেন, বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উভয় বিচারধারাই একমত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, উভয় মতবাদই পুঁজি ও ভূমির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং বৃহদায়তন কৃষি ও শিল্পের উপর বিশ্বাসী। উভয়েই অর্থ-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল। দুই বিচারধারাই যন্ত্রোদ্যোগ ও সম্পদের (পুঁজি ও জমি ইত্যাদি) পূজারী। এই পুঁজি ও যন্ত্রোদ্যোগের উপর কার নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং এর থেকে উৎপন্ন ফলের বিভাজন কোন্ পদ্ধতিতে হবে, এই নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ। নিজ অধিকার ও অংশের স্ফীতির জন্য উভয়েই সচেষ্ট।

একটি পথ যখন কোথাও দ্বিধাবিভক্ত হয়, তখন ভেদমুখে উভয় শাখার দূরত্ব দু'চার ডিগ্রি থাকলেও ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হতে উভয়ের মাঝে শত শত যোজন ব্যবধান পরিদৃষ্ট হয়। ভারতের মানচিত্রে কন্যাকুমারীর কাছে ইংরাজী y অক্ষরটি লিখে তার বাহু দুটিকে বাড়াতে থাকলে একটি গিয়ে থামবে পেশোয়ারের কাছে এবং অপরটি যাবে নেপাল পর্যন্ত। এইভাবে জীবন ও জগৎকে চৈতন্যের অভিব্যক্তি বা প্রকৃতির অভিপ্রকাশ মনে করার পরিণামে বাস্তবে উভয়ের পার্থক্য কিছুদূর পর্যন্ত এমন নগণ্য মনে হয় যে, একে যেন এক ডজনকে বারটা বলার ঝগড়ার মত দেখায়।* এইজন্য কয়েকটি স্থূল দৃষ্টিগোচর বিষয়ে মনে হয়, গান্ধীজী ও মার্কস যেন একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। উভয়ের আদর্শকে কার্যান্বিত করার সময় এ পার্থক্য পরিষ্কারভাবে প্রকট হয়।

গান্ধী ও মার্কসের মধ্যে সাদৃশ্য এইখানে যে, উভয়ের হৃদয়ই মানব-প্রজাতির

---

* পরিশিষ্ট '৪' দ্রষ্টব্য

কোটি কোটি নগ্ন, ক্ষুধার্ত, দলিত ও শোষিত, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, পশু ও বন্যজন্তুর মত স্থান হতে স্থানান্তরে তাড়িত ও হৃত মূক জনসাধারণের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও দরদে পূর্ণ ছিল।* মানব-পরিবারের অধিকাংশই হচ্ছে এরা, অথচ এদেরই এই দুরবস্থা। কিন্তু পৃথিবীতে সুখের উপকরণের কোন স্বল্পতা নেই। পৃথিবীতে এ পরিমাণ সম্পদ আছে, যাতে সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে ও আত্মবিকাশ করতে পারে।

বিশেষতঃ পৃথিবীতে যখন এর আগে অনেক মহান সভ্যতার প্রকাশ দেখা গেছে ও এখনও এরকম সভ্যতা অনেক জায়গায় রয়েছে, আর এই সভ্যতা যখন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান, শিল্প-কৌশল, সুনিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থা, ভব্য প্রতিষ্ঠানাবলী, নগর ও হর্ম্যরাজী রচনা করেছে এবং যখন আত্মা ও প্রকৃতির রহস্যের গভীর হতে গভীরতর সন্ধান চলছে ও মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য এমন সব সাধন আবিষ্কার করা হয়েছে যার তুলনা চলে রূপকথার রাজত্বের সঙ্গে, তখনও একটি বিশেষ শ্রেণীর এই চরম দুরবস্থা একান্ত পীড়াদায়ক। গান্ধীজী ও মার্কস, উভয়ের মনেই এই তীব্র বাসনা ছিল যে, এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা নির্মাণ করা উচিত, যাতে প্রত্যেকে প্রকৃতি এবং মানব-বুদ্ধির এই অবদানের সম অংশ পেতে পারে।

কিন্তু গান্ধীজী যখন এই আদর্শের পরিপূর্তির জন্য সত্য ও অহিংসার প্রতি নিষ্ঠা দেখাতেন, তখন মার্কসের (না মার্কসবাদীর? কারণ অনেকে বলেন মার্কস্ ও মার্কস্‌বাদীদের মধ্যে পার্থক্য গান্ধী ও গান্ধীবাদীদেরই মত।)† কাছে

---

* "অভিজাত সম্প্রদায় ও জনসাধারণ এবং রাজা ও প্রজার ভিতর যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান তাকে যেন এই বলে কেউ সমর্থন না করেন যে, একের প্রয়োজন অন্যের চেয়ে বেশী। এ কথা অর্থহীন ও একে আমার যুক্তির অপব্যাখ্যা আখ্যা দিতে হবে। আজ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, তা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। বিদেশী আমলাতন্ত্র এবং স্বদেশী শহরবাসী গ্রামের অধিবাসীদের শোষণ করে থাকে। গ্রামবাসী অন্ন উৎপাদন করে স্বয়ং ক্ষুধার্ত থাকে। তাদের ঘরে দুধ হয়, অথচ তাদের শিশুরা একবিন্দু দুধের মুখ দেখতে পায় না। কী গভীর লজ্জার কথা এ! প্রত্যেকের জন্য পুষ্টিকর আহার, সুন্দর বাসগৃহ, শিশুদের শিক্ষার যাবতীয় সুবন্দোবস্ত ও রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া চাই।" (গান্ধীজীর সাম্যবাদ—প্যারেলাল, হরিজন ৩১-৩-৪৬)

† লুই ফিশার, "কমিউনিস্টরা নিজ স্বার্থসাধনের জন্য মার্কসের শিক্ষাকে দূষিত করে দিয়েছেন।" গান্ধীজী, "লেনিন সম্বন্ধে কি বল?" ফিশার, "লেনিন এর সূচনা করে যান এবং স্ট্যালিন এর পূর্ণ বিকাশ করেছেন।" "চার বৎসর পর" হরিজন, ৪. ৮. ১৯৪৬)

সাধনের দোষগুণ মোটেই বিবেচ্য বিষয় নয়। যে উপায়েই দ্রুত উদ্দেশ্য-পূর্তি হচ্ছে বলে মনে হয়, সে উপায় অবলম্বনে তাঁর কোন আপত্তি নেই।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, দুজন বিখ্যাত, বুদ্ধিমান, উদার-হৃদয় এবং একই রকম পবিত্র ও মহান লক্ষ্যের পূজারী মহাপুরুষের ভিতর মানবজীবনের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ এই রকম এক বিষয়ে এ জাতীয় মতভেদ সৃষ্টি হল কেন? এই মতভেদের সঠিক কারণ আমরা আবিষ্কার করতে পারি আর না-ই পারি, এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হয় যে, হয় কোন একজনের বা হয়ত দুজনেরই বিচার-পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি আছে, নচেৎ তাঁরা যাকে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় বলে ধরে নিয়েছিলেন, তার অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

শত শত বৎসর যাবৎ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এই কথা জানার প্রয়াস করছেন যে এই জড় ও চেতনে পূর্ণ জগৎ আসলে কী? এর মূলতত্ত্ব এক, না দুই, না অসংখ্য? চেতন থেকে জড়ের সৃষ্টি, না জড় থেকে চেতন? চেতনকে স্বীকার করে নিলেও প্রশ্ন ওঠে আত্মা এক না অসংখ্য? এ বাদবিসংবাদের অবসান কোনদিন হবে কিনা বলা কঠিন। আর প্রত্যেক যুগে কেউ না কেউ এমন দেখা দেবেন, যিনি এ সম্বন্ধে ভিন্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করবেন। এ মতভেদ যদি শুধু "কাব্যশাস্ত্র বিনোদন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্" অর্থাৎ পণ্ডিতদের সময় কাটাবার উপায় বা চিত্তবিনোদনের সাধন হত, তা হলে না হয় কথা আলাদা ছিল। কিন্তু ব্যাপার তো তা নয়। এর প্রতিক্রিয়া মানুষের প্রতিটি আচার-ব্যবহারে অনুভূত হয়। এর একটি দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করলে বিশ্ব-রচনাপদ্ধতি ও তাতে ব্যক্তির স্থান এক ধরনে নির্দেশ করার চেষ্টা হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করলে বিশ্ব ও ব্যক্তির স্থান নির্ধারণ হয় ভিন্ন প্রকারে। বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলে এসব মতবাদের সংখ্যা হয়ত কমতে পারে। কিন্তু একটি সীমার পর বিজ্ঞান আজও শুধু কল্পনা ও অনুমানের পর্যায়ে রয়ে গেছে। জড় ও চেতনের সম্বন্ধ স্থাপন করার উপযুক্ত যোগসূত্র এখনও পাওয়া যায় নি। এ সম্বন্ধে যে কোন রায়-ই দেওয়া হক না কেন, সবই থিওরির পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু মানুষের ভিতর এমন একটা জেদী একগুঁয়ে ভাব আছে, যার ফলে কোন একটি "বাদের" উপর তার বিশ্বাস জন্মালে, সে তাকে শুধু নিজের জন্য ষোল আনা সত্য মনে করে চলে না। সে চায় বিশ্বের সমস্ত কাজ

করবার ঐ বিশেষ "বাদ" থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলুক এবং এর জন্য সে মিথ্যাভাষণ, বলপ্রয়োগ আদি যাবতীয় অসৎপন্থা অনুসরণে দ্বিধাবোধ করে না।

এইসব মতবাদের ভিতর দুটি মনে করে যে এই বিশ্বের মূলে একটিমাত্র তত্ত্ব বিদ্যমান, দুটি নয়। গান্ধী ও মার্কস, উভয়কেই একতত্ত্ববাদী বলা চলে। কিন্তু এই এক তত্ত্ব কী, এই নিয়ে তাঁদের ভিতর তীব্র মতভেদ বিদ্যমান। গান্ধীজীর মতে সে মূল তত্ত্ব হচ্ছে চৈতন্য। যাকে আমরা জড় সৃষ্টি বলি, গান্ধীজীর মতে তাও চৈতন্যের অভিপ্রকাশ, চৈতন্য ছাড়া তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অন্ততঃ চৈতন্যের অভাবে এর অস্তিত্বের কোন প্রমাণই পাওয়া অসম্ভব। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—সবই চৈতন্য থেকে এবং চৈতন্যের ভিতর। চৈতন্যই একমাত্র অনন্তকাল স্থায়ী ও শাশ্বত। আর সব শক্তি, হয় এর কিরণ-স্বরূপ বা এরই অভিপ্রকাশ। সে সব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল ও কোন-না-কোনদিন তার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র চৈতন্যই ত্রিকালোত্তর সত্য। আর এ এমন এক গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব, যার সঙ্গে প্রত্যেকের নিত্য পরিচয় হওয়া সত্ত্বেও এ তাদের নয়নগোচর নয় এবং অনেকের কাছে তো আজীবন এ প্রত্যক্ষ হয় না। শুধু তাই নয়, সময় সময় তো এর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং যাঁরা এর অস্তিত্ব স্বীকারও করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্রেফ শ্রদ্ধাপরবশ হয়ে এরূপ করে থাকেন। একবিন্দু জলে যেমন বিশাল মহাসিন্ধুর বারিরাশির গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তেমনি ক্ষুদ্রাপিক্ষুদ্র কীটাণুর ভিতরেও মহাপরাক্রমী সিংহ, বিপুলকায় মাতঙ্গ বা মহাবুদ্ধিশালী মনুষ্যের মধ্যে স্থিত চৈতন্যের সম্পূর্ণ অংশ রয়েছে। শক্তির অভিব্যক্তিতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, মূল পদার্থ প্রত্যেকেরই ভিতর এক ও সমপরিমাণ। নিদ্রিত সিংহের শৌর্য বোঝা যায় না; কিন্তু দৃষ্টির অগোচর বলেই যে তা নেই, একথা বলা চলে না। এইভাবে সমগ্র শক্তি প্রকট হক বা না-ই হক, প্রত্যেক অণু-পরমাণুতেও সে চৈতন্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। চৈতন্যের দ্বিতীয় অদ্ভুত রহস্য হচ্ছে এই যে, কীটাণু থেকে শুরু করে বড় প্রাণী পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিভিন্ন জীবের ভিতর এর প্রকাশ স্বতন্ত্র ও স্বয়ংপূর্ণ মনে হলেও আসলে এ এক অখণ্ড সত্তা। মূল তত্ত্বের দৃষ্টি থেকে বিচার করলে ছোট ও বড় জীবে, পাপী ও পুণ্যাত্মার ভিতরে কোন ভেদাভেদ নেই। কয়লা ও হীরার মধ্যে রূপ, গুণ ও মূল্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান হওয়া সত্ত্বেও উভয় পদার্থই একই কার্বনের দুই রূপ। প্রতিটি জীব

সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। কোন্ গূঢ় কারণে এ প্রভেদ তা অবশ্য আমরা জানি না। কিন্তু গান্ধীজীর মনে এতদুভয়ের অভিন্নতা সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ ছিল না। তাঁর কাছে জড় ও চেতন, গুণ ও দোষ, সংকীর্ণ ও সুবিশাল আদি বহু বৈচিত্র্যমণ্ডিত এই বিশ্ব-প্রকৃতি একই চৈতন্যের অভিপ্রকাশ ছিল। পরম সত্য, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ইত্যাদি যে নামই দেওয়া হক না কেন, এ-ই হচ্ছে একমাত্র মূল চৈতন্য। প্রত্যেক মনুষ্য, পশুপক্ষী, বনস্পতি এবং কীটাণুকীটের মধ্যে যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, তা বাহ্য। আসলে এ সবই একই চেতন-সত্তার বিভিন্ন রূপ। এ সেই অনন্ত শক্তির সহস্রমুখী অভিপ্রকাশ। সবকিছুর মূলতত্ত্ব সেই আত্মা, যার কাছে 'আমি' 'তুমি' ও 'সে'-র পার্থক্য করার অবকাশ নেই। আমি যতদূর বুঝেছি জড় চৈতন্যময় বিশ্ব সম্বন্ধে গান্ধীজীর দৃষ্টিকোণ পূর্বরূপ ছিল।

এর সঙ্গে সম্বন্ধিত আর একটি বনিয়াদী বিষয়েরও খোলসা করা প্রয়োজন। এমন আরও কয়েকটি মতবাদ আছে যার অনুগামীরা গান্ধীজীরই মত একই আত্মাকে একমাত্র মূল তত্ত্ব বলে মনে করেন ও নিজ নিজ বিশ্বাসের প্রমাণস্বরূপ গান্ধীজীরই মত গীতা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের নজির পেশ করেন। তথাপি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে তাঁরা গান্ধীজীর সম্পূর্ণ বিরোধী এবং অনেক ব্যাপারে তাঁদের বরং মার্কসবাদের কাছাকাছি দেখা যায়। লক্ষ্য ও পন্থা সম্বন্ধেও দেখা যায় যে তাঁরা মার্কসের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন।

জড় চৈতন্যময় সমগ্র সৃষ্টিকে একই আত্মতত্ত্বের বিকাশ মনে করে গান্ধীজী তার থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তাকে নিম্নরূপ বলা যেতে পারে:

"যখন সবই ঈশ্বরের অভিব্যক্তি এবং আমিও তাঁরই অংশ, তখন কাকে খারাপ বলি, কার সঙ্গে বিবাদ করি আর কাকেই বা ঘৃণা করি? আমি কাকে দেখে ভয় পাব, আর কাকেই বা ভয় দেখাব? আমার কেই বা আপন কেই বা অপর? কাকেই বা আমি এমন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করতে পারি যে নিজ অভীষ্টপূরণে তাকে বলি দেওয়া যেতে পারে?

"তাছাড়া আসলে আমি সোঽহং হলে কি হবে? তার রীতিই এমন যে আমার সঙ্গে যুক্ত এই শরীরের মোহ এবং এই খাঁচাটিকে সুস্থ ও জীবিত রাখার অভিলাষ আমি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারি না। আমি দোষে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আত্মহত্যা করি না। বরং আত্মহত্যা করা অন্যায় মনে

করি। এমতাবস্থায় অপর কারও ভিতর অন্যায় দেখলে তাকে হননযোগ্য মনে করি কি করে?

"আসল কথা হচ্ছে এই যে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরময় এবং আমি কিছুই না—এই বিচার এখন বিশ্বাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে বেরোয় নি। এ অবস্থায় আমরা এখনও উপনীত হই নি। আজ আমাদের বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে ভেদাভেদ, রাগ-দ্বেষ ও হিংসা আদি দ্বারা আমরা পরিপূর্ণ এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে আমরা এইসব বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করে চলেছি। কিন্তু আসল সত্য যে পূর্বোক্ত রূপ, এ বিষয়ে আমাদের অটল বিশ্বাস আছে বলে আমাদের সমগ্র প্রযত্ন ঐ অবস্থায় উন্নীত হবার জন্যই হওয়া প্রয়োজন। আর এরকম হওয়া সম্ভব তখনই, যখন আমরা অহিংসাকে পরমধর্ম মনে করে জীবন-সাধনায় মগ্ন হব। একেই অবলম্বন করে আমরা জীবনের অন্যান্য ব্রত, ধর্ম এবং সমাজ-রচনার আদর্শ ও কর্মপন্থা আবিষ্কার করব। আমরা যদি হিংসার শরণ নেওয়া ও দুষ্টকে দণ্ড দেওয়া ইত্যাদি কার্যকে এর সঙ্গে মিলিয়ে ফেলি এবং এরকম করার অধিকার আমাদের আছে বলে ভাবি, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের বিশ্বাস শুধু শুষ্ক পাণ্ডিত্যের গণ্ডিতেই আবদ্ধ আছে।"

ঈশ্বর ও আত্মার তত্ত্বজ্ঞানে বিশ্বাসী অন্য মতাবলম্বী এবং গান্ধীজীর ভিতর মূল পার্থক্য এইখানে। অন্য মতাবলম্বীরা অধিকার-ভেদ, সম্প্রদায়-ভেদ, জাতি-ভেদ, ধন-বৈষম্য, স্বজাত্যভিমান ইত্যাদি দূর করার নামে কোন-না-কোন উপায়ে দণ্ড শক্তি, হিংসা বা দ্বেষের শরণ নেওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। "অসুর" এবং "অধর্ম-প্রচারকদের" নাশ করে "সাধুসন্তদের" রক্ষা করার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার নিজেদের আছে মনে করা হয় এবং আত্মবাদ থেকে এর অনুরূপ উপদেশ খুঁজে বার করা হয়। গান্ধীজীর আত্মবাদ তাঁকে এ শিক্ষা দেয় না।

॥ ৩ ॥

মার্কসবাদ

এবার মার্কসের মতবাদের মূল ভূমিকার বিচার করা যাক। এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত যে, কোথাও কোথাও হয়ত আমি মার্কসের বক্তব্য এবং মার্কসবাদ অথবা মার্কসীয় নীতির পরবর্তীকালীন ব্যাখ্যা ও ভাষ্যকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছি। অনেকে বলে থাকেন যে, মার্কসবাদ ও মার্কসবাদীদের মধ্যে গান্ধীজীর আদর্শ ও গান্ধীবাদী নামে আখ্যাত ব্যক্তিদের মতই দুস্তর ব্যবধান। মার্কসবাদে আমার গভীর পাণ্ডিত্য নেই।

আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, গান্ধীজী এবং যাবতীয় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী-দেরই মত মার্কসবাদীও এ কথা বিশ্বাস করে যে, সমগ্র সৃষ্টির বীজ একটিমাত্র মূল তত্ত্ব। কিন্তু এই অদ্বিতীয় তত্ত্ব পরমাত্মা বা চৈতন্য নয়, এ হচ্ছে জড় প্রকৃতি। ব্রহ্মবাদী বলেন, জড়ের অস্তিত্ব চৈতন্যের ভিত্তিতে। চৈতন্যতেই সবকিছুর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। এর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী মার্কস বলেন যে, জড় থেকেই চৈতন্যের সৃষ্টি, জড়েরই আধারে এর অবস্থিতি এবং চৈতন্যের নাশ হলে শেষ পর্যন্ত জড় প্রকৃতিই রয়ে যায় ও তখন মনে হয় যে, এর রূপান্তর হচ্ছে।

সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, পৃথিবী প্রথমে সূর্যেরই মত জ্বলন্ত অগ্নিগোলক ছিল। কোটি কোটি বৎসর এই রকম থাকার পর শেষকালে ধরাপৃষ্ঠে চেতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টি কিরূপ ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে বিকশিত হয় এবং এর ক্রমাভিব্যক্তির পথে কিভাবে বনস্পতি জলচর, খেচর ও ভূচর জন্তু ও প্রাণী এবং সর্বশেষে মানব জন্মগ্রহণ করল, তারও আনুপূর্বিক ইতিহাস পাওয়া যায়। মহানভে যে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র বিরাজমান তার কয়টির মধ্যে চেতন সৃষ্টির নিদর্শন আছে, এ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। বরং এইটুকু বলা চলে যে, কোন কোন গ্রহ-নক্ষত্রে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। জড়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারও মনে সন্দেহের অবকাশ নেই। এর থেকে মেনে নেওয়া উচিত যে, মূল তত্ত্ব হচ্ছে জড় প্রকৃতি। এই জড় প্রকৃতিই কোন অদ্ভুত যন্ত্রের মত বিকশিত হতে হতে এমন এক রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়, যাকে আমরা সংবেদনশীল, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, বিচারশীল ও

প্রগতিশীল জীবিত বা চেতন পদার্থ বলে থাকি। এই গুণের অভিব্যক্তি জড় প্রকৃতির ভিতর পরে হয়েছে। আমরা এমন সব উচ্চ যান্ত্রিক কৌশলযুক্ত কলের কথা জানি, যেগুলি নিজ গতি রেকর্ড করে রাখতে পারে। কোথাও ভুল হলে এসব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বন্ধ হয়ে গিয়ে যন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। এসব যন্ত্র প্রয়োজনানুসারে স্বয়ং গতির হ্রাসবৃদ্ধি করতে পারে। একশ্রেণীর বিমান চালকহীন অবস্থায় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে আবার প্রত্যাবর্তন করতে পারে। এতৎসত্ত্বেও আমরা এদের চেতন পদার্থ বলি না। এইভাবে মনুষ্য বা পশুর মত আপাতদৃষ্টিতে চৈতন্যময় পদার্থও প্রকৃতিরই আবিষ্কার। এক্ষেত্রে এ কথা মানার প্রয়োজন নেই যে, মনুষ্য বা পশুকুলের ভিতর বাইরে থেকে কোন অনাদি চেতন তত্ত্ব এসে অধিষ্ঠিত হয়েছে ও এই চৈতন্য এক প্রাথমিক ও মৌলিক তত্ত্ব। স্থতরাং জড়ের স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে ও এ চৈতন্যের আশ্রিত, এমন কথা বিশ্বাস করার কোন সার্থকতা নেই।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী জীব থেকে শুরু করে অতি বৃহৎ প্রাণী ও অতীব বুদ্ধিমান মনুষ্য পর্যন্ত সকল জীব প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতিতেই তাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে, ততক্ষণ এদের বুদ্ধিযুক্ত মনে হয়; কিন্তু আসলে এসব বাইরে থেকে আরোপিত গুণ। যুক্তির দিক থেকে দেখতে গেলে মাটির পুতুল ভাঙল বা গড়া হল, জীবিত প্রাণীর পুত্তলিকা নির্মিত হল বা চূর্ণীকৃত হল, এতে কোন পার্থক্য নেই। যেমন মাটির পুতুল ভাঙা বা গড়াকে পাপ পুণ্য, সদাচার দুরাচার ইত্যাদি কিছু বলা চলে না, তেমনি এই জীবিত প্রাণীর পুত্তলিকা সম্বন্ধেও এরকম কিছু মনে করবার প্রয়োজনীয়তা নেই। কোন অভীষ্টসাধনের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন্ কাজ কখন করা সমীচীন—এই বিষয়ে যদি নীতি নির্ধারণ করতে হয়, তা হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু এর মধ্যে পাপ পুণ্য, সত্য অসত্য, হিংসা অহিংসা ইত্যাদির কল্পনা করা নিরর্থক। চিন্তাশক্তি হচ্ছে একজাতীয় রেকর্ড করা ও রেকর্ডকৃত বিবরণ পঠনক্রিয়া মাত্র। দেহযন্ত্রের একজাতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে এর সৃষ্টি। আর এটা চলে ততদিন, যতদিন শরীরযন্ত্র কর্মক্ষম থাকে। কোন কারণে দেহযন্ত্র যদি বিকল হয়, তা হলে ভাঙা বেতারযন্ত্রের মতই এ অকার্যকরী। বেতারযন্ত্র একেবারে ভেঙে গেলে যেমন তা থেকে কোন আত্মা চলে যায় না, তেমনি আমাদের দেহযন্ত্র অকার্যকরী হলে আত্মা দেহ মুক্ত হল ভাবার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। পুণ্য বা নৈতিকতা (সত্য,

অহিংসা, সংবৃত্তি আদি) এবং পাপ বা দুর্নীতি (মিথ্যাচার, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি) হচ্ছে স্রেফ অযৌক্তিক মনুষ্যসৃষ্ট বিধিনিষেধ। যেমন কোন পাহাড়-পর্বত উড়িয়ে দেওয়া বা মানুষে গড়া জিনিসের রদবদল করার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন, তেমনি হত্যা, অত্যাচার, প্রতারণা ইত্যাদির ভিতরও কোন অনাত্মবাদের বালাই নাই। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন বস্তু সৃষ্টি করা হয় বা তাকে জিইয়ে রাখা হয়। আবার দরকার পড়লে তাকে ভাঙা হয়ে থাকে বা তার অদল-বদল করা হয়ে থাকে। এই একই বিধান জীবিত ও মৃত সকল বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

মার্কসের মতবাদের এই পর্যন্ত চার্বাকের দর্শনের সঙ্গে মেলে বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, সাংখ্যবাদী, বৈদান্তিক ইত্যাদিও কোন-না-কোন পথে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু মার্কসবাদ এরও আগে যায়।

এই বিশ্বে জীবনের বিকাশ হতে হতে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হল। এ যুগে মানুষকেই সর্বাধিক বিকাশপ্রাপ্ত প্রাণী বলা হয়ে থাকে। এর বিকাশের এক চিত্তাকর্ষক অতীত ইতিহাস বিদ্যমান। অতীব বিচিত্র এই ইতিহাস। মনুষ্য-জাতি কিভাবে প্রগতি করে চলেছে, তার এক সুসংবদ্ধ ধারা এই ইতিহাস-প্রবাহের মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। এই ধারা অনুধাবন করলে ভবিষ্যতের মানুষ কোন্ পথে এগোবে, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক সুস্পষ্ট ধারণা হয়। এ বিষয়ে কার্ল মার্কসের মত খুব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হবার সুযোগ না পেলেও মার্কসবাদের মতে নিঃসন্দেহেই এ কথা বলা যেতে পারে যে, মনুষ্যসমাজের ভবিষ্যৎ একেবারে নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং আমরা যতই উল্টাপাল্টা রাস্তায় চলি না কেন, সে ভবিতব্য পরিবর্তিত হবার নয়।

একেই মার্কসবাদের 'ডিটারমিনজিম্' বা নিয়তিবাদ বলা হয়। একেই বলে 'যদ্ভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা' অর্থাৎ যা হবার তা হবেই, আর যা না হবার তা কখনই হতে পারে না। এখানে নিয়তিবাদের অর্থ এ নয় যে, মানবজাতির জীবনে কবে কোন্ ঘটনা ঘটবে, তা বিধিলিপির মত নিশ্চিত হয়ে গেছে। আসলে এই ভাব শুধুমাত্র এইটুকুতেই সীমিত যে, অমুক অবস্থার পর অমুক দিশাতেই মানবজাতির প্রবৃত্তি ও প্রগতি হতে বাধ্য। এই ভবিষ্যৎকে এড়ানোর বা দূরে সরানোর যে প্রচেষ্টাই হোক, তা নিরর্থক। এতে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা নেই। এইজন্য বুদ্ধিমান মানুষের

কাজ হচ্ছে, যে কোন উপায়ে শীঘ্রাতিশীঘ্র এই ভবিতব্যকে মূর্ত করা। তাহলে সত্বর এর পরবর্তী ভূমিকার সূত্রপাত হবে।

এই নিয়তিবাদে বিশ্বাস থাকার জন্য মার্কসবাদীরা অমিত বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা আজ যা কিছু করছেন, তা মানবজাতির নিশ্চিত ভবিতব্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থাৎ তাঁরা প্রকৃতির বিধানের উপাসনা করেছেন, এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।

আমাদের দেশও এই নিয়তিবাদের সঙ্গে অপরিচিত নয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এর উল্লেখ আছে এবং মহাভারত ও যোগাবশিষ্ঠে এর আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামেও এর প্রভাব পড়েছে। ইতঃপূর্বে যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা হিতোপদেশ থেকে গৃহীত। কিন্তু মার্কসবাদী এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে আরও এগিয়ে চলেন। মানবজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করণানন্তর তাঁরা তার নিম্নরূপ ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেন:

আগামী যুগে পুঁজিবাদের বিনাশ হবে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিহীন ও সর্বহারা শ্রমিকদের অভ্যুদয় ঘটবে। অতীতে যেমন প্রথমে রাজতন্ত্র, তৎপরে সামন্ততন্ত্র এবং অবশেষে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সাধনহীন শ্রমিকবর্গ যেমন তাদের দাস বা কৃতদাসের মত আধপেটা খেয়ে তাদের পায়ের তলে পড়ে থাকত, তেমনি আগামী যুগে ঐসব শোষিত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর বলিষ্ঠ শাসনাধীন রাজ্য স্থাপিত হবে। আজকের মতই তারা বৃহদায়তন কলকারখানা ও শ্রমশিল্পের সঞ্চালন করবে; কিন্তু তখন তাদের শ্রেণী এর লাভ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাবে। ব্যক্তিগত জমি বা পুঁজি বলে কোন কিছু পারতপক্ষে থাকবে না এবং যদ্যপি এরকম কিছু কোথাও থেকে যায়, তবে অতীতে শ্রমিক ও কৃষকেরা যেমন জমিদার ও পুঁজিপতিদের করুণা সম্বল করে অস্তিত্ব বজায় রাখত, তেমনি এ সবও তখন শ্রমিকশ্রেণীর অভিরুচির উপর টিকে থাকবে। এর জন্য বিত্তবানদের উচ্চ মূল্য দিতে হবে। সর্বহারা শ্রেণীর এইরূপ অভ্যুদয়ের সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধিত। সুতরাং তারাই এ যুগের কেন্দ্রবিন্দু—নায়ক। এর প্রতিরোধ করার জন্য যাঁরা চেষ্টা করেন, তাঁরা বালির বাঁধ দিয়ে বন্যা আটকাতে যাচ্ছেন, বলতে হবে।

মার্কসবাদী বিশ্বাস করেন যে, নূতন যুগে অর্থাৎ সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপনার পর যখন সেই একনায়কত্বের পূর্ণ বিকাশ হবে তখন মানবসমাজ

হবে শ্রেণীহীন এবং সমগ্র বিশ্বে তখন শান্তি স্থাপিত হবে। তখন অসাম্য, শ্রেণীবৈষম্য, মুনাফার মনোবৃত্তি ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকবে না। সমগ্র বিশ্বের মানবজাতি এক সমাজভুক্ত হবে। এর ফলে স্বতঃই অহিংসার রাজ্য আসবে। সে অবস্থায় জটিল শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না ও ক্রমে আমরা আদর্শ নৈরাজ্যবাদের স্থিতিতে উপনীত হব। গান্ধীজী বা অন্যান্য আদর্শবাদীরাও যদি এই স্থিতি চান, তা হলে মানতে হবে যে, সাম্যবাদের পরই এ অবস্থার সৃষ্টি হবে, আগে নয়। ততক্ষণ পর্যন্ত হিংসা বা অহিংসা, যারই প্রয়োজন ঘটুক, সেই পন্থানুসরণ করতে হবে। এর জন্য সমগ্র দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতালরূপী অস্ত্রের শরণ নিতে হবে। সর্বপ্রকার বিরোধীদের পথের কাঁটার মত সরিয়ে দিতে হবে। এই হচ্ছে খাঁটি নীতি ও ধর্ম, অর্থাৎ কর্তব্য। নীতি-অনীতি ধর্মাধর্মের আর সব কথা হয় প্রমাদ আর নয় প্রতারণা। এসব সরল ব্যক্তিদের ঠকাবার অস্ত্র। এর আবরণে শোষকেরা জনগণের শোষণ-ক্রিয়া চালিয়ে যায়। এসব হচ্ছে লোকের চিন্তাশক্তিকে অথর্ব করে দেবার কায়দা ও নিজ স্বার্থসংগোপনের মুখোশ।

গান্ধীজী ঈশ্বর ও ধর্ম নিয়ে হৈচৈ করে একদিকে পুঁজিপতি ও রাজা-মহারাজদের ধাপ্পাবাজীর সহায়তা করেছেন এবং অন্যদিকে অহিংসার আফিম খাইয়ে ও আদর্শ নৈরাজ্যবাদের বুলি আউড়িয়ে জনগণের দৃষ্টি অবিলম্বে করণীয় কার্য, অর্থাৎ সর্বহারাদের একনায়কত্ব কায়েম করা থেকে অন্যত্র অপসারিত করেছেন। এ ছাড়া তিনি বিজ্ঞান, যন্ত্রকৌশল ইত্যাদি যুগবিরোধী ও প্রগতি-পরিপন্থী পরিকল্পনা পেশ করে স্বয়ং ব্যর্থ হয়েছেন এবং গান্ধীবাদও এইজন্য বিফল হতে বাধ্য।

এইভাবে মার্কসবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীবাদ সর্বপ্রকারে নিষ্ফল। একে কোন প্রকারের সাম্যবাদও বলা চলে না। কারণ, ওতে অহিংসার প্রতি এত জোর দেওয়া হয়েছে, যা হয়তো অত্যন্ত দূর ভবিষ্যতে রূপ পরিগ্রহ করলেও করতে পারে। এ ছাড়া একে সাম্যবাদ আখ্যা না দেবার আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, এতে ভগবান ও ধর্ম নিয়ে বড় বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়েছে এবং গান্ধীবাদ পুঁজিবাদ ও সামন্ত-প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। অস্ত্রবল ছাড়া বিপ্লব বা ক্রান্তি মূর্ত হয় না। আর বিপ্লব ছাড়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। এইজন্য সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বহারার একনায়কত্ব কায়েম করতে হবে এবং তার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব বা ক্রান্তি অপরিহার্য।

আমি আশা করি, মার্কসবাদের তত্ত্ব আমি যথাযথভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি। এর পর আমি এরই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীবাদের পর্যালোচনা করার প্রয়াসী হব।

॥ ৪ ॥

সদাচারের বনিয়াদ

এযাবৎ আমরা গান্ধীজী ও মার্কসের মৌলিক তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, আধ্যাত্মিকবাদীদের কোন কোন দল দরকার পড়লে অসত্য, হিংসা ইত্যাদি সাধনের শরণ নিতে দ্বিধাবোধ করে না। আবার এর বিপরীত মনোভাব সময় সময় আত্মা, ঈশ্বর বা চৈতন্য সত্তায় অবিশ্বাসী-নাস্তিকের মধ্যে দেখা যায়। অতীতে এমন অনেক নাস্তিক দেখা গিয়েছে, যাঁরা নীতি ও সদাচারকে মানুষের এক অপরিহার্য ধর্ম বলে মনে করতেন এবং সাধনশুদ্ধির উপর অত্যন্ত জোর দিতেন। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, সত্য, অহিংসা ইত্যাদি সদাচারের আসল বনিয়াদ কী? এবার আমরা এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব।

জড়বাদ ও চৈতন্যবাদকে আমরা সাময়িকভাবে একপাশে সরিয়ে রাখলেও একথা সকলকে স্বীকার করতে হবে যে, আমরা আজ যে জগতের অধিবাসী তাতে জীবন অর্থাৎ চেতনাত্মক সৃষ্টি রয়েছে এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে জড়-তত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি। এই জড়ের সঙ্গে সংযুক্ত চেতন-সৃষ্টিরই এক নিদর্শন হচ্ছে আমাদের মানবজাতি। এ জাতির পরিব্যাপ্তি সমগ্র জগৎময়। নৃতত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে মানবের কিছু প্রকৃতি-ভেদ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতিরেকে ভৌগোলিক প্রাকৃতিক এবং বংশানুক্রমিকতার কারণে এর মধ্যে আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপবিভাগও দেখা যায়। তাদের আকৃতি, দেহবর্ণ, আচার-ব্যবহার, ভাষা, ধর্ম, রুচি, অরুচি ইত্যাদি পৃথক পৃথক হয়ে গেছে এবং যুগ-যুগান্ত ধরে তাদের ভিতর বহুতর গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। জন্ম, দেশ, ধর্ম, শাসন-পদ্ধতি, শিল্প-ব্যবসায় পরিচালন-ব্যবস্থা, ভাষা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের আধার অবলম্বন করে এইসব গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এইসব কারণে সময় সময় মনে হয় যে মনুষ্যজাতি এক নয়, বহুধা-বিভক্ত এবং তাদের অবস্থা পারস্পরিক মিলনের অনুকূল নয়।

কিন্তু অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও অনুশীলনের বৃত্তি আমাদের বলছে যে মনুষ্য-সমাজের বিভিন্ন জাতির এই ভেদ বাহ্য। এর নীচে সবার ভিতরেই ধর্ম ও অভিব্যক্তির (ইভলিউশন) কোন না কোন সাধারণ লক্ষণ পরিদৃষ্ট। প্রতিটি ব্যক্তি, উপজাতি ও মহাজাতির ভিতর বিকাশ ও বিলয়ের সাধারণ যথাক্রমতা পরিদৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ দেহবর্ণ, কেশ, করোটি ইত্যাদির যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, এই জাতীয় পার্থক্যযুক্ত গরুর চেয়ে মানুষের পক্ষে পরস্পরের সঙ্গে দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা অধিকতর সহজ।

এ ছাড়া সকলের মধ্যেই চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ ও ক্ষয় এবং প্রেম, ক্রোধ ইত্যাদি বৃত্তি ও বৌদ্ধিক সংস্কার সমভাবে পাওয়া যায় এবং তাদের উপর এর প্রভাবও সমান পড়ে। সাধু ও অসাধু, সাহসী ও ভীরু, বুদ্ধিমান ও ও মূর্খ, প্রত্যেক জাতির ভিতরই হওয়া সম্ভব। অনুকূল পরিবেশ পেলে প্রত্যেক দলই শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করতে পারে, বুদ্ধি যশ ইত্যাদি সদ্‌গুণের জন্য বিখ্যাত হতে পারে, ভোগ-বিলাসে আত্মনিমজ্জন করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংসও হতে পারে।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও মনীষিগণ জীবনের বিকাশ ও বিলয়ের পর্যায়ক্রম ও ইতিহাস সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে বিচার করেছেন। কেউ মানুষের ব্যক্তিগত শরীরগঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন, কেউ করেছেন মন ইত্যাদির বিকাশ-পদ্ধতি নিয়ে। কেউ মনুষ্য-রচিত সমাজের বিশ্লেষণ করেছেন, কেউ বা আবার সমগ্র জাতির বিচার করেছেন। সমাজ-সংগঠন সম্বন্ধে বিচারকালে রাজনৈতিক, ধার্মিক, সামাজিক, আর্থিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তির চেয়ে সমাজের আয়ু বেশী। সমাজের সুগুণ, দুর্গুণ, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদির ঐতিহ্যের বিকাশ স্ববংশীয় অনুগামী বা অপর কারও দ্বারা সাধিত হয়। ব্যক্তির মৃত্যু হয়; কিন্তু সে তার সু বা কু কৃত্যের বীজ রেখে যায়। এই কারণে কোন কোন মতবাদ ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের গুরুত্ব অধিক বলে বিবেচনা করে এবং তাদের মতে ব্যক্তি সমাজরূপী শতপদীর একটি পা ছাড়া আর কিছু নয়। এই জাতীয় প্রাণী যেমন প্রাণ বাঁচাবার জন্য দরকার হলে কয়েকটি পায়ের মায়া ত্যাগ করে থাকে, তেমনি তাঁদের মতে সমাজের হিতার্থে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে বলি দেওয়া চলতে পারে। কেউ কেউ আবার ব্যক্তির গুরুত্ব বেশী বলে ধরে নিয়েছেন এবং ব্যক্তির হিতসাধন ও উৎকর্ষের জন্যই

সমাজের সার্থকতা মনে করে তাঁরা ব্যক্তির বিকাশ-পদ্ধতির পর্যালোচনা করেছেন।

এর থেকে এই কথাটিই স্পষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তির ভিতর মানব-জীবনকে সমগ্র রূপে দর্শনের শক্তি থাকে না। অন্ধ চতুষ্টয়ের হস্তি-দর্শনের গল্পের মত প্রত্যেকে বড় বেশী হলে এর ক্ষুদ্র এক অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে। কেউ পূর্ণ দৃষ্টির অধিকারী বলে দাবি করতে পারে না। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে :

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥
অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥

অর্থাৎ স্বয়ং অজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বিবেচনাকারী ঐ সকল মূর্খ সর্বপ্রকার হানি সহন করতঃ অন্ধের অনুগামী অন্ধের মত পরিভ্রমণ করতে থাকে। বহুবিধ অজ্ঞান সত্ত্বেও ঐসব মূর্খ ভাবে যে, আমরা কৃতার্থ হয়েছি। ঐসব কর্মশীল রাগবশ ব্যক্তি সত্যকে উপলব্ধি করে না এবং এই কারণে দুঃখিত চিত্তে স্বীয় পুণ্যের প্রভাব ক্ষীণ হওয়া মাত্র পতিত হয়। শুধু তাই নয়, নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা তাই শুধু সত্য এবং বিপরীত ভাবে চিন্তা ও উক্তিকারী আর সকলে অজ্ঞান, মিথ্যাবাদী, ঈর্ষান্বিত, দুষ্ট, অসুর ইত্যাদি মনে করে শুধু তাদের কথার বিরুদ্ধাচরণই যথেষ্ট নয়, তাদের নাশ করাও নিজ অধিকার ও সময় সময় পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে।

মহাভারতের মত শত শত বিশাল গ্রন্থ যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালপত্রে লিখিত হত এবং এইসব গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা যদি এক সঙ্গে মিলে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যেত ও বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন স্থান থেকে এইসব বিক্ষিপ্ত পৃষ্ঠা সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করার পর এর ভিত্তিতে সমগ্র গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করলে যা হত, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র জীবনকে বোঝার প্রচেষ্টা তার সঙ্গে তুলনীয়।* বিজ্ঞান ও ইতিহাস এবং

* শারীরবৃত্ত ও শল্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পণ্ডিত নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মনীষী ডঃ অ্যালেক্সিস ক্যারল তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ম্যান দি আননোন'-এ লিখেছেন :

'সমগ্র জীবিত প্রাণী এবং বিশেষতঃ মানুষের শরীর-তত্ত্ব এখনও এতটা অগ্রসর হয় নি। এখনও

তার তত্ত্বাবলী যথেষ্ট মূল্যবান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর চেয়েও মূল্যবান বিষয় হচ্ছে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। কোটি কোটি গ্রন্থের চেয়ে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমগ্র জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবলোকন অধিকতর মূল্যবান। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের যতটুকু অভিজ্ঞতা-লব্ধ, তা মানতে কেউ অস্বীকার করবে না, বা এ বিষয়ে কোন মতভেদ হয় না; বিতর্কের উদ্ভব হয় শুধু সেইটুকু নিয়ে, যা কি না অনুমানসাপেক্ষ ও সম্ভাবনাভিত্তিক এবং পৃথক পৃথক অভিমত সৃষ্টির মূলেও এই বিষয়টি ক্রিয়া করেছে।

জীবন-স্রোতের ধারা দৃষ্টে বোঝা যায় যে প্রত্যেক মানুষই প্রগতির চেষ্টা করে। সকলে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানরাজ্যে, পরাবলম্বন থেকে স্বাবলম্বনের আদর্শে, দীনতা থেকে প্রভুত্বে, নৈরাশ্য থেকে আশায়, দুঃখ থেকে সুখে, অল্পায়ু থেকে দীর্ঘায়ুর স্থিতিতে এগিয়ে যেতে চায়। কেউ পিছিয়ে পড়তে চায় না। আর যদি কেউ পিছিয়ে যাচ্ছে বলে মনেও হয়, তবে তা এগোবারই আশাতে। এ যেন প্রশস্ত গহ্বর পার হবার জন্য খানিকটা পিছু হটে দৌড়ে এগিয়ে আসার মত। এ ছাড়া কোন মানুষ অপর কারও দ্বারা প্রতারিত হতে চায় না, তারা সত্য জানতে চায়। তারা তিরস্কারের অভিলাষী নয়, প্রেমপিয়াসী; অন্যায় বলপ্রয়োগ আদি তারা সইতে পারে না, তারা চায় ন্যায়বিচার ও সদ্ব্যবহার। তারা ভীতিবিহ্বল হয়ে কাল কাটাতে ইচ্ছুক নয়, চায় সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।

এদিকে জীবনের আর এক দিকের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে নিজ সমাজ অর্থাৎ পরিবার, জাতি, দেশ ইত্যাদির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ শিশুর মত মূঢ় ও স্বার্থপরতাভিত্তিক। মানুষ সমাজে বাস করে কিন্তু সমাজকে নিজ

এ শুধু উপরউপর আলোচনার স্তরে আছে।...বস্তুতঃ আমাদের অজ্ঞতা গভীর। মানব-দেহ সম্বন্ধে অধ্যয়নকারী নিজেদের যেসব প্রশ্ন করেন, তার অধিকাংশের সদুত্তর পাওয়া যায় না। আমাদের শরীরের অন্তর্জগতের বহু ক্ষেত্র এখনও অজানা।...এ কথা ঠিক যে সুখ বা দুঃখ, সাফল্য বা ব্যর্থতা, ইত্যাদির জনক কতিপয় ভৌতিক ও মানসিক বৃত্তি। কিন্তু এগুলি কি তা আমরা জানি না, কৃত্রিম উপায়ে আমরা কোন মানুষের মনে সুখাবেশ সৃষ্টি করতে পারি না। এটুকু পর্যন্ত আমরা জানি না যে কোন্ বিশেষ পরিস্থিতি সভ্য মানবের বিকাশের সর্বাধিক অনুকূল।...স্পষ্টভাবে একথা প্রত্যক্ষ যে মানুষ সম্বন্ধে আলোচনাকারী বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখাই এখনও অসম্পূর্ণ এবং নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও অতীব সীমাবদ্ধ।'

স্বার্থসাধনের সাধন মনে করে। এ যেন শিশুর নিজ মাতাপিতাকে অন্নবস্ত্র ও খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম জোগাবার সাধন মনে করার মত।

অর্ধ-উন্নত অবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে রচিত হয়। দুটি ব্যবসায়ী-পরিবারের ভিতর পুরুষানুক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য চললে কখনও এক পরিবার অপরের পাওনাদার হয়, আবার কখনও এর বিপরীত ঘটে। এইভাবে এই পর্যায়ে কখনও ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে বেশী নেয়, আবার কখনও সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে বেশী নিয়ে থাকে। একে অপরের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে উভয়ে উভয়ের উৎকর্ষতা সাধনের চেষ্টা করে এবং এতে উভয়েই তৃপ্তি পায়। পূর্বোক্ত উদাহরণের একজন ব্যবসায়ী যেমন অপরকে ধ্বংস হতে দেয় না বা একজন যেমন চায় না যে অপরকে ডুবিয়ে স্বয়ং অগ্রসর হই, তেমনি সমাজ ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তি সমাজকে ডুবাতে চায় না। একজন অপরকে শুধু নিজ স্বার্থসিদ্ধির সাধন মনে করে না, পারস্পরিক মঙ্গলের উপায়-স্বরূপ বিবেচনা করে। এর ফলে যদি দরকার পড়ে, তবে কখনও ব্যক্তি সমাজের জন্য আত্মত্যাগ করে, আবার সময়ে সমাজ ব্যক্তির জন্য ক্ষতি স্বীকার করে—কখনও সমগ্র পরিবার একটি শিশুকে বাঁচাবার বা শিক্ষা দেবার জন্য আত্মবিলোপ করে, আবার কখনও পরিবারস্থ একজন সমগ্র পরিবারের মঙ্গলার্থে আত্মোৎসর্গ করে। অপরের উপকার করছি এই ধারণাপরবশ হয়ে কেউ এসব করে না। এ মনোভাবের সৃষ্টি হয় তখন, যখন বিশেষ একজনকেই ক্রমাগত নিপিষ্ট হতে হয় এবং তার জন্য কারও মনে কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র দেখা যায় না। এরকম অবস্থার পরিণাম-স্বরূপ অসন্তোষও সৃষ্ট হয়। এরকম স্থিতির উদ্ভব না হলে প্রত্যেকে নেবার বদলে দিয়েই পরিতৃপ্তি বোধ করে। এতে তারা একপ্রকার সাত্ত্বিক আনন্দের স্বাদ পায়। কারণ, আশ্রিতের বদলে আশ্রয়-দাতার পর্যায়ে উন্নীত হওয়া অবশ্যই বিকাশের পরিচায়ক।

এই জীবন যেমন ধীরে ধীরে অর্ধ-উন্নত অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থার দিকে প্রগতি করে, তেমনি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ পারস্পরিক আদান-প্রদানের বদলে ক্রমশঃ বেশী করে দেবার দিকেই এগিয়ে চলে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যে সমর্থ, সে অপেক্ষাকৃত অক্ষমকে সক্ষম বানাবার প্রচেষ্টাকে আত্মোন্নতি বলে বিবেচনা করে। তাকে নিশ্চিহ্ন করার কথা বা লুণ্ঠন করার কথা মনে স্থানও দেয় না। এই পর্যায়ে ব্যক্তি-বিশেষ বা সর্বসাধারণের

হিতের জন্য অথবা কোন মহদুদ্দেশ্যে যদি আত্মোৎসর্গ করার একান্ত প্রয়োজন ঘটে, তবে তার জন্য দুর্বলকে উৎসর্গ করা চলবে না, আত্মোৎসর্গ করতে হবে সবলকে। কোন নিমজ্জমান জলযান থেকে যদি আরোহীদের উদ্ধার করতে হয়, তবে প্রথমে শিশু, নারী ও দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। সক্ষম ব্যক্তিদের কথা পরে ভাবলেও চলে। যেখানে দুর্বল অসহায় এবং অনগ্রসরদের আপাতদৃষ্টিতে জগদ্ধিতায় বলি দেওয়া হয়, বুঝতে হবে সেখানে পূর্ণমাত্রায় শোষণ বিদ্যমান।* দারিদ্র্য থেকে ঐশ্বর্যাভিমুখে যাবার মত ভোগ থেকে সংযমাভিমুখে অভিযানও জীবাত্মার প্রগতির পরিচায়ক। ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ পোষক ও রক্ষক-বৃত্তির অভিপ্রকাশ হচ্ছে আত্মনিগ্রহ ও সংযমে।

এ ছাড়া মানব-মনের কয়েকটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে স্মৃতি, ইচ্ছা, নিরোধ (ইচ্ছা এবং স্মৃতিকে দমন করার শক্তি), সংকল্প, বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা, ভাবাবেগ ও বিশ্বাস। মানুষ এ যাবৎ যেসব নীতি, সদাচার, ব্যক্তির ইতিকর্তব্য সম্বন্ধীয় বিধান গড়েছে বা ভেঙেছে অথবা যেসব ধর্মীয় রাজনৈতিক আর্থিক বা অন্যবিধ ব্যবস্থা সৃষ্টি বা ধ্বংস করেছে, তার মূলে আছে মানব-চিত্তের এই স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের পরিণাম। এবং নীতি ও সদাচারের বনিয়াদও এরই উপর।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অন্য কোন তত্ত্ব আমাদের না মানা ও না বোঝা সত্ত্বেও এটুকু অন্ততঃ মেনে নিচ্ছি যে জীবনের নিরীক্ষণ এবং অভিজ্ঞতাই নীতি ও সদাচারের স্বয়ংপূর্ণ আধার। প্রথমে তো মানুষ মূঢ়, অজ্ঞান, দীন ও সেবাকাঙ্ক্ষী থাকবেই। এ অবস্থায় তারা অসত্য, হিংসা ইত্যাদির বশ হবেই এবং তাদের ভোগেচ্ছাও প্রবল থাকবে। প্রথমাবস্থায় এভাবে চলবে যেন এসব তার স্বাভাবিক বৃত্তি এবং তারা যেন নিজেদের সংযত রাখতে অসমর্থ! এর জন্য আমাদের হয়ত সময়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাদের বিচার করতে হবে। তবে মানব-স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যকে ধর্ম আখ্যা দেওয়া চলে না। ধর্মের কাজ হচ্ছে মানুষের সত্য কর্তব্য নির্দেশ করা। তাই বিবেক, জ্ঞান, ঐশ্বর্য (পোষণ-দায়ী ও রক্ষাকারী), সত্য, অহিংসা, সংযম এবং বৈরাগ্যাভিমুখী মহাভিনিষ্ক্রমণই হচ্ছে ধর্ম।

---

* "আমার সমাজতন্ত্রবাদ এমন কি 'সবার নীচে সবার পিছে সবহারাদের' জন্য। মূঢ় ম্লান, মূক মুখের চিতাভস্মের উপর আমার সাফল্যের বিজয়-তোরণ রচনা করতে চাই না। ওদের সমাজতন্ত্রবাদে বোধ হয় এদের স্থান নেই……।" "চার বৎসর পর" হরিজন, ৪-৮-১৯৪৬

কোন রকম বাদ-বিবাদের আশঙ্কা না করে নির্ভয়ে একথা বলা চলে যে, চেতন প্রাণীর সর্বাধিক সমুন্নত অভিব্যক্তি হচ্ছে মানব-চিত্ত। সাধারণ ভাষায় চিত্ত এবং চৈতন্য বা আত্মা সমভাবার্থক। আমরা "আমার আত্মা" বা আত্মাকে "দুঃখ দেওয়া", "আত্মার বিকাশ" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে থাকি। ধরাধামে এ যাবৎ যেসব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা এ বিষয়ের উদাহরণস্বরূপ যে, চিত্তের (আত্মার) কত দুর বিকাশ সম্ভবপর।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে সদাচার ও নীতিধর্মের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য চৈতন্য বা ঈশ্বরের প্রতীতি অপরিহার্য না হলেও মানুষের কার্য-বিশ্লেষণের সময় এবং মানুষকে ধর্মপথে দৃঢ় সংবদ্ধ রাখার জন্য এর স্থান অতীব মহত্ত্বপূর্ণ। এর বলে মানুষ নৈরাশ্য-সাগরে নিমজ্জিত হবার হাত থেকে পরিত্রাণ পায়, তীব্র পুরুষকারের পরিচয় দিয়েও এর দম্ভে স্ফীত হয় না। তার মনে এ-জাতীয় কোন অলীক অহমিকা থাকে না যে, বিশ্বের সমস্ত কিছু বিধৃত করে রাখার মূলে সে-ই এবং যেদিন সে (অর্থাৎ তার সাড়ে তিন হাতের শরীর) থাকবে না, সেদিন চতুর্দিকে ধ্বংসের মহাপ্লাবনের উর্মিমালা নৃত্যমুখর হয়ে উঠবে।

তবে এর অর্থ এ নয় যে শুধু নৈরাশ্য ও অহমিকা ইত্যাদির হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যই চৈতন্য বা ঈশ্বরের কল্পনা করা হয়েছে। ধৈর্যশীল ও একান্ত নিষ্ঠাবান সত্যসন্ধ ব্যক্তির কাছে আত্মাই আদি সত্য। মানসলোকের প্রত্যন্ত লোকচারী ও অতীন্দ্রিয়ের রসাস্বাদনকারীদের বিবেক এর সমর্থন জানায়। কূট তর্ক বা বাহ্যাবলোকন এ সত্য উপলব্ধি করতে অসমর্থ। তবে এর উপলব্ধির জন্য যে ধৈর্য, মানসিক ব্যাকুলতা ও সত্য প্রযত্ন প্রয়োজন, তা সবার ভিতর পাওয়া যায় না। সুতরাং অধিকাংশ ভক্তিশীল ব্যক্তি জলন্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হয়ে ঈশ্বরকে অবলম্বন করেন এবং এই বিশ্বাসই প্রায় প্রতীতির পর্যায়ে উপনীত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তার বিশদ আলোচনা অবান্তর। সুতরাং অতঃপর আমরা এ বিষয়ের অন্যান্য দিকের পর্যালোচনা করব।

॥ ৫ ॥

মানবের প্রগতি ও অধোগতি

পুনঃ পুনঃ বলা হয়ে থাকে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শ্রমশিল্প এবং অন্যবিধ কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে যে প্রগতি হয়েছে, মানুষ তা বিসর্জন দিয়ে প্রাচীন যুগে ফিরে যেতে পারে না, প্রগতির ফল আমরা বর্জন করতে পারি না। এই উপদেশের কতক অসত্য ও কতক অপ্রাসঙ্গিক। আর বাদবাকী যতটুকু সত্য, তা লোকোত্তর ও শাশ্বত প্রগতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সৃষ্টির ধর্মই এমন যে, মানুষ আর পুরানো জায়গায় ফিরে আসতে পারে না। অথচ ঋতুচক্র বারবার আবর্তিত হচ্ছে মনে হয় এবং আকাশে সূর্য-চন্দ্রাদি গ্রহ বারবার একই রাশিতে ফিরে আসে দেখা যায়। কিন্তু মহাশূন্যের যে স্থানে একবার তাদের দেখা যায়, আর তারা সেখানে ফিরে আসে না। কোন গোলাকৃতি ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করার সময় আমাদের মুখ বারবার একই দিকে এলেও আসলে আমরা হয় নীচে যাচ্ছি আর নয় উপরে উঠছি, পুরোনো জায়গায় আর ফিরে আসছি না। জগৎসৃষ্টির চলার পথও ঐরকম। কিন্তু তার জটিলতা ও বিস্তৃতি এর তুলনায় বহু ব্যাপক। এক্ষেত্রে আমরা উপরে উঠছি না নামছি, একথা বলাও মুশকিল। ক খ-কে প্রদক্ষিণ করছে, খ করছে গ-কে, আবার ঘ দৌড়াচ্ছে গ-কে কেন্দ্র করে। সমগ্র সৃষ্টি এইভাবে চক্রজালে আকর্ষিত হচ্ছে। স্থূল সৃষ্টির যে দশা, জীব সৃষ্টি এবং তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শ্রমশিল্প আদি অন্যান্য কলাকৌশলের ক্ষেত্রেও সেই অবস্থার পুনরাবর্তন চলছে। এই কারণে কোন এক বিশেষ কাঠামোর পুনরাবির্ভাব হয় না। দেখতে আগের মত মনে হলেও আর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে না। সুতরাং প্রাচীন অবস্থায় ফিরে যাবার ভয় ভিত্তিহীন।

তা হলে যখন দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের মত ক্ষেত্রে যখন পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, তখন নীতির ক্ষেত্রে কি এ সম্ভব? সহস্র সহস্র বৎসরের প্রয়াসের ফলে মানুষ নিজের ভিতর যে সুউচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বিকাশ করেছে, তাকে কি আর অস্বীকার করা যায়? বুদ্ধ, সক্রেটিস, কনফুসিয়াস, যীশু, গান্ধী ইত্যাদি মহান্ মানব-ধর্মের প্রতিমূর্তি ও পথিকৃৎগণ কি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানব-সমাজকে এগিয়ে দেন নি? মানুষ

তার গুণের বিকাশ কতখানি করতে পারে, এঁরা কি তার মানদণ্ড নন? ঐতিহাসিক উইনউড রীড প্রচলিত অর্থে নিরীশ্বরবাদী হলেও মানবতার মহান্ পূজারী ছিলেন। 'মার্টারডম অব ম্যান' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন:

"উপচিকীর্ষু বৃত্তির জন্ম স্বার্থবোধ থেকে হলেও এবং পরলোকে সব কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রতিদান পাওয়া যাবার আশা থাকলেও এখন এ মানব-স্বভাবের স্বাভাবিক ধর্ম হয়ে পড়েছে।...বিবেকের দর্পণে নিজ হৃদয়কে সুসজ্জিত ও শুদ্ধকরণকারী ও নিজ কর্ম ও বিচারধারাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করণেচ্ছুক সদাচারের উপাসক ব্যক্তি আজকের মত চিরকালই এ দুনিয়ায় থাকবে।"

নিজেকে তিনি এই দলেরই একজন বিবেচনা করে এরপর "সদাচার ধর্মের" স্বরূপও এর সাধন-মার্গের বর্ণনা করেছেন:

"নিজ বুদ্ধি ও প্রেমভাবকে যথাসম্ভব বাড়ানই হচ্ছে সত্যকার ধর্ম। যা লেখা চলতে পারে আমরা যেন তদনুরূপ কাজ করি, যা পঠনযোগ্য তা-ই যেন লিখি, আমরা যেন অসুস্থের পরিচর্যা করি, দুঃখীকে সান্ত্বনা দিই, পরিশ্রান্তদের যেন উৎসাহিত করি, এ দেহ-দেউলকে যেন পবিত্র রাখি, মনে যেন দিব্যতা লাভের অভীলিপ্সা থাকে! বিবেকের প্রতি যেন বিশ্বস্ত থাকি, আমার ভিতর যে প্রতিভা আছে, যেন তার উৎকর্ষসাধন করে মানবতার সেবায় তাকে উৎসর্গ করি—আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব, তা হচ্ছে এই। অতএব আমাদের ধর্ম হচ্ছে সদ্‌গুণ বা সদাচার। আমাদের আশা অন্তর্নিহিত রয়েছে ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সুখে। আমাদের বিশ্বাস, মানবের পূর্ণতা প্রাপ্তি হতে পারে। মানবজাতিকে একডোরে বাঁধবে, ভয় নয়—প্রেম। আধিব্যাধির নাশ, পাপের অবসান ঘটান, বুদ্ধির পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি, প্রেমের বিকাশ, অমৃতের সন্ধান, অনন্তের খোঁজ এবং প্রকৃতিকে জয় করা ইত্যাদি পবিত্র কাজ মানুষ সমপরিমাণ নিষ্ঠার সঙ্গে একযোগে করে চলবে।

"প্রত্যেকে কবি, আবিষ্কারক বা দানবীর হতে পারে না। কিন্তু সর্বজনের প্রগতির মহান্ ও দিব্যকর্মে তো সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে। নিজ স্বভাবের যে সংশোধন করে, স্বয়ং সে বিশ্বের অংশস্বরূপ হওয়ায় এর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেরও সংশোধন হয়ে যায়। যে অবশিষ্ট পশু-প্রবৃত্তির বিনাশ করে, মনের কুচিন্তাকে স্ববশে আনার চেষ্টা করে, নিজেকে যে সমাজপ্রেমে দীক্ষিত করে, যার সতত প্রয়াস হচ্ছে নিজ পরিবেশের সংস্কার করা ও নিজ সন্তান-সন্ততিকে নিজের চেয়েও বিবেচক ও সুখী করার চেষ্টা করা, তার উদ্দেশ্য যা-ই হোক না

কেন, কখনও তার সম্বন্ধে একথা বলা চলবে না যে তার জীবন ব্যর্থ যাচ্ছে! কিন্তু এ বিভূতি লাভ করা অতটা সহজ নয়···পরমশুদ্ধ ও উচ্চ স্বরূপে সদ্‌গুণ সিদ্ধি হয় মনের কঠোর ও দীর্ঘকালীন শিক্ষা দ্বারা।"

প্রগতি ও বিকাশের ধারা দৃষ্টে মনে হয় যে মানুষ কখনও এগিয়েছে, আবার কখনও বা পিছিয়েছে। বারবার মানুষ ভুল করেছে; কিন্তু ভুল ধরতে পারা মাত্র আবার নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে অগ্রসর হবার প্রয়াস করেছে। একাধিক বার সে সাজান বাগান তছ্‌নছ্‌ করেছে এবং তার পর-মুহূর্তে পুনর্বার তাকে আগের মত গড়ার চেষ্টা করেছে। একনায়কত্ব থেকে গণতন্ত্র পর্যন্ত বহু রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মানুষ করেছে। ঐতিহাসিক এর ভিতর থেকে এগোনো-পিছোনোর অস্থায়ী ক্রম বাদ দিয়ে সমগ্র প্রগতি-মার্গের বর্ণনা করার প্রযত্ন করেন।

মানব-সমাজের আর্থিক কাঠামো ও অর্থব্যবস্থা অনুসারে তাদের রাজনৈতিক, ধার্মিক, সামাজিক ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের সংগঠন গড়ে ওঠে —এই কথা ধরে নিয়ে মার্কস মানুষের রাজনৈতিক ও অন্যবিধ সংগঠনের সমালোচনা করে অতঃপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মনুষ্যজাতির গতিই হচ্ছে শ্রমিক-তন্ত্রাভিমুখী এবং তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে অনতিবিলম্বে ঐ অপরিহার্য অবস্থার রূপায়ণ করা।

এ সিদ্ধান্ত সত্য হতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এর রূপায়ণে যে কোন উপায় অলম্বন করা উচিত। কারণ, এই সহস্র সহস্র বৎসরের অভিব্যক্তির (ইভলিউশান) ফলে মনুষ্যজাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশও তো হয়েছে। তাই এসবের কথা বাদ দিয়ে কাজ চলতে পারে না। এ-যুগে গান্ধীজী যদি জগৎকে নৈতিক বিকাশের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে থাকেন, তাহলে উত্তরকালে মহাপুরুষদের এর চেয়ে আরও একধাপ উপরে উঠতে হবে। তাঁদের এর চেয়েও উচ্চকোটীর নৈতিক বিকাশের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। নিয়তিবাদের (ডিটারমিনজিম) যদি কোন মূল্য থাকে, তাহলে মানব-সমাজের নিয়তি এ-ই হওয়া উচিত। মার্কসবাদীরা বলেন, মানুষ মধুচক্রের একটি মক্ষিকা মাত্র। মৌমাছি নিজ চাক ও রানীর জন্য সর্ববিধ প্রকারে পরিশ্রম করে, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দেয়। অতএব এই যুক্তি অনুসারে মনুষ্য-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে এমনভাবে কাজ করা যাতে স্বল্পতর প্রচেষ্টায় ভবিষ্যতে গান্ধীজীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হতে পারে।

এ-কথা ভুলেলে চলবে না যে, নৈতিক পরিপূর্ণতার সাধনায় শত সহস্র সাধক নিজ জীবন উৎসর্গ করার ফলেই একজন গান্ধীর আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে। সুতরাং গান্ধীজী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য এই রকম লক্ষ লক্ষ সাধককে তপশ্চর্যাময় জীবন-যাপন করতে হবে। প্রাচীনকালের প্রত্যেকটি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং নৃশংস স্বেচ্ছাচারীর চেয়ে হিটলার হয়ত ভয়ানক ছিলেন এবং হয়ত হিটলারের চেয়েও বড় হিটলার এ দুনিয়ায় দেখা দিতে পারেন। কিন্তু হিটলারেরও জন্মের মূলে আছে এই জাতীয় সহস্র সহস্র দুঃসাহসিক এবং কূটনৈতিক ক্রিয়া। তবু মানুষের এই বৃত্তির অভিপ্রকাশকে মানবতার যথার্থ বিকাশ আখ্যা দেওয়া চলে না।

আর্থিক এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের মত নৈতিক আদর্শও অতীব মহত্বপূর্ণ হয়। যদি এর মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে হয়, তবে নৈতিক আদর্শের গুরুত্বই সমধিক বলতে হবে। এর গুরুত্ব হ্রাসের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে তার ফলস্বরূপ ইহা জাগতিক লক্ষ্যের পূর্তিও সম্ভবপর হবে না। হয় লক্ষ্যের সিদ্ধিই হবে না, আর যদি হয়েছে বলে মনেও হয় তাহলেও যাঁদের জন্য এই প্রয়াস তাঁরা শান্তি ও সমৃদ্ধির মুখ দেখতে পাবেন না। গান্ধীজী সুনীতির উপর জোর দিতেন; কিন্তু আমরা তার প্রতি তেমন ভ্রূক্ষেপ করি নি। এর ফলে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর যে সুখ-সমৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি—এ দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। সাম্যবাদ স্থাপিত হলেও এই অবস্থা হবে।

একবার যে প্রগতির পথ পরিক্রমা করা হয়েছে তা আর ত্যাগ করা যায় না—এই বিশ্বাসও অর্ধসত্য। তাহলে তো পারমাণবিক বোমা, উদ্‌যান বোমা, হিটলারের গ্যাস-চেম্বার এবং বিশ্বযুদ্ধও বর্জন করা যায় না। পক্ষান্তরে উত্তরোত্তর এ সবেও তো শক্তি, ক্রূরতা, ব্যাপকতা ইত্যাদি বাড়াবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। এবং সে অবস্থায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর বিধ্বংসী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে যাত্রাও তো প্রগতি বলে বিবেচিত হবে।

এভাবে চিন্তাকারী লোকেরও অভাব নেই এবং এ-জাতীয় ঘটনা ঘটেও যেতে পারে। কিন্তু তাকে বিকাশাভিমুখী অগ্রগতি বলা চলবে না। এর ফলে হয় কিঞ্চিৎ ভুল-ভ্রান্তি করার পর আবার সঠিক পথে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা হবে, অথবা পুনরপি প্রলয় বা জনক্ষয় হবে। যদি সজ্ঞানে চেষ্টা

করতেই হয়, তবে তা করতে হবে এ জাতীয় সভ্যতা ও মানবতার ধ্বংসকারী প্রয়াসকে খর্ব করার জন্য, এই মারাত্মক সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করার জন্য নয়।

॥ ৬ ॥

শ্রেণীসমূহের উত্থান ও পতন

গান্ধীজী ও মার্কসের অন্তিম লক্ষ্যের মধ্যে যে প্রভেদ, তার সূচনা হচ্ছে সমাজের রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের বিচারধারার পার্থক্য থেকে। মার্কসের অভিমতানুসারে শ্রেণী-সংগ্রাম ও সর্বহারার একনায়কত্ব দ্বারা শ্রেণী-বৈষম্যের অবলুপ্তিসাধন ও ভূমি, খনি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কর্তৃত্বস্থাপন, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ,* শ্রমশিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং

---

* মার্কসবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে যুক্ত করায় জনৈক মার্কসবাদী সুধী আপত্তি করেছেন। অতএব রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বলতে আমি কি বুঝি তা পরিষ্কার করে বলা উচিত। আমি যতদূর জানি রাশিয়াতেও স্থূল ও অস্থূল উভয় প্রকার সম্পত্তির মূল্যাঙ্কন ও সেবার প্রতিদান দেবার সাধন হচ্ছে অর্থ। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক শুধু কার্যের পরিমাণের উপর অথবা (যেখানে তৎক্ষণাৎ এইভাবে পরিমাপ করা সম্ভবপর হয় না) সময়ের হিসাবে নির্ধারিত হয় না। সে কাজে কম-বেশি কতখানি বুদ্ধি লেগেছে, তার কথাও বিবেচনা করা হয়। এইভাবে জনৈক নিপুণ বৈজ্ঞানিক, কারখানার পরিচালক উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজারের সঙ্গে একজন সাধারণ শ্রমিকের বেতনের পার্থক্য পুঁজিবাদী দেশেরই মত।

দ্বিতীয়তঃ, কোন পণ্যের বিক্রয়মূল্য শুধু তার উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হয় না। সমান দোষগুণবিশিষ্ট দুটি পণ্যের একটি যদি অধিকতর নয়নাভিরাম হয় বা কোন কারণে যদি সেইটির ফ্যাশন চালু হয়ে যায়, তাহলে তার দাম অপরটি অপেক্ষা অধিক ধার্য করা হয়। অর্থাৎ মানুষের ফ্যাশন বা মোহ-সঞ্জাত দুর্বলতা ভাঙ্গিয়ে মুনাফা করা হয়।

তৃতীয়তঃ, বেতনের বৈষম্যের জন্য সমাজে জীবনযাত্রার উঁচুনীচু নানারকম শ্রেণী-বিভাগ হয়ে যায় ও শেষকালে এই যুক্তির অবতারণা করতে হয় যে, অধিক বেতনভোগী ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের জন্য সঞ্চয় করে তা রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করুক। এইজন্য পুঁজিবাদী দেশের মতই সরকারকে সুদ দিয়ে ঋণপত্র ছাড়তে হয়। কিন্তু সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় একমাত্র সরকারই এইভাবে ঋণ-গ্রহণে সমর্থ বলে একে আমি 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' আখ্যা দিয়েছি। এই শব্দটির পারিভাষিক অর্থ যদি অন্য কিছু হয়, তাহলে এই পাদটীকাকে কথাটি আমি যে অর্থে ব্যবহার করেছি তার বিশদব্যাখ্যা বলে ধরে নিতে হবে।

জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও কার্যকলাপের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ * ইত্যাদি সবই প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়।

পক্ষান্তরে গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত হচ্ছে বর্ণধর্ম, (অর্থাৎ কর্তব্য-বোধ দ্বারা চালিত হয়ে শিল্পসমূহের অনুশীলন) সত্যাগ্রহ, পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা, বিকেন্দ্রীকরণ, ন্যাসবাদ ও সামাজিক জীবনে যথাসম্ভব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের স্থাপনা করা।

সূক্ষ্মভাবে যদি শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, গান্ধীজী যে নৈতিক ও মানসিক পরিবর্তনের উপর জোর দিতেন, তা সাধিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণী-বৈষম্য বিলোপের জন্য মার্কস-কথিত পন্থানুসরণে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ হচ্ছে পুঁজিপতিদের হত্যা করে তাদের সম্পত্তি দখল করা অথবা রাজাদের শিরশ্ছেদ বা পদচ্যুত

কে. ভি. অস্ট্রোভিটিয়ানোভ নামক রাশিয়ার সাম্যবাদী লেখক এই বিষয়কে ভিত্তি করে সাম্যবাদ ও সমাজবাদের পার্থক্য দেখিয়েছেন এবং বলেছেন যে. রাশিয়াতে এখনও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যা হয়েছে তা হচ্ছে সাম্যবাদের পক্ষপুটে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। "সমাজবাদী ব্যবস্থায় পারিশ্রমিক দানের পদ্ধতি সাম্যবাদী ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। সমাজবাদী ব্যবস্থায় কাজের গুণ ও পরিমাণ দেখে পারিশ্রমিক ধার্য করা হয়। পারিশ্রমিক দানের সমাজবাদী পদ্ধতিতে কোন বস্তুর পূর্ণ মূল্য এইভাবে নির্ধারণ করা হয় এবং তা চুকিয়ে দেওয়া হয় পয়সা দ্বারা।" সোভিয়েট রাষ্ট্র তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে সমাজবাদী অর্থশাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি সুযোগ্যতার সঙ্গে অনুসরণ করেছে যে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত উপভোগের পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজবাদী রাষ্ট্রের পুঁজিসংগ্রহও যেন যথাসম্ভব অধিকমাত্রায় হয়। পুঁজিবাদের সর্বাধিক সমৃদ্ধির যুগে যে হারে পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি হত, সমাজবাদী পুঁজি সংগ্রহের আনুপাতিক হার তার চেয়েও বেশী। সাম্যবাদী দলের নেতৃত্বে সোভিয়েট নাগরিকরা যে সমাজবাদী আর্থিক কাঠামো রচনা করেছে এই হচ্ছে তার প্রধান নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য।" (দি রোল অফ দি স্টেট ইন দি সোশ্যালিস্ট ট্রান্সফরমেশন অফ দি ইউ ইকনমি অফ দি ইউ. এস. এস. আর.।)

* গোঁড়ামিবর্জিত দৃষ্টিতে যদি কেউ রাশিয়ার বিগত কয়েক বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে, তবে একথা নিশ্চয় সে মেনে নেবে যে, সেখানে সত্যকার গণতন্ত্রের অভাব বিদ্যমান। কারণ আসল গণতন্ত্রের নিয়ম হচ্ছে এই যে, সেখানে প্রত্যেক নাগরিকের নিজ বিবেকের নির্দেশে জীবনব্যবস্থা পরিচালনা করার অধিকার থাকবে এবং তারা স্বয়ং নিজজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে তার সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করবে। রাশিয়াতে ব্যক্তিকে এ অধিকার দেওয়া হয় নি। সেখানে বরং ব্যক্তির-আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের চেয়ে রাষ্ট্রের প্রতিই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেখানে ব্যক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের পরিপুষ্টির জন্য, রাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের সহায়ক নয়।" (দি থার্ড ওয়ে, উইলফ্রেড ওয়েলক্, পৃষ্ঠা ১০)।

করে হত্যাকারীকে প্রেসিডেণ্ট আখ্যা দিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত করা ও একেই "বিপ্লব" বলা। শেষ পর্যন্ত এতে শাসক-পরিবর্তন ছাড়া আর কোন লাভ হয় না। হতে পারে যে এর ফলে প্রথম প্রথম জীবনযাত্রা-পদ্ধতির কিছু রকমফের ও সংস্কার হল। কিন্তু কিছু দিন পরেই দেখা যাবে যে, জনসাধারণের চরিত্রে যতটুকু পরিবর্তন ঘটেছে, তা ছাড়া মানবের পারস্পরিক সম্বন্ধে বিশেষ আর কোন স্থান স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে নি। পুরাতন শাসকবর্গ ও তাদের পরিচিত ব্যক্তিদের বদলে নূতন মুখ দেখা দেয়, পুরাতন অনুগ্রহভাজনদের স্থান নেয় নূতন একদল অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি। এক শ্রেণীর মধ্যবিত্তের বদলে আর এক প্রকার মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। এইভাবে নূতন-পুরাতনের স্থান-পরিবর্তন হয়। কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও এদের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকবর্গের সম্বন্ধ "বিপ্লবের" আগে যা ছিল, এখনও প্রায় তা-ই থাকে। পূর্বতন নামের পরিবর্তে নূতন নামে পরিচিত রাষ্ট্রনায়ক ও মন্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথেচ্ছ সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা, সেনাপতিদের রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর অবাধ অধিকার, জমি ও অন্যবিধ সম্পত্তির আসল পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা, যন্ত্রবিদ্ ও বিশেষজ্ঞদের কোন শ্রমশিল্পের বিকাশ বা বিলুপ্তির অধিকার, শ্রমিকদের শরীর-শ্রমের অধিকার ইত্যাদি সবই পূর্ববৎ থেকে যায় এবং পূর্বেরই মত তাদের নিজস্ব পৃথক পৃথক শ্রেণী হয় এবং আগের মত এইসব পৃথক স্বার্থের

তবে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, সাম্যবাদী লেখকেরা এ অভিযোগ স্বীকার করেন না। রেজল ফিংগ্লার বলেছেন যে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিকাশের উপরই যাবতীয় প্রশ্ন অবলম্বিত। "একথা ঠিক যে রাশিয়াতে ব্যক্তিগত পুঁজিপতি ও আরামকেদারায় আসীন পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত অধিকার হরণ করা হয়। পুঁজিপতিদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ন্ত্রণের ফলে হ্রাস পায়। এবং কেদারাধিপতির হস্ত-পদকে কষ্ট না দেবার অধিকারও নষ্ট হয়। কিন্তু এ স্বাতন্ত্র্য যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল একথা সকলেরই জানা আছে। পুঁজিপতিদের এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লুঠ ও ধোঁকাবাজি এবং কেদারাধিপতি পণ্ডিতদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।" কিন্তু সমাজের হিতকর কার্যের জন্য আত্মবিকাশ করার অবকাশ রাশিয়ার প্রত্যেকে পায়—এই হচ্ছে এই লেখকের বক্তব্য। লেনিনের কথনানুসারে সাম্যবাদের আদর্শ হচ্ছে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে একজন রাঁধুনী বামুনও রাষ্ট্র-পরিচালন-ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।' (দি কমিউনিস্ট আনসার টু দি চ্যালেঞ্জ অফ আওয়ার টাইমস্-এর তৃতীয় অধ্যায় অনুসরণে।)

সংঘাত হয়। অত্যাচার ও স্বৈরতন্ত্রের জন্য যেমন হিংস উপায়ে জারের শাসনের অবসান ঘটান হল, তেমনি শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব অসহ্য হয়ে উঠলে ঐ পথে তারও বিনাশ হবে। এ বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই যে, শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্ব জারের রাজত্বের মত অত্যাচারী, সাম্রাজ্যবাদী ও ষড়যন্ত্রী শাসক, সেনানায়ক ও পুঁজিপতি সৃষ্টি করবে না।

পৃথক পৃথক বৃত্তি অনুসারে সমাজ যদি স্থায়িভাবে বিভক্ত না হয় ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই যদি ভাগ নিতে পারে, তবেই সত্যকার শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু আজকের জটিল সমাজ-ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি অনুসরণ করলেও যে শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপিত হবে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। বর্তমান অবস্থায় বড় বেশী হলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটা সদ্ভাব স্থাপিত হতে পারে। আর এও হবে ততটুকু, মানুষ যতটুকু সৎ, আদর্শবাদী, প্রেমপরায়ণ, সংযমী, আত্ম-নিয়ন্ত্রণকারী, মানবতার সেবক ও শুভচিন্তক এবং সামাজিক কর্তব্যনিষ্ঠ হবে। এইরকম সমাজে সর্বদেশীয় সমৃদ্ধি শান্তি ও একতা বিরাজ করবে এবং বাদ-বিসংবাদ যদি একেবারে থেমে নাও যায়, তবু এর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হবে। এইরূপ সুখীসমাজের সংস্থাপনার্থ নিম্নলিখিত শর্তসমূহ অপরিহার্য :

১। নিজের উপর যে সামাজিক ক্রিয়া ও কাজকর্মের দায়িত্ব পড়বে, মানুষ তাকে ব্যক্তিগত লাভালাভ, আনন্দ বা মহত্বাকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিতে না দেখে শুধু কর্তব্য-প্রেরণাচালিত হয়ে তা করে যাবে এবং

২। তাকে ধন-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হক বা কোনরকম পদ বা আসনে বসান হক, অথবা তার বিদ্যা, দক্ষতা বা শরীরের শক্তির উপযোগ করা হক, কিংবা তাকে শিশু, অক্ষম, কয়েদী বা ঐ জাতীয় অন্যান্য নিরুপায় ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হক, সে ঐসব কাজ করার সময় নিজেকে ন্যাসী মনে করবে ও নিজের উপর যে দায়িত্ব-ভার পড়বে, সততার সঙ্গে তা পালন করবে এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজ পদ, ক্ষমতা বা শক্তির দুরুপযোগ করবে না। এ ছাড়া আশা করা যায় যে, এইরূপ আদর্শ শ্রেণীহীন সমাজে প্রত্যেকে যথাশক্তি কাজ করবে এবং নিজ-ভরণপোষণের জন্য ঠিক ততটুকুই নেবে, যা সমাজ দিতে সক্ষম বা তার জীবন-যাত্রানির্বাহের জন্য যা একান্ত আবশ্যক।

পূর্বোক্ত শর্ত দুটি পালিত হলে রাজনৈতিক, আর্থিক ইত্যাদি পদ্ধতি যে

রকমই হক না কেন, জনসাধারণের নিশ্চয় এতে মঙ্গল হবে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার বাহ্য স্বরূপের বিশেষ মহত্ত্ব নেই। হতে পারে যে, নির্বাচিত পঞ্চায়েত পরিচালিত গণতন্ত্র বলে যা মনে হচ্ছে বা যে ব্যবস্থায় শ্রমশিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, তার চেয়ে রাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা শ্রেয় প্রমাণিত হল। পঞ্চায়েতীরাজ বা শ্রমশিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং রাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদ এর কোনটাই আমাদের অন্তিম লক্ষ্য নয়। এগুলি সাধনমাত্র। মানুষের চরিত্রের উন্নতি করতে এসব যতটুকু সহায়তা করে, ততটুকু মাত্র এদের মহত্ত্ব। গান্ধীজী এইজন্য মৌলিক নৈতিক তত্ত্বের উপর জোর দিতেন। তিনি রাজনৈতিক অথবা আর্থিক কাঠামোর বাহ্য স্বরূপের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করতেন না। কিন্তু মার্কসবাদ মনে করে :

"মানুষের বিবেক-বুদ্ধি তার পরিবেশ রচনা করে না। পক্ষান্তরে মানুষের সামাজিক অবস্থা তার বিবেক নির্মাণ করে।" (কার্ল মার্কস, স্ট্যালিন কর্তৃক নিম্নলিখিত পুস্তকে উদ্ধৃত।)

"কমিউনিস্ট দলের নীতিতে যাতে কোন ভুল না হয় এবং তারা যাতে অলস স্বপ্নদর্শী না হয়ে পড়ে, সেইজন্য সর্বহারাদের দলকে নিজ কার্যক্রম 'মানব-বুদ্ধির সিদ্ধান্ত' নির্ভরশীল করলে চলবে না। সমাজের ভৌতিক জীবনের বাস্তব আধারের উপর এই কর্মনীতি স্থির করতে হবে। 'মহাত্মাদের' শুভেচ্ছার বনিয়াদের উপর নয়, সমাজের ভৌতিক জীবনের সমৃদ্ধির জন্য বস্তুতঃ কি কি প্রয়োজন, সে কথা বিবেচনা করে এই কার্যক্রম রচনা করতে হবে। (স্ট্যালিন, ডায়লেকটিক্যাল এণ্ড হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম। পৃঃ ১৬, ইংরেজী সংস্করণ, মস্কো ১৯৪৯)।

আট বৎসর যাবৎ ঘনিষ্ঠভাবে কমিউনিস্টদের সঙ্গে থাকার পর একটি যুবক এখন আদর্শগত কারণে তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছে। কিছুদিন আগে সে আমাকে বলে :

"আমি দেখলাম যে, শ্রেণী-সংগ্রাম অর্থাৎ বিরোধী শক্তির সংঘর্ষকে মার্কস বিবর্তনের এক অপরিহার্য শর্ত মনে করেন। বিবর্তনের এই সিদ্ধান্তকে আধুনিক বিজ্ঞান নাকচ করে দিয়েছে। তবুও এর অর্থ হচ্ছে এই যে, মার্কসের বিচারানুসারে শ্রেণী-সংগ্রামকে সর্বব্যাপক করার জন্য দ্বেষ-বৃত্তির বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু দ্বেষ তো বিকারের নামান্তর, এ হচ্ছে মানসিক

বিকৃতি। এতে যুক্তি বা অনুভূতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। তাই মার্কসের মতবাদের ভিত্তি হল মানসিক বিকার এবং সাফল্যের জন্যও এই মানসিক বিকারের প্রয়োজন। তাহলে এইরকম সিদ্ধান্ত কি করে বিজ্ঞান বা দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ একটা মতবাদের আখ্যা পেতে পারে? এ ছাড়া মানুষের পক্ষে আজীবন মানব-প্রেমের সহজাত বৃত্তি বর্জন করে দ্বেষ-বৃত্তিকে ধ্যান জ্ঞান করে বেঁচে থাকা অসম্ভব। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোন মানুষ অসৎ থাকতে পারে না। সুতরাং আমি যখন দেখি যে, সর্বোদয়-বাদীরাও সাম্যবাদীদের ভাষায় নিজ আদর্শ ব্যাখ্যা করছেন ও 'শ্রমশিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ' ও 'শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপনা করা' ইত্যাদির কথা বলছেন, তখন আমি আশ্চর্য হই। আমার তখন মনে হয় যে, গান্ধীজী যে ন্যাসবাদ এবং বর্ণধর্মের উপর জোর দিতেন, তাঁরা তা ভুলেই গেছেন। তাঁরা পুরোপুরি সর্বোদয় আদর্শ বুঝতে পেরেছেন কি না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়।"*

মনে হয় যুবকটির কথা বিবেচনার যোগ্য।

---

* জনৈক বন্ধু এ সম্বন্ধে লিখছেন:

"মার্কসবাদী সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি তাতে মার্কস কোথাও কোন প্রকারে দ্বেষ-বৃত্তির শরণ নেবার কথা বলেন নি। জার্মানভাষায় তিনি যে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তার অর্থ হচ্ছে শ্রেণী-বিরোধ। বিরোধ-ভাব মানবের একটি সাধারণ বৃত্তি। একে অন্ততঃ দ্বেষ-বৃত্তির সম-পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। এ কথা সত্য যে, যাবতীয় বৈপ্লবিক চিন্তানায়কদের মত মার্কসও উগ্রভাষা ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তার জন্য যদি তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, তিনি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করার উপদেশ দিয়েছেন, তবে যীশুকেও এই একই দোষে দোষী বলতে হবে। 'আমি তলোয়ার নিয়ে আসছি', 'অগ্নি সর্পশিশু!' ইত্যাদি ভাষা তো তিনি ধিক্কার দেবার জন্যই প্রয়োগ করেছিলেন। তবে পূর্বোক্ত যুবকের মনে যে ছাপ পড়েছে, তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, ভারতীয় সাম্যবাদীদের বিচার-বুদ্ধি এ বিষয়ে কতটা অস্পষ্ট।"

উপরি-উক্ত কথা হয়ত ঠিক। তবে পূর্বেই আমি বলেছি যে এই আলোচনার ক্ষেত্রে মার্কসের সমর্থন থাক বা না থাক, মার্কস বা মার্কসবাদী বলতে আমি ভারতীয় কমিউনিস্টদের উক্তি ও আচরণে যে ভাষ্য প্রকট হয়, তাই ধরেছি। আর তা ছাড়া বিরোধ ও বিদ্বেষের মধ্যে তফাত হচ্ছে সরু-মোটা কীলকের প্রভেদ। সরু কীলক মোটা কীলকের পথ পরিষ্কার করে দেয়।

আসল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, বৃহদায়তন এক জটিল সমাজে বিভিন্ন প্রকারের কাজ করবার দরকার পড়বে বলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব ও অবস্থিতির প্রয়োজন থেকেই যাবে। এইসব কাজের যথোপযুক্ত পারস্পরিক সমন্বয় হলে বিভিন্ন শ্রেণীর (অর্থাৎ ঐ কাজ যারা করছে) মোটামুটি সৌহার্দ্য সহকারে শান্ত ও সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করবে। এ না হলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হবে। কোন সাইকেল-আরোহীর হাত পা ও চোখ যদি পারস্পরিক সমন্বয়ের

॥ ৭ ॥

বর্ণধর্মের আদর্শ

গান্ধীজীর যাবতীয় সামাজিক ও আর্থিক আদর্শ এবং কার্যক্রমকে যদি তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতে হয়, তবে বলতে হবে, "আমার অহিংসা থেকেই এর সৃষ্টি।" প্রাণীমাত্রের প্রতি স্নেহ ও প্রেম বজায় রেখে তিনি জীবনের সর্ববিধ সমস্যা ও বিবাদের সমাধান আবিষ্কার করার চেষ্টা করতেন। তাঁর ধর্ম ও ন্যাসবাদের আদর্শের জন্মও এর থেকে। ব্যক্তি, সমাজ বা মানবেতর কোন জীবও তাঁর কাছে কেবল পঞ্চভূতে নির্মিত পদার্থ মাত্র নয়। এসবকে আমরা কোন আসবাব বা মেশিন মনে করে এদের সঙ্গে তদনুযায়ী আচরণ করতে পারি না। অর্থাৎ নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যখন এবং যে ভাবে খুশি এদের আমরা রদবদল, নষ্ট বা ব্যবহার করতে পারি না। ঐরূপ জীবের নিজের মঙ্গল অন্যবিধ যাবতীয় উচ্চাদর্শের চেয়ে অধিক মূল্যবান এবং যদি কোন উচ্চাদর্শের পরিপূর্তির জন্য তাদের কোন ঐহিক সুখ বিসর্জন দিতেই হয় তবে তা যেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়। বহুজনহিতার্থে অল্প-সংখ্যকের আহুতি দেওয়া চলতে পারে বা ভবিষ্যদ্বংশীয়দের মঙ্গলার্থ একালের অধিবাসীদের যদৃচ্ছ দুঃখ-কষ্ট দেওয়ায় ক্ষতি নেই—এ নীতি তাঁর মনঃপূত নয়।

সঙ্গে কাজ না করে, তাহলে সে নিশ্চয় পড়ে যাবে এবং ফলে সে স্বয়ং ও তার সাইকেল ঘায়েল হবে এবং সম্ভবতঃ কোন পথচারীও আহত হবে। ব্যক্তি-বিশেষের ইন্দ্রিয়সমূহের পারস্পরিক সমন্বয়ের অভাব হলে কি হয়, তার উদাহরণ এ। নর ও নারী মিলেমিশে যদি ঘরসংসার ও কাজকর্ম না করে এবং এদের ভিতর এক জাতি যদি অপরের উপর প্রভুত্ববিস্তারে ইচ্ছুক হয়, তাহলে নর-নারীর সংঘর্ষ ও বিরোধ সৃষ্টি হবে। ইন্দ্রিয়সমূহের যথাযথ সমন্বয়ের অভাবের কারণ ইন্দ্রিয়সমূহকে ছেদন করে মানুষকে ইন্দ্রিয়বিহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত করা চলতে পারে না। আর নর ও নারীর বিরোধের কারণে সমাজকে নর বা নারীবিহীন করা চলে না। এইভাবে আধুনিক সমাজকেও শ্রেণীহীন করা চলে না। অবশ্য কর্ম বৈশিষ্ট্যহীন এক সরল সমাজব্যবস্থা রচনা করা চলে। তবে সে সমাজ জটিল হওয়া চলবে না এবং এর আয়তন হবে ক্ষুদ্র ও এ থাকবেও স্বতন্ত্র। আধুনিক সমাজে যত প্রকার সংঘর্ষ বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে যত রকমের সংঘর্ষ ঘটতে পারে তার নিরাকরণ করতে হবে যথাযোগ্য সমন্বয় দ্বারা, এর জন্য হয়ত সময় সময় নূতন করে অনুকূল পরিবেশ নির্মাণ করা ও অযোগ্য ব্যক্তিদের স্থানচ্যুত করার প্রয়োজন দেখা দেবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ সমস্যা মূলতঃ নৈতিক ও মানসিক।

আর আমি যতদূর জানি তাতে গান্ধীজী কখনও শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা তোলেন নি বা কখনও এমন কথাও বলেন নি যে এক শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপনা করাই আমাদের লক্ষ্য। খাওয়া-দাওয়া ও বিবাহ আদি সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ সামাজিক মেলামেশার পক্ষে বাধক জাতি বর্ণ ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক উচ্চ-নীচের ধারণা এবং একই জায়গায় বা বিভিন্ন স্থলে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পেশা বা আয়ের তারতম্যের কারণে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, তা দূর করার কথা তিনি অবশ্য বলতেন। কিন্তু যদি একেবারে আদিম অবস্থার কথা বাদ দেওয়া যায়, তবে সাধারণ মানব-সমাজে বিভিন্ন প্রকারের কাজের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। আর গান্ধীজীর মতে এদের পারস্পরিক সংঘর্ষ দূর করার উপায় হচ্ছে বর্ণধর্ম ও ন্যাসবাদের নীতি পালন করা। সততার সঙ্গে যদি পূর্বোক্ত উভয়বিধ নীতি পালন করা যায়, তবে উভয়ের সমন্বয়ের ফলে সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা সম্ভবপর হবে। আর কদাচিৎ যদি সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়, তাহলে তার নিরাকরণের অহিংস পদ্ধতি আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। মানুষ যতদিন অপূর্ণ প্রাণী থাকবে, ততদিন কোন প্রকার সংঘর্ষবিহীন সমাজের কথা চিন্তা করা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং এমন এক শিক্ষা-পদ্ধতি ও সরকার প্রয়োজন, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তি, শ্রেণী ও সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত হবে।

এই বর্ণধর্মের আদর্শ কি? শাস্ত্রীয় পরিভাষা এবং কর্মকাণ্ডের পোশাক বর্জন করলে এর স্বরূপ হচ্ছে নিম্ন প্রকারের:

সাধারণতঃ লোকে বংশানুক্রমিক ভাবে নিজ পিতৃপুরুষের পেশাই গ্রহণ করে থাকে। সমাজ-জীবনের স্থিরতা, পরিবারস্থ শিশুদের শিক্ষা এবং ঐ বিশেষ পেশাটির বিজ্ঞানসম্মত প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে এ অতীব উত্তম প্রথা। প্রত্যেক পেশার আয় ও মান-মর্যাদা যদি সমান বা এর কাছাকাছিও হয়, তাহলে জনকয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতঃ কেউ নিজ পুরুষানুক্রমিক পেশা পরিত্যাগ করবে না। তবে আশৈশব কোন ব্যক্তি অন্য পেশার পরিবেশে লালিত-পালিত হলে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, কোন বিশেষ পেশার প্রতি আকর্ষণ ও কুশলতা জন্মগত সংস্কার। একথা বৈজ্ঞানিক বিচারে ভ্রান্ত হলেও দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। কারণ আজীবন এবং পুরুষানুক্রমে একটি পেশায় আত্মনিয়োগ করার ফলে দেহ-গঠনের দিক থেকে মানুষের মধ্যে যে স্থায়ী পরিবর্তন আসে, তা মা-বাবার পর সন্তানের

দেহে সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য পরিবেশ যদি পেশার অনুকূল হয়, তবে সেই শিশুর পক্ষে অন্য বৃত্তির চেয়ে বংশানুক্রমিক পেশা গ্রহণ করার সম্ভাবনাই সমধিক। এইজন্য সমাজ-জীবনের সাধারণ নিয়ম হওয়া উচিত এই যে, প্রত্যেকে ধর্ম বা কর্তব্য হিসেবে নিজ পুরুষানুক্রমিক পেশা বা তার কোন শাখা-প্রশাখা অথবা তার সঙ্গে সম্বন্ধিত কোন বৃত্তি অবলম্বন করবে। একেবারে পৃথক ধরনের পেশা গ্রহণ করা ইষ্ট বা বাঞ্ছনীয় নয়। একথা যদি সকলে মেনে নেন যে, জীবনযাত্রানির্বাহের জন্য পৈতৃক পেশা অবলম্বন করাই উচিত, তাহলে আজ যে এম-এ ডিগ্রিধারী তরুণ-তরুণীদের উদরান্নের সংস্থানের উপায়নির্ধারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখা যায়, তখন আর এ শোচনীয় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে না। পেশার বিষয় স্থির হয়ে গেলে শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারেও স্থির উদ্দেশ্য ও স্থির দৃষ্টি আসবে। তাকে কি পড়তে ও পড়াতে হবে এ বিষয় সর্বদা স্পষ্টভাবে জানা যাবে। গান্ধীজী লিখেছিলেন :

"বর্ণের অর্থ অত্যন্ত সহজ। এর অর্থ শুধু এই যে, একান্ত নীতিবিরুদ্ধ না হলে শুধু জীবনযাত্রানির্বাহের উদ্দেশ্যে আমরা যেন নিজ পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি অবলম্বন করি।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ২০.১০.১৯২৭)।

এক্ষেত্রে গান্ধীজী সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রমের রাস্তা খোলা রেখে দিয়েছেন। বংশানুক্রমিক পেশা যদি নীতিবিরুদ্ধ হয় তবে তা করা চলবে না; তাকে বদলাতেই হবে। আর তিনি সাধারণ নিয়ম-বন্ধনের সীমাও নির্দেশ করেছেন; অর্থাৎ বংশানুক্রমিক পেশার প্রয়োজন শুধু নিজ-জীবনযাত্রা-নির্বাহের জন্য।

সাধারণ নিয়মের দ্বিতীয় এক ব্যতিক্রমও তিনি মেনে নিয়েছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কোন ব্যক্তির গুণ-ধর্ম যদি পিতৃপুরুষের থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে কি করতে হবে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন :

"......আমার পিতা যদি ব্যবসায়ী হন এবং আমার ভিতর যদি সৈনিকের গুণ থাকে, তাহলে কোন রকম পুরস্কারের অপেক্ষা না রেখে আমি সৈনিক হয়ে দেশসেবা করতে পারি। কিন্তু নিজ-জীবিকানির্বাহের জন্য আমাকে ব্যবসায়ই অবলম্বন করতে হবে।"

এই প্রশ্নকারীর অন্য এক প্রশ্নের জবাবে অন্যত্র তিনি বলেছেন :

"...এবং কোন বুদ্ধিমান সূত্রধরের পক্ষে অর্থোপার্জনের জন্য নয়, সেবার

উদ্দেশ্য নিয়ে ওকালতি করা সর্বদা সমর্থনযোগ্য।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৪.১১. ১৯২৭)

এই দুই ব্যতিক্রমের ফলে এক তৃতীয় ব্যতিক্রমও সৃষ্ট হয়। সমাজ বা কোন বংশানুক্রমিক পেশায় জনসাধারণের হিতার্থে কোন আমূল পরিবর্তন করার জন্য যদি স্বাধীনভাবে বিচারক্ষম ও নবীন দৃষ্টিসম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন হয়, তাহলে অন্য পেশা থেকে কিছু লোক অপসারিত করা চলতে পারে। এই বৃত্তি-পরিবর্তন সমাজের হিতার্থে, নিজের জন্য ধনসংগ্রহের মানসে নয়। উদাহরণার্থ যারা পুরুষানুক্রমিক ভাবে আরামে বসে বসে মস্তিষ্ক চালনা বা কলমপেশার কাজ করতে অভ্যস্ত বা যারা এমন কাজ করে আসছে যাতে হাত-পা এবং কাপড়-চোপড় সামলে রাখতে হয়রান হতে হয়, তাদের কৃষি, গো-পালনের মত শরীরশ্রমমূলক ও মাটি-গোবরে হাত-পা একাকার করার মত বা রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে খাটার মত কাজে আত্মনিয়োগ করতে প্রোৎসাহিত করা যেতে পারে।

কিন্তু এরকম ব্যক্তির সংখ্যা আজও ব্যতিক্রমের মধ্যেই ধর্তব্য। একথা সত্য যে, পূর্বের তুলনায় ক্রমশঃ এ জাতীয় ব্যতিক্রমের সংখ্যা বেড়ে চলছে ও ফলে এদের নিয়ে এক সমস্যা উপস্থিত হচ্ছে। এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, পেশার সঙ্গে সম্পর্কিত উচ্চ-নীচ শ্রেণীর ভাবনা এবং দ্বিতীয়তঃ, কর্তব্য-দৃষ্টি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নয়, অধিকাধিক অর্থোপার্জনমানসে বিভিন্ন পেশার প্রতি দৃষ্টি দেবার সংস্কার। এই সংস্কারের মূলে আবার রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাচীন প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা।

প্রথম কারণ সম্বন্ধে গান্ধীজী যে বর্ণধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে তাঁর আদর্শ স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছেন:

"আমার কাছে জন্ম বা কর্মের জন্য কোন মানুষ ছোট বড় নয়। ...... আমার বিশ্বাস, জন্মের সময় প্রত্যেকে সমান থাকে। ভারত, ইংলণ্ড বা আমেরিকা যেখানেই জন্ম হক অথবা যে কোন পরিবেশের মধ্যে মানুষ ভূমিষ্ঠ হক, সকল মানব অদ্বিতীয় আত্মার অংশ। আর আমি এই সমানতায় বিশ্বাসী বলে আমাদের অনেক শাসকের মনে যে ভূয়া গুঁঢ়েমা বাসা বেঁধেছে, আমি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। দক্ষিণ আফ্রিকাতে এই গুঁঢ়েমার বিরুদ্ধে আমি তিলে তিলে সংগ্রাম করেছি। আর এইজন্য নিজেকে আমি ঝাড়ুদার,

ভাঙ্গী, কাটুনী, তাঁতি, কৃষক ও শ্রমিক আখ্যা দিয়ে আনন্দ পাই। আবার ব্রাহ্মণেরা যেখানে বিদ্যাবল বা জন্মের কারণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেছে, আমি সেখানে তাদের বিরোধিতা করেছি। **আমার মতে অপর কোন মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা মনুষ্যত্বের অবমাননা।** সুতরাং, কোন ব্রাহ্মণ বা অপর যে কারও এই উচ্চতার দাবির বিরোধিতা কোন অব্রাহ্মণ যখন করে, আমি তখন তার সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করি। যে শ্রেষ্ঠতার দাবি করে, সেই মুহূর্তেই সে মনুষ্য-পদবাচ্য হবার অধিকার হারায়। এই হচ্ছে আমার সুচিন্তিত অভিমত।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৯.৯.১৯২৭)

বর্ণধর্মের আদর্শে উপনীত হবার দ্বিতীয় বাধা দূরীকরণের উপায় গান্ধীজী ন্যাসবাদের ভিতর দেখেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এর আলোচনা করব।

এখনকার মত এইটুকু সুস্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, গান্ধীজীর কাছে বর্ণধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক শ্রেণীগত বিশ্বাস বা ধর্মীয় আচার নয়। তাঁর মতে এ হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক নৈতিক নাগরিক ধর্ম। স্বয়ং নিজের জন্য এবং নিজ আশ্রিতবর্গ ও সমগ্র সমাজের হিতার্থে এ কর্তব্য পালনীয়। প্রতিটি নাগরিকেরই কর্তব্য হচ্ছে নিজ-ভরণপোষণের জন্য নিজসমাজের ধারণ, পোষণ ও উৎকর্ষসাধনের গুণাঢ্য একটি বৃত্তি অবলম্বন করা। এ পেশা যেন সুনীতি-বিরোধী না হয় ও এ যেন তার পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি হয়। পেশার ভেদে আজ যে উচ্চ-নীচ বিচারের মনোভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তা মনগড়া ও ক্ষতিকারক এবং সেইজন্য বর্জনীয়। এইভাবে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া এবং বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের যে প্রতিবন্ধক আছে তাও দূর হওয়া দরকার। এই উপায়ে প্রত্যেকটি বৃত্তি (বর্ণ) সম-মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

॥ ৮ ॥

ন্যাসবাদের আদর্শ

ন্যাসবাদ কি, একথা জানার আগে এ কি নয়, সেকথা আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। কারণ এ বিষয়ে জনসাধারণের মনে কিছু ভুল ধারণা আছে।

কেউ কেউ ভাবেন, আজ যাদের হাতে ধনসম্পত্তি উচ্চপদ ও ক্ষমতা ইত্যাদি রয়েছে ও ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় উপায়ে আজ একদল যা দখল করার চেষ্টা করছে, ন্যাসবাদের এই চিত্তাকর্ষক নামে এসব তাদের হাতে যেতে না দেবার জন্য এ এক চমৎকার বাধা সৃষ্টি করার ফন্দি। তাঁরা ভাবেন, ন্যাসবাদের এই মেকী আদর্শ খাড়া করার পিছনে ধনসম্পদ বা ক্ষমতার আসল মালিকদের বঞ্চিত করার মনোবৃত্তি গুপ্ত রয়েছে। তাঁদের মতে এইসব ন্যাসবাদের আসল মনোভাব হচ্ছে "যাঁরা বর্তমান কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে সম্পত্তি বা ক্ষমতা নিয়ে নেবার দাবি করেন, তাঁদের চেয়ে আমরা জনসাধারণের অধিক মঙ্গলবিধানে সক্ষম। আমাদের বিরোধী বা জনসাধারণের ভিতর এখনও দক্ষতাসহকারে এসব কাজকর্ম চালাবার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় নি। এইজন্য জনসাধারণের ন্যাসী অর্থাৎ হিতচিন্তকরূপে এখন আমাদেরই এসব পদে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত। অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে এসব অর্পণ করার অর্থ কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া।"

ইংরেজ শাসকবর্গ দেশবাসীর হাতে ক্ষমতা সমর্পণ না করার উদ্দেশ্যে বহুদিন যাবৎ এই অছিলা দেখিয়ে এসেছেন। তাঁরা বলতেন, "আমরা কার হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাই? দেশবাসী তো একেবারে নিরক্ষর, অনগ্রসর ও বুদ্ধি-বিবেচনাহীন। তাদের ভিতর ঐক্য নেই। জাতিভেদ, ধর্ম এবং সম্প্রদায় নিয়ে তাদের মধ্যে নানা রকমের বিবাদ চলছে। তাদের নাম নিয়ে যেসব তথাকথিত নেতা আন্দোলন করছে, তারা অতীব ধূর্ত। এরা তো ক্ষমতার জন্য নিজেদের মধ্যে ঝগড়া জুড়ে দেবে। এরা একেবারে স্বার্থপর। এরা দেশে শান্তি বজায় রাখতে পারবে না। এই কারণে এইসব অসহায় সরল শিশুবৎ নিরক্ষর ও অজ্ঞান প্রজাদের অভিভাবক হিসেবে আমরা কিছুতেই ভারত ছেড়ে যেতে পারি না।"

তবে ইংরেজ কিন্তু একেবারে বিনাপয়সায় বা ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দেশ শাসন করত না। আর তাদের কাজের ভিতর সততাও ছিল

না। এই কারণে দেশবাসী ঠিকই মনে করত যে ইংরেজের এই ন্যাসী হয়ে থাকার যুক্তি দেশকে অধীন করে রাখার এক অছিলা মাত্র।

তারপর আইনমুতাবিক নিযুক্ত ন্যাসীদের সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে এরূপ অভিজ্ঞতা হয়। কোন নাবালকের সম্পত্তির ন্যাসী বা অভিভাবক মালিক সাবালক হবার পরও সে সম্পত্তির অধিকার সমর্পণ ও হিসাবপত্র চুকিয়ে দেবার বেলায় নানারকম টালবাহনা করে দেরী করেন। কারণস্বরূপ তাঁরা বলে থাকেন যে, মালিকের এখনও সম্পত্তির দেখাশুনা করার যোগ্যতা হয় নি। সম্পত্তির আসল মালিক এইসব ন্যাসীকে ধূর্ত মনে করে ও তাঁদের বিশ্বাস করে না।

অতীতের এই অভিজ্ঞতার কারণে "ন্যাসী" শব্দটি এবং "ন্যাসবাদের আদর্শ" উভয়েরই বদনাম হয়েছে এবং অনেকে এর কথা চিন্তা করতেও ইচ্ছুক নন। ফলে আজকের "প্রগতিবাদী" নামে আখ্যাত রাজনীতিবিদ্‌দের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, গান্ধীজীর সঙ্গে রাজন্যবর্গ, জমিদার, পুঁজিপতি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সদ্ভাব ছিল বলে তাঁদের হিতার্থে গান্ধীজী বিশেষ চাতুর্যের সঙ্গে এই ন্যাসবাদের শব্দজাল উপস্থিত করেছিলেন। এইভাবে তাঁদের হাতে তিনি নিজ সম্পত্তি ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার এক অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন।

অনেকে আবার ভাবেন যে, অতীব উদার ও দানবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই গান্ধীজীর মতে আদর্শ ন্যাসী আখ্যা পাবার যোগ্য। উদাহরণার্থ যদি এমন কোনো রাজা বা কোটীপতি পাওয়া যায়, যিনি ব্যক্তিগত ভাবে অতীব অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন, সময় সময় যথেষ্ট দান করেন, বা যিনি কতিপয় লোকসেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন অথবা নিজ সম্পত্তির এক মোটারকম অংশ নিয়ে জনকল্যাণমূলক ন্যাসীমণ্ডলী স্থাপন করেছেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যিনি চাকরবাকরের সঙ্গে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করেন, দরিদ্রের প্রতি দয়াশীল, অতিথিসেবায় মুক্তহস্ত, বন্ধুদের বিপদ-আপদের ত্রাণকর্তা এবং অনৈতিকতার দোষমুক্ত এবং ধর্মকর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাহলে গান্ধীজী বলে দেবেন যে তিনি ন্যাসীর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর পরিবার-পরিজনের জীবনমান এবং তাঁর অর্থাগম পদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ-সব বিশ্বাস অমূলক; "ন্যাসী" শব্দটি আইনের পরিভাষা এবং আইন সময় সময় এর

যা ব্যাখ্যা করে এবং ন্যাসীদের অধিকার ও কর্তব্যের যে সীমা নির্দেশ করে, তা গান্ধীজী যে অর্থে "ন্যাসী" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার উপরও প্রযোজ্য। এ ছাড়া এর এমন কতকগুলি অপরিহার্য নৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে, যা আইনের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি "গান্ধীবাদ—সমাজবাদ" শীর্ষক এক ধারাবাহিক রচনা হরিজন পত্রিকায় লিখি। স্বয়ং গান্ধীজী ঐ প্রবন্ধমালার সম্পাদন ও সংশোধন করেন। ঐ রচনায় আমি ন্যাসবাদের ব্যাখ্যায় বলেছিলাম :

"ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে শোষণ ও প্রবঞ্চনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং প্রায়শঃ একথা বিশ্বাস করা হয় যে এ দুই একই বস্তু। 'গান্ধীবাদ—সমাজ বাদের' আলোচনায় প্রধানতঃ এই বিষয়টি নিয়েই সর্বাধিক উত্তেজনাপূর্ণ বাদ-প্রতিবাদ হয়ে থাকে। সত্য কথা বলতে কি, এই বিষয়ে গান্ধীজীর মতবাদ বোধ হয় উগ্রতম সাম্যবাদীর চেয়েও উগ্র। তিনি তো বলেন যে, কোন মানুষের কোন প্রকার পরিগ্রহ (সঞ্চয়) করা উচিত নয়। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতি তাঁর মোহ অথবা মনুষ্যজাতির উন্নতির পক্ষে সম্পদ-সংগ্রহ তিনি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করতেন বলে তিনি এই প্রথাকে বরদাস্ত করতেন না। এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণবৃদ্ধি ও সঞ্চয়প্রথা নিবারণের কোন সত্যাগ্রহী পন্থা এযাবৎ তিনি আবিষ্কারে সমর্থ হন নি। আমার বিশ্বাস, সব রকমের সমাজ-তন্ত্রীরাই মানবজাতির সুখের জন্য ধনসম্পত্তির সংগ্রহ অপরিহার্য বিবেচনা করেন। গান্ধীজী একে একটা আদর্শ হিসাবে মানতে প্রস্তুত নন। তবে বাস্তব অবস্থাদৃষ্টে গান্ধীজী বুঝেছেন যে, আজই মানুষ পরিগ্রহবৃত্তি পরিহার করবে, এ অবস্থা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, যাদের হাতে আজ ধনদৌলত ও সম্পত্তি আছে, তারা কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসব নিজের কাছে রাখবে বা কোন্ শর্তে আমরা তাদের কাছে থাকতে দেব? গান্ধীজীর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, প্রচলিত আইন অনুসারে বা বে-আইনীভাবে, যে প্রকারেই কেউ কোন সম্পত্তির মালিক হক না কেন, সে নিজের লাভের জন্য নয়, সমাজের তরফ থেকে সমাজের হিতার্থে সে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবে। অর্থাৎ সে নিজেকে ঐ সম্পত্তির "ন্যাসী" বা সংরক্ষক মাত্র বিবেচনা করবে। এই "ন্যাসী" শব্দটির জন্য অনেক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, লোকে এখনও

বুঝতে পারে নি যে, গান্ধীজী কোন কথা বলার সময় তার অন্তর্নিহিত আসল অর্থের উপর সম্যক জোর দিয়ে থাকেন।......ইংরেজ শাসকবর্গ একাধিকবার বলেছেন যে, ভারতে তাঁদের অস্তিত্ব হচ্ছে ন্যাসীরূপে এ দেশবাসীর কল্যাণের জন্য। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে পূর্বোক্ত কথনানুযায়ী আচরণ করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নন। আমরা এখন বেশ বুঝেছি যে, এই জাতীয় ভাষা প্রয়োগ করে তাঁরা ভারতবাসীকে বিভ্রান্ত করতে চান। এইভাবে গান্ধীজী যখন বলেন যে অর্থ ও ধনসম্পত্তির অধিকারীরা এর মালিক নয়, ন্যাসীমাত্র, তখন তাঁর এ কথাকে বাণীর অলঙ্করণ ছাড়া আর কিছু মনে করা হয় না। তাঁর সমালোচকদের মনে হয়ত অস্পষ্টভাবে এই ধারণা কাজ করে যে, আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ন্যাসীমণ্ডলী ও ধর্মীয় প্রথা দ্বারা স্থাপিত ন্যাসী-মণ্ডলীর ভিতর কর্তব্য ও দায়িত্বের কোনরকম প্রভেদ আছে। কিন্তু গান্ধীজী এ জাতীয় কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষ আচরণে রূপায়িত করার সম্ভাবনাবিহীন কোন আদর্শকে প্রতিপাদনের চেষ্টা করা গান্ধীজীর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি মনে করেন যে স্বচ্ছন্দে থাকতে হলে মানুষের যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী কারও কাছে থাকলে বলতে হবে যে, অপরের অজ্ঞতা বা নিরুপায় অবস্থার সুযোগে সে ঐ অধিকার পেয়েছে। কিন্তু এই নিরুপায় অবস্থার অবসান হয়ে তাদের মধ্যে শক্তির অভ্যুদয় হলে এবং অজ্ঞানের তিমিরান্ধকার জ্ঞানের সূর্যকিরণে অপনোদিত হলে অতিরিক্ত সম্পদের উপর তার অধিকার একমাত্র ন্যাসী ছাড়া অন্যরূপে থাকা অসম্ভব। দরকার হচ্ছে জনসাধারণকে বলশালী ও জ্ঞানবান করে তোলা। আর এর জন্য কি প্রকারের শক্তি সৃষ্টি করা প্রয়োজন যখন এই কথা চিন্তা করার সময় আসে, তখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান সম্পদের অধিকারীদের বদলে যাদের হাতে আমরা সম্পত্তির অধিকার তুলে দিতে চাই, তারা যেন অধিকার প্রাপ্তিমাত্র বর্তমান অধিকারীদের মত শোষক ও অত্যাচারী না হয়। এই যদি আমাদের ইচ্ছা হয়, তাহলে এ শক্তি হবে অহিংস শক্তি।"

সে সময়ে নিজেরই স্বচ্ছ ধারণা ছিল না বলে আমি যে বিষয়টি স্পষ্ট করে চিত্রিত করতে পারি নি, তা হচ্ছে এই :

যে সম্পত্তি ন্যাসীদের উপর ন্যস্ত বলে মনে করা হচ্ছে, তার আসল মালিক কে আর কে-ই বা এ সম্পত্তি থেকে উপকৃত হবার অধিকারী? তারপর এই ধরনের ন্যাসীর অধীনে কোন্ ধরনের সম্পত্তি ন্যস্ত করা চলতে

পারে? এবং গান্ধীজীর মতানুযায়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রকার ও পরিমাণের সীমা কি?

এখানে আমি পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির জবাব দেবার চেষ্টা করব। ন্যাস-বাদের আদর্শে ব্যক্তিগত বা সর্বসাধারণের মধ্যে পার্থক্য নেই। যে কোন প্রকারের পদার্থ যে পরিমাণে যারই আয়ত্তে থাক না কেন, সবই ন্যাসীর উপর ন্যস্ত সম্পত্তি। শুধু তাই নয়, এর ক্ষেত্রে স্থূল ও সূক্ষ্ম (যা নয়নগোচর নয়) সম্পত্তির ভিতরও কোন পার্থক্য করা চলবে না। এইভাবে শুধু সম্পত্তিই নয়, বরং উচ্চপদ, শ্রম করার শক্তি এবং হেলেন কেলারের মত মূক-বধির মহিলার বুদ্ধিচাতুর্যের উপরও ন্যাসবাদের নীতি প্রযোজ্য। এমন কি, কোন অনাথ-আশ্রমে যদি কোন পঙ্গু ব্যক্তির বিন্দুমাত্র ইচ্ছাশক্তি থাকে, তবে তাও তার ন্যাসের অধীন বলে মনে করতে হবে। অর্থাৎ সুস্থ মস্তিষ্কের প্রতিটি ব্যক্তির অধীনে যে কোন শক্তি বা ক্ষমতা থাকবে, সে মাত্র ন্যাসী হিসেবে তার মালিক ও ব্যবস্থাপক।

তাহলে এসবের আসল মালিক কে? গান্ধীজী বলেন—ঈশ্বর। এ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও ঈশ্বরের। আর এর মধ্যে যা কিছু স্থূল বা সূক্ষ্ম, সজীব-নির্জীব তত্ত্ব বিদ্যমান, সবই ঈশ্বরের। উদাহরণার্থ কোন কারখানার অংশীদার, ডিরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্ট, ইঞ্জিনীয়ার বা শ্রমিকের ভিতর কোন একটি বিশেষ শ্রেণী বা সকল শ্রেণীকে কারখানার মালিক বলা যায় না। আবার শুধু সরকারকেও তার মালিক বলা চলে না। কারখানা চালাবার জন্য এরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার সহায়তাকারী এবং সুচারুরূপে কারখানা চালাবার জন্যই এইসব বিভিন্ন প্রকারের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পৃথক অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যেককে সততা সহকারে নিজ কর্তব্য পালন করতে হবে। আর এ কাজ করার সময় তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক নেবার অধিকার আছে। কিন্তু তা বলে কিছু উদ্‌বৃত্ত হলে তার মালিক তারা হবে না।

জগতের সবকিছুর উপরই ঈশ্বরের স্বামিত্ব। কোন ব্যক্তি বা এমন কি সারা মানবসমাজও কোন বস্তু বা ক্ষমতার মালিক নয়। এই নীতি অংশীদার, ম্যানেজার, বিশেষজ্ঞ বা শ্রমিকদের লাভের পরিমাণ অনুযায়ী ডিভিডেণ্ড, কমিশন, বোনাস ইত্যাদি পাবার দাবির পথ বন্ধ করে দেয়। ভগবান মানুষের জন্য বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করে তার উপর তাদের একচ্ছত্র অধিকার

দিয়েছেন—এ আদর্শ মানা চলতে পারে না। যা কিছু সে পেয়েছে তা তাকে যথোচিত বিবেচনা সহকারে ব্যবহার করতে হবে ও নিজের প্রতিটি কাজের হিসাব দাখিল করতে সে বাধ্য। কোন কাজকে সফল করার জন্য যে ব্যক্তি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের সমগ্র কুশলতা, যোগ্যতা ও শক্তি ইত্যাদি নিয়োগ করেছে, প্রয়োজন থাকলে সে তার জন্য পারিশ্রমিক নেবে। কিন্তু সে পারিশ্রমিক হবে তার প্রয়োজন-পূতির জন্য, তার কাজ বা বুদ্ধির পরিমাণ অনুযায়ী নয়। উদাহরণস্বরূপ কোন কারখানার এক খঞ্জ চৌকিদার যদি একটি টুলে বসে কারখানা থেকে কি মাল বাইরে যাচ্ছে বা কারখানার ভিতর কি মাল আসছে তারই শুধু তদারক করে এবং সে যদি যথোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করে চলে তবে কারখানার সাধারণ মজুরি এবং উপরন্তু নিজের দৈহিক অক্ষমতার জন্য আরও যেটুকু বেশী প্রয়োজন, তাও পাবার অধিকারী সে হয়। এক্ষেত্রে কারখানার ইঞ্জিনীয়ার এবং পূর্ণতঃ সক্ষম শ্রমিক শুধু সাধারণ মজুরিই পাবে। সেখানকার ম্যানেজিং এজেণ্ট যদি অন্য কোন কাজ করার জন্য কোন সূত্র থেকে পারিশ্রমিক পান, তবে এখানকার কাজের জন্য তিনি কিছু নাও নিতে পারেন। মানুষের কুশলতা বা যোগ্যতার মূল্যাঙ্কন সে অর্থের রূপে কত পারিশ্রমিক পাচ্ছে, তার ভিত্তিতে করা যায় না।

তারপর ঈশ্বর সবকিছুর মালিক এই নীতি অনুযায়ী সরকার, ডিরেক্টরবর্গ বা শ্রমিকরা ইচ্ছা করলে সে সম্পত্তি নষ্ট করতে পারে না। "আমার সম্পত্তি আমি যা খুশি করব"—এ রকম দাবি করার কোন সুযোগই এ ক্ষেত্রে নেই।

(কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গান্তর হলেও এখানে একথা বলে দেওয়া অনুচিত হবে না যে, নৈতিকক্ষেত্রে আজকাল যে বলা হয় যে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের দেহযন্ত্র ব্যবহারের একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন, এই আদর্শ অনুযায়ী পূর্বকথিত সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। যেভাবে কোন সুস্থ ব্যক্তি শ্রম করা অস্বীকার করতে পারে না, সেইভাবে নিজ শরীর, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়শক্তির অপব্যবহার করার অধিকারও তার নেই।)

মালিকানা সমস্যার এই পর্যালোচনার পর তৃতীয় প্রশ্ন ওঠে এই যে, এই সমস্ত সম্পদ কাদের হিতার্থে নিয়োজিত হবে? এর উত্তর হচ্ছে—সমগ্র সৃষ্টি। অর্থাৎ কারখানার উদাহরণ নিলে বলতে হবে যে সেখানকার লাভের বখরাদার শুধু কারখানা চালাতে যারা সহায়তা করেছে তারাই, এ কথা

বলা চলে না। বরং সবকিছু ভোগ করতে হবে সকলের সঙ্গে মিলে এবং উপভোগের সময় মনুষ্যেতর প্রাণীর কথাও বিস্মৃত হলে চলবে না।

নিঃসন্দেহে মানুষ তার বিবেচনা-শক্তির সীমা অনুসারেই এই আদর্শ পালন করবে। প্রথমে তো স্থানীয় ক্ষেত্রে এ নীতি প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য এখানেও মানুষ অন্য প্রাণীর তুলনায় মনুষ্যজাতির প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দেবে। কিন্তু ক্রমশঃ যেমন তার দৃষ্টির সম্প্রসারণ হবে এবং তার সাধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে, তেমনি এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করাও হবে তার কর্তব্য। আর একে যথাসম্ভব বাড়িয়ে চলাই উচিত। বিশ্বের এক প্রত্যন্ত প্রদেশে যদি মানুষের অভাব দেখা যায়, তাহলে কোন স্বাবলম্বী ও স্বয়ংপূর্ণ গ্রামেরও এ অধিকার নেই যে, তারা স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সমস্তটুকু নিজেদের প্রয়োজনে লাগাবে। আর যদি ঐ অভাবগ্রস্ত এলাকার জনসাধারণের কাছে এর বিনিময়ে তাদের প্রয়োজনীয় কিছু দেবার মত না থাকে বা তাদের যদি এর মূল্য পরিশোধের সঙ্গতি না থাকে, তবে তারা ঐ অভাবপীড়িত জনসাধারণের কাছ থেকে কোন দাম চাইতে পারে না।

এবার মনুষ্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কি ধরনের এবং কতখানি হবে, এর জবাব দেওয়া অতি সরল। একজন কর্মীর সাধারণ নিয়মানুসারে যে পারিশ্রমিক ধার্য হয়, প্রয়োজন থাকলে বিবেকের নির্দেশে সে তার উপভোগ করতে পারে। এখন বা অদূরভবিষ্যতেও যদি তার ঐ সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক ব্যয় করার প্রয়োজন না থাকে, তবে অন্য যার এর প্রয়োজনীতা আছে তাকে বা স্থানীয় সার্বজনীক কোষে উদ্বৃত্ত অর্থ জমা দিয়ে দেওয়া উচিত।

এই আদর্শ বোঝার পর এবার একথা বোঝা কঠিন নয় যে, গান্ধীজী কেন একদিকে জমি, কারখানা ইত্যাদি কেড়ে নেওয়া ও অন্যদিকে এর জন্য ক্ষতি-পূরণ দানের নীতির বিরোধিতা করতেন। আজকের জমিদার ও শিল্পপতি ইত্যাদি যদি ন্যাসবাদের নীতি মেনে নিয়ে ন্যাসী হিসাবে নিজের কর্তব্য পালন করেন, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে জমি বা কারখানা ইত্যাদি কেড়ে নেবার প্রয়োজন থাকে না। আর এ উচিতও নয়। প্রথমে চেষ্টা করা উচিত যাতে তাঁরা এ নীতি মেনে নেন। ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাব এইজন্য গ্রহণের অযোগ্য যে কদাপি কোন ন্যাসীকে অপসারিত করলে ক্ষতিপূরণ দানের প্রথা নেই। ন্যাসীর কর্তব্য পালন না করে তাঁরা যদি মালিকানা স্বত্বের দাবি করেন, তবে তাঁদের সে দাবি স্বীকার করা চলতে পারে না। সে অবস্থায়

তাঁদের সরিয়ে দিয়ে নূতন ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা স্বয়ং দেখা দেয়। এই কারণে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই ওঠে না।

॥ ৯ ॥

সরলজীবন ও বিকেন্দ্রীকরণ

এযাবৎ যেসব নীতির আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে এবার স্পষ্ট হয়ে যাবে যে উৎপাদক শরীরশ্রম, ক্ষুদ্রায়তন স্বাবলম্বী সমাজ, রাজনীতিক ও আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ ও জীবনযাত্রাকে সহজ ও সরল করার প্রতি গান্ধীজী কেন এত জোর দিতেন।

আমাদের বর্তমান জীবন এত জটিল ও পরস্পর সম্বন্ধিত-গ্রন্থিতে আবদ্ধ যে, মনে যতই সর্বজীবের প্রতি দয়া ও করুণা থাক না কেন এবং যতই আমরা অহিংসা, শান্তি ও মানবের পারস্পরিক মিত্রতাবন্ধন স্থাপন করার অভিলাষ পোষণ করি না কেন, আমাদের সদিচ্ছা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। মানব ও মনুষ্যেতর প্রাণীর সম্পূর্ণ অথবা ধাপে ধাপে বিনাশ ও শোষণ, জনশক্তি ও পশু-শক্তির অত্যধিক অপব্যয়, প্রাকৃতিক সম্পদের বিবেচনাহীন অপচয় এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় মহাযুদ্ধের সম্মুখীন হবার জন্য নিয়ত প্রস্তুতি অনিবার্যভাবে আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে। এ-ছাড়া আমাদের ব্যবহৃত অনেক পণ্য কিভাবে কোথায় উৎপন্ন হয়, আমাদের শহর বা গ্রাম পর্যন্ত এগুলি আসে কি ভাবে ও কি পদ্ধতিতে এর বিতরণ হয় এবং জগৎ ও মনুষ্য-সমাজের অর্থনীতিতে এরা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এ-সব কথা আমরা জানিই না। জীবন-ব্যবস্থা যদি আজকের মত সরল হয়, এই অহেতুক অপচয় ও ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস করা যেতে পারে। আধুনিক জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য বহুবিধ দ্রব্য বিকেন্দ্রিত ও সরল উপায়ে উৎপাদন করা যেতে পারে। কিন্তু আজ এ রকম হচ্ছে না। দাঁতের মাজন সব গ্রামেই তৈরী করা যেতে পারে, সাধারণ কাগজ ও কালি প্রত্যেকটি গঞ্জ ও জনপদে উৎপন্ন হতে পারে, চরখা ও তাঁতের যন্ত্রপাতি ও ঐ জাতীয় নিত্যনৈমিত্তিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও আসবাব জেলা-শহরে বানানো চলতে পারে। সাধারণ অবস্থায় কোন গ্রামের খাদ্য, পরিধেয় ও গৃহনির্মাণের মামুলি সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য দূরদেশের উপর নির্ভর করার কোন

প্রয়োজন নেই। কিন্তু বর্তমান জীবনযাত্রায় বোম্বাই-এর অধিবাসী কোন স্বদেশী ব্রতধারীকেও কলকাতার দাঁতের মাজন, কেরলের সাবান, অন্ধ্রের লেখার কালি, রাজস্থানের হাতের তৈরী কাগজ বা টিটাগড়ের মিলের কাগজ, মাদ্রাজ বা বাঙলা দেশের চামড়ার জিনিস, পাঞ্জাবের তাঁত ইত্যাদি কিনতে হয়। আবার ঐসব প্রদেশের লোকও তাদের ঐ জাতীয় নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য প্রদেশান্তর থেকে আমদানি করেন। অর্থাৎ বোম্বাই-এর দাঁতের মাজন কলকাতায় ও বাঙলা দেশের সাবান কেরলে বিক্রি হয়। এইভাবে অহেতুক বিভিন্ন পণ্যের পরিবহণ-ব্যবস্থা করতে হয় ও এর ফলে অপচয়ও হয়।

বিকেন্দ্রিত উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদন ও উপভোক্তা পরস্পর পরস্পরের পরিচিত হয় এবং একের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অপরের জ্ঞান থাকে। সুতরাং তাদের রাজনীতিক ব্যবস্থা যদি যথার্থ প্রতিনিধি দ্বারা যথোপযুক্ত স্বাধীনতার সঙ্গে বিকেন্দ্রিত উপায়ে পরিচালিত হয়, তাহলে তাদের পক্ষে এক সদাজাগ্রত ও সচেতন গণতন্ত্রের জন্য বাস্তব পরিকল্পনা রচনা করা ও সে পরিকল্পনাকে মূর্ত করা অধিকতর সহজ হবে। দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হওয়া-মাত্র বেশী ক্ষতি হবার আগে তার প্রতিবিধান করা যাবে। কোন বিশেষ কাজ অমুক প্রকারের হিংসা, অন্যায় ও ক্ষতি ছাড়া চালান অসম্ভব, এ কথা বুঝতে পারলে তারা ঐ কাজ চলতে দেবে কিনা, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করার সুযোগ পাবে এবং সে কাজ চলতে দেবার সিদ্ধান্ত যদি তারা করেই, তাহলে বুঝেশুনেই এ দায়িত্ব তারা ঘাড়ে নেবে।

আজকের পরিস্থিতিতে ঔষধের ক্ষেত্রে যকৃতের বিভিন্ন প্রকারের নির্যাস, কয়েক ধরনের টীকা, এবং নরম চামড়ার চপ্পল, হাতব্যাগ, নীলগাই বাঁদর শূকর ইত্যাদি শিকার করা, বুনো গরুর সমস্যা, গরু-মহিষ জবাই করা, অকেজো গৃহপালিত পশু পালন করা, দুধ ঘি এবং বনস্পতির প্রশ্ন ইত্যাদি অনেক বিষয়ে কতখানি হিংসা অপরিহার্য,—এ কথার সম্যক বিচার করার দায়িত্ব আমাদের খেয়ালই থাকে না। কারণ যতখানিই হিংসা করা হক না কেন, তা আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সংঘটিত হয়। এইভাবে কোথাও কোথাও আমরা হিংসা বন্ধ হক বলে আন্দোলন করি, অথচ হিংসার লাভ ছাড়ি না এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে বৃথা হিংসাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি।

কেন্দ্রিত শিল্প-ব্যবসায়ের সাহায্যে উৎপন্ন পণ্যের উপভোক্তা জানেনই না যে ঐ সুদৃশ্য মোড়কের ভিতরস্থ নয়নাভিরাম দ্রব্যটি কিভাবে উৎপন্ন হয়েছে ও কেমন করে তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে! অহিংসাপ্রেমী ব্যক্তিও মনে করেন যে হৃদরোগের জন্য যে "ডিজিট্যালিস" নামক ঔষধ ব্যবহার করা হয়, তা নানারকম গাছ-গাছড়া থেকে তৈরী এবং তাই ঐ ঔষধ ব্যবহার করায় তাঁর আদর্শচ্যুতি হবার কারণ নেই। কিন্তু তিনি খবরই রাখেন না যে, তাঁর ঐ ছোট্ট শিশিতে ভরার আগে ঐ ওষুধ বহু গিনিপিগ ও ঐ জাতীয় প্রাণীর উপর প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে যে, কতটুকু মাত্রায় এ বড়ি মানুষের পেটে পড়লে তার ক্ষতি করবে না। অহিংসাপ্রেমী এ বিষয়ে অজ্ঞান; কারণ, তিনি না দেখেছেন এই ডিজিট্যালিসের গাছ, আর না দেখেছেন ঐ ওষুধের কারখানা।

এইভাবে কেন্দ্রিত ব্যবসায়ের সাহায্যে আজকাল আমরা বিদেশে বানর চালান দিচ্ছি। এইসব বানর আমাদের চাষ-বাসের খুব অনিষ্ট করে। তবুও এদের গুলি করে মারা আমরা বরদাস্ত করি না। কিন্তু বানর ধরে বিদেশে পাঠানতে আমাদের আপত্তি নেই। আমরা এইটুকু ভেবে দেখি না যে, আমেরিকান খদ্দের তো আর হনুমানভক্ত নয় যে পালন-পোষণ করার জন্য বানর আমদানি করবে! ওদেশে জীবিত প্রাণীর উপর বিবিধ প্রকারের বৈজ্ঞানিক অস্ত্রোপচারের জন্য এইসব প্রাণী কাজে লাগানো হয়। ফলে বানরগুলি অসীম যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু আমরা এর জন্য চিন্তা করি না। স্বচক্ষে এইসব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে, এইসব বানর যে অনিষ্ট করে, তা যদি একান্ত অসহ্য মনে হয়, তবে এদের এইভাবে বিদেশে পাঠানর চেয়ে বরং নিজের হাতে গুলি করা অনেক কম হিংসা। এইভাবে শহরবাসীকে দুগ্ধ সরবরাহ করার জন্য আমরা দুগ্ধবতী মহিষ ও গাভী শহরে রেখে এইসব অসহায় জীবের প্রতি কী ভয়ঙ্কর অবিচার ও হিংসা করি এবং অবশেষে এদের মৃত্যুর কারণ হই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সহজ জীবনযাত্রা এবং সরল রাজনীতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অহিংস সমাজরচনার পথে স্বতঃই অধিকতর অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সমর্থ। অত্যধিক কেন্দ্রিত যান্ত্রিক ও বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় হিংসার শরণ না নিয়ে উপায় নেই। কারণ বৃহদায়তন উৎপাদন জারী রাখার জন্য রাজনীতি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যয়বহুল

ও রাষ্ট্রীয় আয়ের এক বিরাট অংশ আত্মসাৎকারী রণসজ্জার অপরিহার্য। আর এর ফলে এমন সব আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয়, যার সমাধানের জন্য নিপুণ ও চতুর রাষ্ট্রবিদ্‌দেরও অন্ধকারে ইতস্ততঃ হোঁচট খেতে হয়। আর পূর্বোক্ত জীবন-ব্যবস্থায় শুধু বাষ্প-শক্তি, পেট্রোল ও বিদ্যুতের কলকব্জার উপরই নিয়ন্ত্রণ জারী হয় না, এর সঙ্গে মানুষেরও যন্ত্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়। এবং প্রতিটি নূতন নূতন বিপত্তির পরিণামস্বরূপ তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের উপর বিবিধ প্রকারের বিধি-নিষেধ প্রযুক্ত হয় ও নিত্য-নূতন নিয়ন্ত্রণের নীচে মানুষ চাপা পড়ে। ধীরে ধীরে আমরা এমন এক অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছি, যখন আমাদের সমগ্র জীবন-ব্যবস্থা,—কাজ, কর্ম, আহার্য ও পরিধেয়ের আকার-প্রকার, বাসস্থানের ধাঁচ ইত্যাদি সবকিছু এক কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং আমাদের এসব মেনে চলা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

একথা অবশ্য সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে না যে, সরল জীবনযাত্রার ফলে হিংসা, অন্যায় ও অন্যবিধ ক্লেশ সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হবে এবং মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, সদ্ভাব ও শান্তির স্বাদ পাবে। হিংসা ও অহিংসা তো আসলে আমাদের ভিতরের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশের অনুরূপ প্রকটক্ষম গুণ। বিশেষ এক ধরনের বাহ্যিক জীবনযাত্রার কাঠামো তৈরী করে দিলেই এ হবার নয়। অহিংসা, সত্য ইত্যাদি নৈতিক গুণ এককভাবে বিকশিত হতে পারে না; অর্থাৎ কারও ভিতর শুধু অহিংসা থাকবে অথচ সত্য, দয়া, ক্ষমা, অক্রোধ, তেজস্বিতা, ঔদার্য, উদ্যমপরায়ণতা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না—কেউ বিবেকশীল বা বিচারবান হবে না অথচ অহিংস হবে অথবা ক্রোধ ও দ্বেষ-বৃত্তিতে ভরপুর থাকা সত্ত্বেও অহিংস হবে—এ হতে পারে না। এসব বৃত্তি পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধিত যে, সবগুলির এক সঙ্গে বিকাশ হলে এদের যথাযোগ্য রূপে এবং যথাবিহিত মাত্রায় বৃদ্ধি হয়। শুধু জীবনের বাহ্য কাঠামো কোন এক বিশেষ ধরনে নিশ্চিত করে দিলেই এ-সব গুণের সৃষ্টি হয় না। এইভাবে যদিও বা অহিংসা ইত্যাদির একাঙ্গী বৃদ্ধি হয়, তবে তা বিচিত্ররূপ ধারণ করতে পারে। গুণবিচারে একজন গ্রাম্য চৌকিদার, তহসিলদার বা বেনে ততটাই দুষ্ট ও ক্রূর প্রকৃতির হতে পারে যতটা অমানুষ ইহুদী ও অন্যান্য কয়েদীদের রুদ্ধদ্বার কারাকক্ষে বন্ধ করে বিষবাষ্প প্রয়োগে হত্যাকারী নাৎসী জার্মানীর জল্লাদ কিংবা বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের

সিণ্ডিকেট অথবা চোরাবাজারী ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য-মিশ্রণকারী ব্যবসায়ী। তবুও উভয়শ্রেণীর হিংসায় ব্যাপকতা ও পরিমাণ-ভেদ তো থাকবেই। সরল জীবনযাত্রার সমাজে পারমাণবিক বোমা দ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস করা বা পাইকারী ভাবে হাজার হাজার ব্যক্তিকে হত্যা করার সুযোগ থাকবে না। আর জটিল জীবনযাত্রা অপেক্ষা সরল জীবনযাত্রার সমাজে দোষের কারণ, গোলযোগের কেন্দ্র ইত্যাদি খুঁজে বার করা ও তার নিরাকরণ করা অধিকতর সহজ হবে।

কথা উঠতে পারে যে, প্রত্যেকের জন্য একই প্রকার জীবনমান আদর্শ হিসেবে বাঞ্ছনীয় হলেও বাস্তবে কখনও এর রূপায়ণ সম্ভব নয়। ক্ষুদ্রায়তন গ্রামেও এমন সব অধিবাসী থাকা সম্ভব, যাদের জীবনযাত্রার মান বিভিন্ন প্রকারের। এর উপর গান্ধীজী যখন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা বাড়াচ্ছেন এবং ব্যক্তির জীবন থেকে যন্ত্রীকরণ ও রাজনিয়ন্ত্রণ দূর করার উপর জোর দিচ্ছেন, তখন তো এরকম প্রভেদ আরও বেশী করে হবে।

এ-কথা আংশিক সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন জীবনমানের মধ্যে আজকের মত এতটা পার্থক্য থাকবে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, পুঁজিবাদ অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকারীর হাতে এর লাভ ভোগ করার যথেচ্ছ ক্ষমতা রয়েই গেল, তবুও একজন গ্রাম্য কোটিপতির নিবাসস্থল এবং ভোগ-বিলাসের উপকরণ জনৈক কলকাতাবাসী কোটিপতির মত উঁচুদরের হওয়া সম্ভব নয়। গ্রাম্য ধনাঢ্য ব্যক্তি ও তাঁর পরিবার-পরিজন সাধারণ গ্রামবাসীর একেবারে অপরিচিত হবেন না এবং জনসাধারণও তাঁদের থেকে একেবারে দূরে থাকতে পারে না। রোজ প্রত্যেকের মুখ-দেখাদেখি অপরিহার্য। একের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি অপরের চোখের সামনেই থাকে। কলকাতার কোটিপতি তো প্রতিবেশী মধ্যবিত্ত গৃহটির সঙ্গেও অপরিচিত। হতে পারে যে গ্রামের গরীব জনসাধারণ মাটীর বাসন ব্যবহার করে ও সেখানকার ধনশালী অধিবাসী দৈনন্দিন কাজের জন্য পিতল-কাঁসা ও বিশেষ পর্বোপলক্ষে রূপার বাসন ব্যবহার করে। গ্রামে থাকলে এক দেবপূজা ছাড়া অন্য কাজে প্রত্যহ রূপার তৈজসপত্র ব্যবহার করা তার পক্ষে সম্ভবই নয়। কিন্তু শহরে ধনী-নির্ধনের মধ্যে এ প্রভেদের মাত্রা বেড়ে যায়। বিরাট বেলজিয়ান কাঁচে ঢাকা খাবার টেবিল, মূল্যবান চীনামাটীর তৈজসপত্র, রূপোর কাঁটা, চামচ, গেলাস ইত্যাদি এবং বহুব্যয়ে চিত্রিত শহরের ধনশালী ব্যক্তিদের খাবারঘর

এবং ঐ একই চৌহদ্দীর মধ্যে তাদের চাকরদের জন্য ছোট এক বা দুই কামরার কুঠরীর মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান, তা গ্রামের অসামঞ্জস্যের চেয়ে বহুগুণ বেশী। আবার এঁদের চাকরবাকরের অবস্থা যদি শহরের দরিদ্র ফেরিওয়ালাদের চেয়ে কয়েক গুণ ভালও হয়, তবু শহরের ঝাড়ুদার এবং মেথরদের অবস্থা তো একেবারে অবর্ণনীয়।

হতে পারে যে গ্রামের জমিদার-গিন্নী ও তাঁর ছেলেমেয়েরা কিছু মূল্যবান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড় পরেন এবং তাঁদের গায়ে দু'চারখানা গয়নাও থাকে। হয়ত তাঁদের চরখা তাঁত ইত্যাদি একটু দামী। এ ছাড়া দোল-দুর্গোৎসব, বিয়ে-পৈতের ব্যাপারে তাঁদের বাড়ীতে ঘটা একটু বেশী—তবুও জমিদার-গিন্নী এবং তাঁর মেয়েরা রোজ গরীবদেরই মত চরখা চালাবেন, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ করবেন এবং ঘরসংসারের ঝক্কিও তাঁদের সামলাতে হবে। তাঁদের মেলামেশা করতে হবে ঐ সাধারণ লোকদেরই সঙ্গে, তাদের সঙ্গেই খেলাধূলা, নাচগান সব চলবে, পাশাপাশি বসে তাদের রামায়ণ-গান আর যাত্রা-কথকথা শুনতে হবে এবং সামনাসামনি বসে তাঁদের হর্ষ-বিষাদে অশ্রুমোচন করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি যখন একসঙ্গে মিলেমিশে সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে এবং খেলাধূলা ও আনন্দানুষ্ঠান করে, তখন তাদের ভিতর ভেদাভেদ মিটে গিয়ে সমানতার ভাব বৃদ্ধি পায়। শহরে এর সুযোগ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ধনীদের সমাজ আলাদা, মধ্যবিত্তের সমাজ তার থেকে পৃথক এবং দরিদ্রের সমাজ তো এতদুভয়ের বাইরে। যে যার নিজের দুনিয়ায় নিজেদের নিয়ে মগ্ন থাকে। শুধু অর্থের আদান-প্রদান বা চাকরির ক্ষেত্রে যা কিছু পারস্পরিক দেখাশুনার সুযোগ হয়। উপরের তলার লোকেরা নীচের তলার লোকেদের সাংসারিক সমস্যা সম্বন্ধে পুরোপুরি কল্পনাও করতে পারে না।

বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকেদের যখন বারবার পরস্পরের কাছে আসতে হয় এবং একের চোখের সামনে যখন অপরের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয়, তখন এই পরিস্থিতি সকলের অগোচরে নিজ-ভোগ-বিলাসের জন্য মনে আত্মগ্লানি সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ভিতর থেকে কোন কোটিপতিও অত্যধিক বাবুয়ানা, স্বার্থপরতা ও অপরের সুখ-সুবিধার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীনতার পরিচয় দিতে পারে না। এইভাবে এই ধরনের জীবনযাত্রা-প্রণালী স্বয়ং ন্যাসবাদের মনোবৃত্তির বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়।

মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ন্যাসবাদের আদর্শে যদি শেষ পর্যন্ত স্রেফ পরকে উপদেশ দেওয়া ও ব্যক্তিগত মালিকানার প্রথা পূর্ববৎ চলতে দেবার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবার আশঙ্কা দেখা যায়, তবুও সরল জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও বিকেন্দ্রিত সমাজ-ব্যবস্থা রচনার মধ্যে স্বভাবতই হিংসাকে কমানোর ও বৈষম্য এবং আর্থিক কলহ নিবারণের অধিকতর অনুকূলতা বিদ্যমান।

॥ ১০ ॥

উপসংহার

আমার মনে হয় গান্ধীজী ও মার্কসের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তের আলোচনা করা হয়ে গেছে। আমি এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করছি যে, জীবন এবং তার বিভিন্ন সমস্যার প্রতি গান্ধীজী ও মার্কসের ভিতর দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান এবং উভয়ের দৃষ্টিকোণের এই পার্থক্যকে "হিংসাবর্জিত সাম্যবাদ", "সাম্যবাদযুক্ত আস্তিক্য-বিশ্বাস" বা ঐ জাতীয় সরলসূত্রে ব্যাখ্যা করা যায় না। "শ্রেণীহীন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা করা গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল, একথা বলা সঙ্গত নয় এবং সম্ভবতঃ এও বলা উচিত নয় যে "ধর্মাশ্রিত নৈরাজ্য" অর্থাৎ ব্যবস্থিত শাসন-ব্যবস্থা বিনাই সুব্যবস্থাপূর্ণ সমাজ রচনা করা কিংবা "কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, শিল্প-বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো বিসর্জন করাই" গান্ধীজীর ঈপ্সিত ছিল।

সহজ ভাষায় বলতে হলে আমি বলব যে, গান্ধীবাদ হচ্ছে এক নিশ্চিত আদর্শের প্রতি অগ্রসর হবার বিশেষ পদ্ধতি। গান্ধীজী কর্তৃক বহুবার উদ্ধৃত উদাহরণ দিতে হলে বলতে হবে যে, এ আদর্শ হচ্ছে জ্যামিতির বিন্দুর ন্যায়। অস্পষ্ট হলেও এর শুধু কল্পনা করা চলে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লেখনীর অগ্রভাগ দ্বারাও একে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এ আদর্শের সঙ্গে হিমালয়ের কোন উচ্চচূড়ার তুলনা চলতে পারে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় না যে, এ শিখর-শীর্ষে উপনীত হওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। কিন্তু পর্বতারোহণ আরম্ভ হলে আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করি যে, যে স্থিতিকে আমরা আদর্শের অন্তিম চূড়া মনে করেছিলাম, কাছে এসে দেখা যাচ্ছে যে সেটি একটি মধ্যপথস্থিত গিরিশিখর ছাড়া আর কিছু নয়। সর্বশেষ পর্বতশৃঙ্গ তো এখনও বহুদূরে। আর এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। দীর্ঘকাল স্থায়ী ও নিয়ত

অনুশীলনের কার্যক্রম এ। তবু এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে একজন মাত্র ব্যক্তিও স্বতন্ত্রভাবে সার্থকতার সঙ্গে এর অনুশীলন করতে পারে এবং তার প্রচেষ্টা যতখানি সফল হবে, বিশ্বেরও ঠিক সেই পরিমাণ মঙ্গলবিধান হবে।

সত্য ও অহিংসা, সমাজে সমমর্যাদা, আত্মোন্নতির সমান সুযোগ, ধন এবং জীবনধারণোপযোগী উপকরণসমূহের সমবণ্টন রাষ্ট্রীয়-নিয়ন্ত্রণ-পাশ থেকে মুক্তি, বিকেন্দ্রীকরণ, অযান্ত্রিকতা, শান্তি, সদ্ভাব, মৈত্রী, যুদ্ধের আতঙ্কমুক্তি, আইনকানুনের নিগড়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া, সর্বাধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যযুক্ত অথচ সুব্যবস্থিত সমাজ ইত্যাদি বিষয় এই আদর্শ জীবনের বিভিন্ন অঙ্গ। কিন্তু এর ভিতর কোনটিই এককভাবে বা সম্পূর্ণ মাত্রায় মূর্ত হতে পারে না। স্বতন্ত্রভাবে এর ভিতর দু-একটির বিকাশ করার প্রচেষ্টার পরিণাম হয়ত বিচিত্র ও শোচনীয় হবে। এসব জিনিস ছাঁচে ঢালাই করে গড়ার মত বা আইন করে সবার উপর জারী করার মত নয়। আজীবন শহরের বাসিন্দা জনৈক কর্মী সম্বন্ধে প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ-প্রসঙ্গে গান্ধীজী একবার বলেছিলেন, "ও গ্রামীণ মনোভাবের মানুষ।" তাঁর কথার অর্থ ছিল এই যে, সেই কর্মীটি নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনের এমন সব সরল ও গ্রাম্যপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য সর্বদা বিভোর হয়ে থাকতেন, যা কিনা স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে স্থানীয় সাধন সরঞ্জামের দ্বারা গ্রামে উৎপন্ন করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথেরও পল্লীপ্রাণ ভারতেরও জন্য এক অবদান ও বাণী ছিল। তবে কবিগুরু জোর দিয়েছিলেন গ্রামজীবনকে সৌন্দর্য, ললিতকলা ও আনন্দের আকর করার জন্য; আর গান্ধীজীর চেষ্টা ছিল গ্রামে কর্মযজ্ঞ, শ্রমশিল্প, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুস্থশরীর ও সদাচার নির্মাণ করার প্রতি।

গান্ধীজী কিন্তু গুরুদেবের বাণীর মর্যাদা পুরোপুরি উপলব্ধি করতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। কারণ, তাঁর কল্পনার গ্রামীণ জীবন শৃঙ্খলাবিহীন কুঅভ্যাসের সমবায় ছিল না বা সরল জীবন বলতে তিনি কষ্ট ও দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ জীবন-যাত্রায় সন্তুষ্টি মানা বুঝতেন না। অত্যাচার ও অবিচার সহন করা এবং অপমান, হতাদর ও আত্মসম্মানের প্রতি আঘাতের কাছে নীরবে নীতি স্বীকার করা তাঁর কাছে গ্রাম্যজীবনের অভিপ্রকাশ বলে স্বীকৃত হয় নি। তাঁর আদর্শ এ ছিল না যে জীবনে সৌন্দর্য, চারুকলা, কল্পনা ও আনন্দের কোন স্থান নেই। বরং তিনি এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন ও চাইতেন যে সাধারণভাবে জনসাধারণের প্রার্থনাসভা, সঙ্গীত, কথকতা, চিত্রকলা, বাসগৃহ

রচনা-পদ্ধতি ও কাজের সাজসরঞ্জামের মারফত জীবনের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি প্রকট হক।

গান্ধীজীর জীবনদর্শন সম্বন্ধে একাধিক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। একদল তাঁকে সনাতন হিন্দুসংস্কৃতির বৈরাগ্য ও সাধুজীবনের ধারক ও বাহক মনে করেন। তাঁর অহিংসাকে জৈন ও বৈষ্ণব সমাজের পূর্ব হতে প্রচলিত অহিংসার নামান্তর ও যেন তেন প্রকারেণ সর্ববিধ প্রাণী ও জীবজন্তুর প্রাণরক্ষা করাই শুধু এর উদ্দেশ্য মনে করা হয়। তাঁর নম্রতার অর্থ করা হয় নীরবে অপমান সহ্য করে নেওয়া। তাঁর আত্মবিলোপন নীতির ব্যাখ্যা করা হয় যে, এ হচ্ছে অন্যায়ের অপ্রতিরোধ ও অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ বৃত্তি। অন্যদিকে তাঁর সক্রিয় অহিংসার আদর্শ "ভীরুতার চেয়ে হিংসা কাম্য" এই সূত্রের ব্যাখ্যা বারবার এইভাবে করা হয় যে, গান্ধীজী যেন লড়াই ও হিংসাত্মক প্রতিকার করার জন্য খোলা সনদ দিয়ে দিয়েছেন!

আমার বিনম্র নিবেদন হচ্ছে এই যে, এসব হল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গান্ধীজীর জীবনদর্শনের বিকৃতচিত্র।

ব্যষ্টি বা সমষ্টি যেভাবেই জীবনের অভিব্যক্তি হক না কেন এবং এর ভিতর পূর্বাপর সম্বন্ধ ও পারস্পরিক সম্পর্ক থাকুক বা নাই থাকুক, এর লক্ষ্য হচ্ছে অস্তিত্বের আদর্শ-স্থিতির অনুসন্ধানে সতত ও নিরন্তর প্রচেষ্টা করা। কেউ জানে না যে, সে আদর্শ-স্থিতি মূর্ত হলে এই ভৌতিক সংসারে তার স্বরূপ কেমন হবে! ঐ লক্ষ্যে পৌছানর জন্য মাঝপথে কোন্ কোন্ অনিবার্য ধাপ পার হতেই হবে। এই মহা অভিযানে যে ভুল-ত্রুটি, নিয়মভঙ্গ ও দোষ ইত্যাদি হবে তার সংশোধনের নিশ্চিত পন্থা কি, বা যে অন্যায় বা ক্ষতি হয়ে গেছে তাকে কিভাবে পূর্ববৎ ত্রুটিহীন করা যায়, এ কথাও কেউ বলতে পারে না। কোন ব্যক্তি বা সমাজের ভাবী বিকাশ বা বিলয়ের রূপ ও মার্গ কেমন হবে এ সম্বন্ধে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। শপথ করে কারও এমন কথা বলা উচিত নয় যে "এই কথাই শুধু সত্য, সর্বথা সত্য এবং এতে কোন প্রকারের দোষ বা অসত্যের সংস্পর্শ নেই।"

একথা স্বীকার করতেই হবে যে মানুষের বুদ্ধি অতীব সীমিত, মানুষ অল্পজ্ঞ। জ্ঞানী আখ্যাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও সত্যসন্ধ ছাড়া আর কিছু নয় এবং তাদের এ অনুসন্ধানও যেন ঘন তমসাচ্ছন্ন নিশীথে নিবিড় বিটপীবেষ্টিত অরণ্যের ভিতর পথ খোঁজার প্রয়াস। মাঝে মাঝে জ্ঞানের চকিত বিদ্যুল্লতা

তার তড়িৎ প্রভায় দুই এক পদ এগিয়ে দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। অতীব নৈষ্ঠিক সত্যানুসন্ধানকারীকে তারই উপর নির্ভর করে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করতে হয়।

গান্ধীজী মানব-বুদ্ধির এই সীমাবদ্ধতা বিনম্রচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাইতে তিনি কার্ডিনাল নিউম্যানের কথা উদ্ধৃত করে বারবার বলতেন, "আমার কাছে পরবর্তী পদক্ষেপই যথেষ্ট।"

তিনি আমাদের যে নবীন ও স্পষ্ট পথ দেখিয়েছিলেন তা হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তির নিজ আচার, বিচার ও উক্তির সততায় যতখানি বিশ্বাসই থাক না কেন, তবু তার ভিতর এ কথা স্বীকার করার মত নম্রতা থাকা উচিত যে, তার হয়ত ভুল হতেও পারে। কিন্তু বর্তমানে কোন ভ্রান্তি তার দৃষ্টি-গোচর হচ্ছে না বলে সত্যের উপাসক হিসাবে তার কর্তব্য হচ্ছে দৃঢ়তা ও পৌরুষ-সহকারে নিজের পথে এগিয়ে চলা ও অপরকেও তার অনুকরণ করতে উপদেশ দেওয়া। তবে ভ্রান্তির সম্ভাবনার কথা স্মরণ রেখে তার দায়িত্ব এও হয় যে, নিজপথে চলার কালে সে অপর কারও ক্ষতি করবে না ও যারা তার সঙ্গে সহমত নয়, ভয় দেখিয়ে তাদের সহযাত্রী করবে না বা নিজ মতবাদ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে না।

মতভেদ হলে সংঘর্ষের উপক্রম হবেই। এসব ক্ষেত্রে সদ্‌যুক্তি হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য এ সময় যেন সততা ও অহিংস উপায় অবলম্বনের প্রতিই জোর দেয়। "শুদ্ধ আদর্শ ও শুদ্ধ সাধনের" নীতি প্রত্যেককে সম অধিকার ও সমান সংরক্ষণ দেয় এবং এর ফলে সত্যকার গণতন্ত্রের রূপায়ণ সম্ভবপর হয়। জীবনপথে চলার সময় সে যেন মিথ্যা ও হিংস উপায় প্রয়োগ করে অপরকে সপক্ষে আনার চেষ্টা না করে এবং নিজ পন্থার অভ্রান্ততা সম্বন্ধে মনে তিলেকমাত্র আস্থা থাকা পর্যন্ত সে পথে চলার ও তার প্রচার করার কর্তব্য থেকে যেন নিবৃত্ত না হয়! যারা শুদ্ধ সাধনের আদর্শে বিশ্বাসী নয়, তারা হয়ত এর পরিণামে তাকে প্রতারিত করতে পারে বা তার উপর হিংসানুষ্ঠান করতে পারে। কিন্তু এ বিপদের ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। বিরোধী পক্ষও যদি শুদ্ধসাধনের নীতিতে বিশ্বাসী হয়, তবে অবশ্যই বিবাদ নিষ্পত্তির কোন শান্তিময় উপায় খুঁজে বার করা যাবে। আর বিরোধী ঐরকম না হলে সত্যাগ্রহের অবস্থা সৃষ্টি হবে। সত্যাগ্রহের ফলস্বরূপ সম্পূর্ণভাবে হৃদয়-পরিবর্তন না হলেও বিরোধীপক্ষের আচার-ব্যবহারে পার্থক্য

হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। সে অবস্থায় মীমাংসার একটা পথ খুলে যেতে পারে। একে পূর্ণ হৃদয়-পরিবর্তনের পথে একধাপ এগোন গেল বলা যেতে পারে।

তবে প্রতিপক্ষ অত্যন্ত একরোখা হলে হয়ত সত্যাগ্রহীর সম্পূর্ণ আত্ম-বিলোপন ও তার আত্মোৎসর্গে বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। এমনও হতে পারে যে বিরোধীপক্ষও হয়ত সত্যাগ্রহী এবং মনে করে যে নিজেকে সত্যাগ্রহী আখ্যাদানকারী অপরপক্ষ সত্য থেকে এত দূরে যে, তাকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেবার অর্থ হচ্ছে অসত্যের কাছে নতিস্বীকার করা। এ হচ্ছে দুজন সত্যাগ্রহীর ভিতর বিবাদের চিত্র। সাধারণতঃ এর শোচনীয় পরিণতি হবার সম্ভাবনা অল্প; তবুও সাধারণের বিশেষ ব্যতিক্রম হিসেবে এরকম পরিস্থিতির কল্পনা করা যেতে পারে।

হিংসাত্মক বিপ্লবের ফলে সমাজে অতি দ্রুত সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংঘটন হল বলে মনে হয়। কিন্তু মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজের অভিব্যক্তির (ইভলিউশান) উপযুক্ত সামাজিক স্তরে ফিরে আসে। স্থায়ী পরিবর্তন সাধন সম্ভব শুধু অহিংসার দ্বারা। এপথে অবশ্য মধ্যবর্তী পদক্ষেপ বা ধাপ থাকতে পারে। কখনও হয়ত আদর্শের সঙ্গে আপোস-রফাও করতে হতে পারে। কিন্তু এ দুই-এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সত্যাগ্রহী যখন বিরোধী পক্ষের সত্য স্বীকার করে, তখন তা হয় আপোস। আর বিরোধীর জীবনযাত্রায় দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্য অসুবিধা হ্রাস করার জন্য যদি তাকে কিছু সুবিধা দেওয়া হয় ও এইভাবে ধাপে ধাপে আদর্শের শেষ সীমা পর্যন্ত তাকে যদি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়, তবে তাকে মধ্যবর্তী পদক্ষেপ বলা হবে।

আলোচনা শেষ করার আগে একটি বিষয়ে আমি সকলকে সতর্ক করে দিতে চাই। আজকাল সাম্যবাদের বিরুদ্ধে যে প্রচার চলছে, তা দেখে একটি গ্রামীণ কাহিনীর কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। অর্ধেক রাতে একপাল ভেড়া গ্রামের দিকে আসতে দেখে জনকয়েক সজাগ গ্রামবাসী খুব চীৎকার জুড়ে দিল। তাই না শুনে গ্রামের নারী ও শিশুর দল ঘরের নিরাপদ কোণ দেখে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে পড়ল। গরু-ছাগল সব তাড়াতাড়ি অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হল। যুবকেরা নিজেদের লাঠি-সড়কি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল; আর বয়োবৃদ্ধ যারা, তারা আগুন জেলে অন্ধকার দূর

করার কাজে লেগে পড়ল। প্রথমে চেঁচান হয়েছিল নিদ্রিত গ্রামবাসীদের সাবধান করার জন্য এবং তারপর চীৎকার জারী থাকার কারণ হচ্ছে মেষপালকে তাড়ান। আজ গণতন্ত্রবাদী দেশসমূহ যেভাবে সাম্যবাদের বিরোধিতা করছে, তার সঙ্গে পূর্বোক্ত অবস্থার তুলনা চলে।

আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমী গণতন্ত্র স্বীয় মরণাস্ত্র এবং রাজনীতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রের দাবার চালে সাম্যবাদকে পরাজিত করবে বলে ভাবছে। ভারতে আমরা এতদুদ্দেশ্যে "গান্ধীজীর পথ" গ্রহণ করার কথা বলে থাকি। কিন্তু একথা বলার সময় নিজ জীবনে গান্ধীবাণী মূর্ত করার বদলে জনসাধারণের গান্ধীভক্তি ভাঙিয়ে লাভবান হবার মনোবাসনাই প্রবল থাকে। আর একদল জনসাধারণকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য মার্কসবাদী ভঙ্গীতে গান্ধীজীর আদর্শ ব্যাখ্যা করেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদী উপদ্রব দমন করার কাজ আমাদের শাসন-যন্ত্র বীরবিক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি কিন্তু এসব উপায় সফল হবে বলে ভরসা রাখি না। আমার আশঙ্কা হয় যে, এ পন্থা গ্রহণ করে সাম্যবাদ-বিরোধীরা লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ হচ্ছেন। আর দমননীতির ফল সর্বদা যেমন হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তাই হবে এবং সাম্যবাদ এর ফলে প্রবল হবে। পারমাণবিক বোমা, উদ্যান বোমা বা গোপন স্বার্থের জন্য প্রদত্ত আর্থিক সহায়তায় সাম্যবাদ দমন করা যাবে না। তেমনি গান্ধীবাদের জয়ধ্বনি দিয়ে, কমিউনিস্টদের জেলে পাঠিয়ে ও তাদের উপর গুলী চালিয়ে এ মতবাদ নাশ করা যাবে না। দেশের প্রত্যেকটি রাজনীতিক দল এ বিষয়ে একমত যে রাষ্ট্রশক্তির শেষ শরণ হচ্ছে দণ্ডবল। তাই অরাজকতা বন্ধ করার জন্য ঘটনাচক্রে হয়ত শেষ পন্থার শরণ নেওয়া অনিবার্য হতে পারে। কিন্তু সরকার যদি ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতেও চলে, তবু এ উপায় কখনও দীর্ঘকাল কার্যকরী হবে না। গান্ধীজীর পন্থা যদি নির্ভেজালরূপে এবং পুরোপুরি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ না করা যায়, তবে ভারতবর্ষে সাম্যবাদ আসবেই আসবে। কারণ, গণতন্ত্র ও সুপরিকল্পিত প্রগতির নামে দেশে আজ যে হাহাকার ও অরাজকতা চলছে, নেতৃত্বহীন অর্ধ-জাগ্রৎ ও মরিয়া জনগণের কাছে তার বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য অন্য কোন পথ খোলা নেই।

গান্ধীজীর পথ ও মার্কসবাদের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। কিন্তু তার চেয়েও

বেশী পার্থক্য রয়েছে গান্ধীবাদ এবং নিরঙ্কুশ পুঁজিবাদ, সামন্ততন্ত্র ও সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীবাদের ভিতর। আজকে যাঁরা ধন বা উচ্চজাতি ইত্যাদির কারণে বিশেষ অধিকারের সুখ ভোগ করছেন, তাঁরা যদি সেসব ত্যাগ করে সম্পত্তির সত্যকার ন্যাসী না হন, এবং তাঁরা যদি উচ্চনীচ ভেদভাব ভুলে গিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম না হন ও দেশের অপরিসীম দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করে তাঁরা যদি নিজেদের বিলাস ও আড়ম্বর হ্রাস না করেন, তাহলে গান্ধীজীর মত মহান অহিংস পন্থার অনুগামী নেতার অভাবে নিঃসন্দেহেই দেশে সাম্যবাদ ও তার সহযাত্রী হিংসার প্লাবন আসবে। সে অবস্থা যদি আসে, তাহলে আজ যাঁরা বলে থাকেন যে, গান্ধীবাদ কায়েম হবার আগে সাম্যবাদ আসবে, তাঁরা বহুলাংশে সত্যের কাছাকাছি ছিলেন মানতে হবে।

আসন্ন হিংস সংঘর্ষ থেকে ত্রাণ পাবার একটিমাত্র উপায় বিদ্যমান—আমরা যেন আজ এই মুহূর্ত থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাদের জীবনযাত্রায় ক্রমিক পরিবর্তন আনি। আমাদের জীবন থেকে উচ্চনীচ ভেদভাব, জাতিবিচার ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ দূর করতে হবে। বেকারত্ব ও বুভুক্ষাকে সমাজ থেকে চিরবিসর্জন দিতে হবে। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার চিরসমাধি রচনা করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বার্থপরতা, আক্রমণাত্মক মনোভাব ও সাম্রাজ্যবিস্তার-লালসার স্থান বিন্দুমাত্র থাকা উচিত নয়। জীবনযাত্রার উচ্চতম ও নিম্নতম মানে পার্থক্যের সাগরপ্রমাণ গহ্বর যথাসম্ভব হ্রাস করা দরকার। সরকারের ন্যায়ালয় ও শাসনযন্ত্রে দ্রুতগতিতে প্রভূত পরিমাণে নৈতিক সংস্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। গণতন্ত্রের বর্তমান লোকদেখান রূপের বদলে সত্যকার জনতন্ত্র স্থাপন করতে হবে ও সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণের ভিতর আজ যে দায়িত্বহীনতার মনোভাব বিদ্যমান, তার পরিবর্তে তাদের ভিতর শুদ্ধ কর্তব্যনিষ্ঠার ভাব জাগ্রত করতে হবে। এইসব পরিবর্তন হলেই যে আমরা গান্ধীজী-কথিত আদর্শে পৌঁছে যাব এমন কথা নয়; কিন্তু এগুলি যে লক্ষ্যাভিমুখী ঈপ্সিত ধাপ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা যদি অন্ততঃ ধাপে ধাপে গান্ধীজীর আদর্শাভিমুখে অগ্রসর না হই, তবে সাম্যবাদের প্রবল বন্যাবেগ রুদ্ধ হবার নয়। আর আজকের অবস্থা এমন একটা কিছু নয় যে একে কায়েম রাখার জন্য কোন ভক্ত ভগবানের কাছে তদ্গত চিত্তে প্রার্থনা জানাবে। সুতরাং সে মহাপ্লাবন ভীমবেগে এ দেশের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তার পথের বাধা সব

আবর্জনা-স্তূপের সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রেয় ও নির্দোষ জিনিসকেও ধরাতল থেকে অবলুপ্ত করে দেবে।

এখনও সময় আছে। পুঁজির মালিক ও সামাজিক মর্যাদার অধিপতিরা এখনও ধাপে ধাপে নিজেদের জীবন থেকে ভোগবিলাস ও আরাম ইত্যাদি দূর করে নিজেদের সুখের ভাগ শ্রমজীবীদের দিয়ে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। ভগবান আমাদের সকলকে যেন সুমতি দেন!

পরিশিষ্ট—১

গান্ধীবাদ : সমাজতন্ত্রবাদ

এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করার জন্য আমার অনেক বন্ধু একাধিক বার আমাকে অনুরোধ করেছেন। তবে আমি নিজেও এ আলোচনার সূত্রপাত করার প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ বোধ করি নি। শুধু তাই নয়, অনেকবার এরকম আলোচনাকে স্বয়ং আমি নিরুৎসাহিত করেছি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, জাতি হিসেবে আমরা ন্যায়শাস্ত্রের কূটতর্ক চালাতে এত বেশী পছন্দ করি যে, এ প্রায় আমাদের এক ফ্যাশান বা রোগের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তর্কাতর্কির নেশার ঘোরে আমাদের মনেই থাকে না যে, এসব তর্কের বাস্তব পরিণাম শেষ পর্যন্ত কি? তাছাড়া এসব তর্কের প্রকৃতিই এমন যে সৃষ্টি লয় পাওয়া পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে গেলেও কখনও এর শেষ হবে না।

এ ছাড়া, কোন কোন অংশে এবংবিধ আলোচনার মূল ভিত্তিই এখনও পর্যন্ত স্থির হয় নি। এইজন্য এ জাতীয় আলোচনা অনুমানভিত্তিক এবং অপ্রামাণিক হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। উদাহরণস্বরূপ 'গান্ধীবাদের' কথাই ধরা যাক্ না কেন! স্বয়ং গান্ধীজী এ সম্বন্ধে বলেছেন: 'গান্ধীবাদ বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই এবং আমি কোন সম্প্রদায় বা পন্থ সৃষ্টি করে যেতে চাই না। আমি এমন দাবি করি না যে আমি কোন নূতন তত্ত্ব বা আদর্শের আবিষ্কার করেছি। আমি তো শুধু নিজস্ব পদ্ধতিতে শাশ্বত সত্যকে দৈনন্দিন জীবন ও সমস্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছি। ......আমি যেসব অভিমত প্রকট করেছি বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তাকে কিন্তু কোন বিষয়ের শেষ কথা বলা চলে না। দরকার পড়লে কালই আমি মত পরিবর্তন করিতে পারি। বিশ্বকে আমি নূতন কিছু দেখাতে চাই না। সত্য ও অহিংসা চলে আসছে অনাদি কাল থেকে। আমি তো শুধু যথাসাধ্য এই দুই নীতিকে নিজ জীবনে প্রয়োগ করেছি। চলার পথে কতবার আমি কত ভুলভ্রান্তি করেছি, আবার এইসব ভুলের বিনিময়ে বহু অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছি। জীবন ও তৎসম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী আমাকে সত্য ও অহিংসা আচরণের প্রয়োগ করার অবকাশ দিয়েছে। আমি স্বভাবতঃ সত্যবাদী

ছিলাম; অহিংস ছিলাম না।……সত্যের উপাসনা করতে করতেই আমি অহিংসার সন্ধান পেয়েছি।……

"তত্ত্বজ্ঞানের মত একটা গাল ভরা নামে যদি আমার আদর্শকে অভিহিত করা যায়, তাহলে বলব যে তার পরিব্যাপ্তি আমি উপরে যা বলেছি, তার মধ্যেই সীমিত। আপনারা একে 'গান্ধীবাদ' আখ্যা দেবেন না; কারণ এতে 'বাদ' জাতীয় কিছুই নেই।"

(হরিজন ২৮শে মার্চ ১৯৩৬ পৃ: ৪৯)

যাঁর নামে এই মতবাদ চলছে স্বয়ং তিনি যদি এইভাবে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করেন, তাহলে তাঁর নীচে বা তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় থেকে যাঁরা সেবা করার চেষ্টা করছেন, তাঁরা যদি অপর এক মতবাদের প্রচারকদের সঙ্গে বাদ-বিবাদে প্রবৃত্ত হন, তাহলে তা কতটা অযৌক্তিক!

আবার সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে বিচার করতে গেলেও দেখা যাবে যে, তার সিদ্ধান্তসমূহও কোন নিশ্চিত সর্বজনগ্রাহ্যরূপ পরিগ্রহ করে নি। কেউ কেউ দাবি করে থাকেন যে, এর পিছনে একটা তত্ত্ব-দর্শন আছে। এই দাবির জোরে সমাজতন্ত্রবাদের ধ্বজাধারকেরা ধার্মিক, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ইত্যাদি মানব-জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত সকল বিষয় সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ দাবি সত্য হলেও বলতে হবে যে, এ তত্ত্বের শৈশব এখনও অতিবাহিত হয় নি। জওহরলালজীর ভাষায় "এর পিছনে জীবন ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যাবলীর প্রতি বিশেষ এক মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করার প্রচেষ্টা আছে। সুতরাং একে স্রেফ ন্যায়শাস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কিন্তু আনুবংশিকতা, শিক্ষা, অতীত এবং বর্তমান পরিবেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভাবের আধারে রচিত অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও এর পরিচয় পাওয়া যায়।" (আত্মকথা)

ইতঃপূর্বে কথিত হয়েছে যে, সমাজতন্ত্রবাদের বাল্যকাল এখনও কাটে নি। এর ফলে স্বভাবতই প্রত্যেক বিষয়ে বিভিন্ন সমাজতন্ত্রবাদীর মধ্যে তীব্র মতদ্বৈধ বিদ্যমান। ইউরোপে তো সমাজতন্ত্রবাদের বহু পন্থ সৃষ্টি হয়েছে। আর ভারতবর্ষেও সমাজতন্ত্রবাদীরা দু-তিন দলে বিভক্ত। এ ছাড়া একই দলের সমাজতন্ত্রবাদীদের ভিতর ছোটখাট বিষয়ে মতভেদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে এমনও হতে পারে যে, কেউ সমাজতন্ত্রবাদের কোন বিশেষ দিক সমর্থন বা খণ্ডন করতে গিয়ে দেখবে যে, তার বিরোধী বলছে

যে, ঐ বিশেষ দিকটি তার মতে মহত্ত্বপূর্ণ বা মৌলিক তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, অথবা এ বিষয়ে তাঁর কোন মতভেদ নেই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মত বিখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদীর কথাই ধরুন না কেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর "বোম্বে ক্রণিক্যালে" প্রকাশিত শ্রীমতী প্রেমাবেন কণ্টককে লিখিত একটি পত্রে তিনি নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

"…বিবাহ বা নরনারীর সম্পর্কের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হওয়া অথবা এমন কি সমাজতন্ত্রবাদের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? ব্যাপক অর্থে সমাজতন্ত্রবাদ অবশ্য জীবন-সম্বন্ধীয় এক তত্ত্বদর্শন। সুতরাং জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের সমাবেশ এতে হতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ সমাজতন্ত্রবাদ বলতে বোঝায় বিশেষ এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আদর্শ। সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলার সময় আমি শুধু এই আর্থিক আদর্শের কথাই ভাবি। তাই সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ধর্ম, বিবাহ এবং নৈতিকতা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলীর আলোচনা একেবারে অযৌক্তিক।"

অন্য সমাজতন্ত্রীরা হয়তো কিছুতেই একথা মানবেন না। কথা হচ্ছে এই যে, এই অবস্থায় আধাবোঝা 'গান্ধীবাদ' বা আধাবোঝা সমাজতন্ত্রবাদের এই যে সব তর্ক-বিতর্ক চলে, তাতে মতবাদ স্পষ্ট হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। এতে শুধু দলাদলি হবে এবং কোন একটা মতবাদ যে স্বচ্ছ হবে, এমন কোন কথা নেই। হয়তো দু-একটি শব্দ বা সূত্রের প্রতি রুচি বা অরুচি দেখা যাবে এবং তার ভিত্তিতে লোকে স্থানীয় ক্ষেত্রে ভিতরে ভিতরে বিবাদ করতে বাধ্য হবে। এর সঙ্গে আবার দু দলের কোন একটির সমর্থকদের উপর যদি অবিলম্বে নিশ্চিত কোন কিছু করে দেখাবার বাধ্য-বাধকতা না থাকে, তাহলে এ বিবাদের ফলে বিবদমান গোষ্ঠী বা জনসাধারণ কারও কোন উপকার হয় না। বরং যারা উভয়পক্ষকেই দমন করতে চায়, এর ফলে তাদের সুযোগ জুটে যায়। বহুপূর্ব হতেই তারা এ বিবাদের পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক হয় ও নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করে নেয়। জনসাধারণ নয়, নিজের সুবিধার দিকে দৃষ্টি থাকার কারণ এবং তাদের সংখ্যাল্পতা ও অমিত সামর্থ্যের জন্য তাদের পক্ষে নিজ দলকে এই অবসরে সুসংগঠিত করে নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এবং রাজসত্তাও তাদের সহায়তা দেয়। ফলস্বরূপ বিবদমান পক্ষকর্তৃক প্রথমে একটি এবং তৎপশ্চাৎ অপরটির দমনকার্য আরম্ভ হয়। পুনঃপুনঃ আবেশপূর্ণ মানসিক অবস্থায় বাদানুবাদে অংশগ্রহণকারীদের মনে

অজ্ঞাতসারে পরস্পরের প্রতি বিরোধী এবং উচ্চ-নীচ ভাবের উদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এইজন্য একের দমনক্রিয়া শুরু হলে অপরপক্ষ জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতে দমনের সহায়ক হয়ে পড়ে। এতটা যদি নাও হয় তবু অন্ততঃ সে সময় একপক্ষ যে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। উভয় প্রক্রিয়াতেই দেশের স্বার্থে আঘাত লাগে।

তবে এর অর্থ এ নয় যে, দেশের বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারা যথাসম্ভব স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছিত নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বহুবিধ সমস্যা-পীড়িত আমাদের দেশে কতকগুলি সমস্যা এমন যে, এদের সম্বন্ধে এখনই অনিবার্যরূপে স্বচ্ছ ধারণা ও দৃঢ় নিষ্ঠা থাকা অত্যাবশ্যক। আবার কতকগুলি সমস্যা এইরূপ যে শত ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান অবস্থায় বুদ্ধিমানরূপে পরিগণিত ব্যক্তিরাও বহু আয়াসসত্ত্বেও এ সম্বন্ধে কোন সম্যক ও স্পষ্ট ধারণা মনে আনতে পারে না। এমতাবস্থায় এর প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠা তো অনেক দূরের কথা। এর কারণ হচ্ছে এই যে, বাস্তব জীবনের সমস্যাবলী নিয়ে সাধারণ লোককে জটিলতাবিহীন পর্যালোচনা করতে হলে কোন কোন বিষয় তাদের স্থূলদৃষ্টির সামনে প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন। এইসব বিষয় স্থূলভাবে দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত তাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না; আর যুক্তিতর্ক দিয়ে কিছু বোঝালেও এর ফলে হৃদয়ে কোন শক্তি উৎপন্ন করার মত দৃঢ় নিষ্ঠা তাদের থাকে না। এই কারণে এই জাতীয় প্রশ্ন শুধু আলোচনার দ্বারা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সম্যক উপলব্ধির জন্য এইসব বিষয়কে অধিক মাত্রায় স্থূলমুখ করা প্রয়োজন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাবলীকে যদি তাৎকালিক ও অনিবার্য এবং দূরগত, এইভাবে দুভাগে বিভক্ত করা যায়, তবে আমার মতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রাথমিক ও তাৎকালিক গুরুত্বের শ্রেণীভুক্ত হবে এবং সেইজন্য এইসব ক্ষেত্রে আমাদের মনে যেন কোনরকম অস্পষ্টতা সন্দিগ্ধতা বা অপূর্ণতা না থাকে। কারণ এ না হলে আমাদের অভিমতের সমস্ত স্পষ্টতা ও তর্কশুদ্ধতা পুরোভাগে সংখ্যাবিহীন শূন্যের মত হয়ে যাবে। এগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ:

(১) দেশসেবার জন্য দেহ, মন ও সম্পদ অঞ্জলি দিয়ে নিজ জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত সহস্র সহস্র নরনারী এগিয়ে না এলে কোন কিছুই হবার নয়।

(২) এদের ভিতরও যদি আবার চারিত্র শক্তি ও আদর্শনিষ্ঠার অভাব থাকে, তবে কোন বল বা ফল সৃষ্ট হবে না।

(৩) সাধারণ আত্মসুখপরায়ণ তরুণসম্প্রদায়ের মধ্যে বিগুমান ভোগ ও ইহজাগতিক আনন্দ-সম্ভোগের বৃত্তির প্রতি যার বিতৃষ্ণা জন্মায় নি এবং এইসব বৃত্তিকে জয় করার জন্য যেসব নরনারী আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের সতত প্রচেষ্টা করে না, তাদের ভিতর কিছুতেই চরিত্রের দৃঢ়তা ও আদর্শ-নিষ্ঠা আসতে পারে না। আজকে যদি এরকম হয়েছে বলে মনেও হয়, তবুও লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সময় পর্যন্ত তা বজায় থাকার নয়।

(৪) আমাদের সুস্পষ্টভাবে একথা বুঝে নিতে হবে যে স্বরাজ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত দেশসেবার বিবিধ ক্ষেত্রে আজীবন কর্মী-সংখ্যা প্রতি বৎসর ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়া উচিত এবং এইসব কর্মীর অধিকাংশকে আসতে হবে সম্পন্ন বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর থেকে। সাংসারিক দৃষ্টি থেকে এদের আরও সরল, অনাড়ম্বর ও কঠোরতাপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে এবং শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের আরও শ্রমময় জীবনে অভ্যস্ত হতে হবে। সুতরাং এদেশের যুবক-যুবতীর জীবন ও চরিত্র যদি এইভাবে গঠিত না হয়, এবং তারা যদি এই ধরনের জীবনযাত্রা গ্রহণে প্রস্তুত না থাকে, তাহলে আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ কোনদিনই পূর্ণ হবে না। সরল ও শ্রমযুক্ত জীবন স্বয়ং অধিকতর কাম্য—এই কথায় হয়তো কোন মহলে আপত্তি উঠতে পারে। কিন্তু এ কথায় তো কারও দ্বিমত নেই যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য এসব শর্ত প্রাথমিক ও অপরিহার্য।

এসব কথা হয়ত খুব অরুচিকর ও কঠিন মনে হবে। তবে আমার মতে যাদের ভিতর দেশমাতৃকাকে বন্ধনমুক্ত করার সত্যকার আকাঙ্ক্ষা আছে, তারা গান্ধীজীর পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হক বা সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের প্রতি তাদের আকর্ষণ থাকুক, অথবা তারা কোন তৃতীয় পন্থার অনুরাগী হক তাদের ভিতর অন্যসব বিষয় অপেক্ষা এই কথার যথার্থতা উপলব্ধি করা, এর কদর করা ও নিজ জীবনে একে গ্রহণ করার জন্য কটিবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। (স্বাধীনতোত্তর ভারতে নব-নির্মাণক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য।—অনুবাদক) অধ্যাত্মবাদ বা জড়বাদ—যে কোন নামে স্বীয় জীবনদর্শন অভিহিত হক না কেন, তা যদি সংযম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও স্বেচ্ছাবৃত সরলতার (অর্থাৎ যাকে অস্তেয়, অপরিগ্রহ, লোভশূন্যতা বা দারিদ্র্যের ব্রত

বলা চলে) প্রতি তাচ্ছিল্য ও বিরাগ প্রদর্শন করে এবং তরুণসম্প্রদায়ের ভিতর তা যদি ইন্দ্রিয়াভিমুখ ভোগলোলুপ জীবনযাত্রার প্রতি বাসনার বৃদ্ধি ঘটায়, তাহলে তার একটিমাত্র পরিণাম হতে পারে এবং সে পরিণাম হচ্ছে এই যে, স্বাধীনতা-দিবস দূর থেকে দূরে সরে যাবে। এই সিদ্ধান্ত এক অবিসংবাদী সত্য। দেরীতে বুঝুন বা সময় থাকতে উপলব্ধি করুন, এ আপনাদের বুঝতে হবেই। সময়ে বুঝলে আমাদের মঙ্গল, আর দেরীতে বুঝলে বিপদ। কারণ হয়তো এত দেরীতে বুঝলাম যে তারপর বুঝেসুঝেও হাত-পা বাঁধা। ততক্ষণে বাজী ফস্কে গেছে। আর এ কথা তো সর্বজনমান্য যে সংযমী, জিতেন্দ্রিয় ও সরল জীবনযাত্রা নির্বাহকারী জনতার শক্তির ভিত্তিতেই দেশ স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ হবে।

হরিজন-সেবক ১৬-১-১৯৩৭

॥ ২ ॥

যাঁদের বুদ্ধি ও হৃদয় গান্ধীজীর আদর্শ ও গান্ধীপন্থার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট, তাদের এবার দু' চারটি কথা বলব। গান্ধীজীর আদর্শে (বরং পন্থা বলাই ভাল) এমন কয়েকটি বিষয় আছে যাকে অপপরিবর্তনীয় বলা যেতে পারে। সুতরাং তাঁর জীবন ও উপদেশাবলী থেকে যাঁরা প্রেরণা পেতে চান বা যাঁরা তার শক্তিতে পথ চলতে চান, তাঁদের পক্ষে সেগুলি অবশ্য আচরণীয়।

এই জাতীয় প্রথম অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব হচ্ছে এই যে, জীবনের যাবতীয় সমস্যার বিচার ও সমাধান সত্য, অহিংসা এবং সেবাভাব দ্বারা করার প্রযত্ন চাই। সত্য অহিংসা ও সেবা—এই ত্রিবিধ সীমা বা অঙ্গের কথা এখানে বলা হয়েছে। এবার পৃথক পৃথকভাবে এই তিনটি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

'সত্যের' ভিতর নিম্নলিখিত বিষয়ের সমাবেশ হতে পারে। পূর্বতন সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সদা-সর্বদা সত্যকে স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকা, আর এইজন্য অসত্যের পথ যতই প্রাচীন ও বহুমান্য হক ও সে পথে আমরা যতই এগিয়ে গিয়ে থাকি, সে পথ ছেড়ে ফিরে আসতে ভয় বা লজ্জা না পাওয়া এবং এর সঙ্গে যখন যে বিষয় সত্য বলে বিশ্বাস হবে, তার জন্য সর্বস্ব সমর্পণে প্রস্তুত থাকা।

গান্ধীজীর ভাষায় বলতে গেলে 'অহিংসার' অর্থ হচ্ছে পশুবল দ্বারা নয় 'আত্মবলের' সাহায্যে যাবতীয় অধর্মের বিরোধাচরণ করা। একাধিকবার গান্ধীজী একথা বলেছেন যে, অহিংসা কোন নিষ্ক্রিয় নেতিবাচক মনোবৃত্তি নয়; পক্ষান্তরে এ হচ্ছে স্রোতের বিরুদ্ধে উজিয়ে যাবার এক সক্রিয় ও আদর্শবাদমণ্ডিত বৃত্তি। বহু প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীতে হিংসার প্রয়োগ চলে আসছে। বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে হিংসা-পদ্ধতির চূড়ান্ত বিকাশ করার ও হিংসার এক শাস্ত্র রচনা করার প্রযত্ন বহু শতাব্দী থেকে চলে আসছে। যার হিংসাবল বিপক্ষের হিংসার চেয়ে অধিক সংগঠিত, উন্নত ও সাধনসম্পন্ন, তার পক্ষে হিংসা দ্বারা নিজ ভৌতিক আদর্শ সিদ্ধ করার পথ খোলা পড়ে রয়েছে। এমন কোন কথা নেই যে, শুধু অধর্ম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই এই বল প্রযুক্ত হবে। এতে তো অধর্মের পক্ষে হলেও যে অধিকতর শক্তিশালী, তারই গলায় জয়মাল্য পড়বে। এর এক জলন্ত উদাহরণ হচ্ছে ইটালী ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধ। বিপক্ষ যদি অধিকতর শক্তিশালী হয়, তবে নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতিতে হানি ছাড়া আর কোন ফল হবে না। স্তুতরাং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণের কথা মুলতুবী রেখে যদি শুধু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও বিচার করি, তাহলে প্রতীয়মান হবে যে, আমাদের বিপক্ষ দল যে অস্ত্রে আমাদের চেয়ে বহুগুণে বলবান ও কুশলী, সেইসব অস্ত্র ব্যবহার করার মোহচক্রে না পড়ে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে একেবারে নূতন ধরনের সাধন আবিষ্কার করে তার বিকাশ ও উন্নতিসাধন করতঃ তাকে সর্বাঙ্গীণ কার্যকুশল করে সে অস্ত্র প্রয়োগে ক্ষমতা অর্জন করা।

অহিংসা অথবা প্রেমের শক্তি অর্থাৎ বিপক্ষকে দণ্ড দিয়ে নয়, স্বয়ং কষ্টবরণ করে তাকে জয় করার রীতি হিংসার মতই অতীব প্রাচীন। কিন্তু বারংবার অনুশীলনের দ্বারা এর সম্যক বিকাশ এখনও হয় নি। বৈজ্ঞানিকেরা বলে থাকেন যে, মাধ্যাকর্ষণের কথা নিউটন প্রথম জগৎকে জানান। তবে তার মানে এ নয় যে নিউটনই প্রথম মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ও তার প্রয়োগের বিধান রচনা করেছিলেন। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তো নিউটনের আগেও দুনিয়ায় ছিল এবং লোকে এর অস্তিত্বের কথা না জেনে বা এর কোন নামকরণ না করেই এর প্রয়োগ দ্বারা উপকৃত হত। তবে এর বিধিবদ্ধ জ্ঞান কারও ছিল না এবং এর গাণিতিক নিয়মও রচিত হয় নি। নিউটন এই নিয়মের আবিষ্কার করে বিশ্বজনকে বোঝালেন।

এর পরিণামস্বরূপ বহুবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হল ও অনেক সংশোধিত কার্যপদ্ধতি সৃষ্ট হল। অহিংসাকে যদি গান্ধীজীর 'আবিষ্কার' আখ্যা দেওয়া যায়, তবে তা এই ধরনের হবে। ইতঃপূর্বে বিশ্বে অজ্ঞাত অহিংসা ও প্রেম নামক শক্তির তিনি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছেন বলে বলা যায় না। এ শক্তি তো সৃষ্টির উষাকাল থেকে পৃথিবীতে রয়েছে এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে মানুষ এর উপযোগ করে আসছে। এ ছাড়া এর নাম বা স্বরূপও অজ্ঞাত ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে সজ্ঞানে এর শরণ নেওয়া হয়েছে এবং বহু মহাপুরুষ এর মহিমা কীর্তন করেছেন। কিন্তু হিংসার সমানই এর নানারূপ উপযোগিতা ও বিকাশ হতে পারে এবং এ এক মহাপরাক্রমশালী শক্তি ও এবং এর গর্ভে বহু গুণ প্রসুপ্ত ও অনাবিষ্কৃত আছে—এই বিশ্বাসের সঙ্গে গান্ধীজী নিজ-জীবন সংশোধন ও বিকাশের জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং আজও এই মনোভাব চালিত হয়ে তিনি এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

হিংসার ক্ষেত্রে আমরা যে সাঁজোয়া গাড়ী, মেশিনগান, বোমারু বিমান, বিষবাষ্প, নানাপ্রকারের বোমা ইত্যাদি মারণাস্ত্র দেখি এবং এদের সহায়করূপে গুপ্তচর-বিদ্যা, উৎকোচন-প্রথা, মিথ্যা প্রমাণ, অলীক প্রচার ইত্যাদি অসত্যাত্মক উপকরণের যে প্রাবল্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা দু-একদিনের প্রচেষ্টার ফল নয়। বহু যুগের পরিশ্রম, বহুজনের বুদ্ধি, শক্তি ও বহু অর্থব্যয়ের পর এসবের আবিষ্কার হয়েছে। তাই অহিংস শক্তির বিকাশ করতে হলে অনেক নিষ্ঠাবান ও কঠোর ধৃতিগুণবিশিষ্ট সেবকের সেবা চাই। সুতরাং গান্ধীজীর পন্থায় শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের সামনে তো জীবনাদর্শের এক স্পষ্ট আলেখ্য রয়েছে। তাঁদের কাজ হচ্ছে জীবনের চলার পথে প্রতিপদে বুদ্ধিপূর্বক অহিংসার প্রয়োগ করে এর ভিতর সুপ্ত শক্তির আবিষ্কার করা এবং তার বিকাশের জন্য নিজের সেবা সমর্পণ করা। বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারের জন্য চাই পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের জ্ঞান। আর অহিংসার বিকাশের জন্য প্রয়োজন প্রেম-ভাবের এমন এক অফুরন্ত ভাণ্ডার, যা বেগবান ও ক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও সর্ববিধ মোহ ও স্বার্থমুক্ত। এ পথে কুশাগ্র বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নেই বলা ভুল। কিন্তু অহিংস শক্তির পথিকৃৎ-এর প্রেমভাণ্ডার শূন্য হলে শুধু বুদ্ধি তাঁর কাজের সহায়ক বলে বিবেচিত হবে না।

(হরিজন-সেবক ২২. ৫. ১৯৩৭)

॥ ৩ ॥

গান্ধীজীর পদ্ধতির তৃতীয় অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব হচ্ছে 'সেবা'। আসলে এ কোন পৃথক অঙ্গ নয়। সত্য ও অহিংসার একত্র সমাবেশে এর জন্ম। বাস্তবক্ষেত্রে এর সহজ অর্থ হচ্ছে এই যে, সোজাসুজি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সেবামূলক কোন কার্য না করলে শুধু সত্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ভক্তিমণ্ডিত পুস্তক, প্রবচন বা বক্তৃতা দ্বারা গান্ধীজীর আদর্শ ও উপদেশাবলী প্রচার করা যায় না বা সত্য অহিংসা ইত্যাদি শক্তির বিকাশ করা যায় না। রচনা, বক্তৃতা ইত্যাদির প্রচারকার্যের উপকরণ হচ্ছে যন্ত্রের মত। যন্ত্রেরই মত এগুলি স্বয়ং নির্দোষ; বা যদি অধিকতর সুষ্ঠু বিশেষণ প্রয়োগ করতে হয়, তবে বলতে হবে যে এরা নির্গুণ অর্থাৎ গুণ-দোষহীন। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে অহিংসার উপাসকদের চেয়ে হিংসার ধ্বজাধারীদের প্রভাব এদের উপর বেশী। ফলে হিংসার উপাসকেরা অপেক্ষাকৃত সহজে এইসব উপকরণকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োগ করে থাকে। সুতরাং আমাদের এমন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, যা একেবারে অপূর্ব বা স্বতন্ত্র ধরনের। স্বেচ্ছায় অজ্ঞাতবাসকারী সেবকের নীরব সেবাই হচ্ছে এই উপকরণ।

সমাজের যে কোন বিকট সমস্যার নিরাকরণের জন্য উপরি-উক্ত নীতির কথা স্মরণ-পথে জাগরূক রেখেই কার্যক্রম নির্ধারণ করা সম্ভব। আর একে যদি আপনারা গান্ধীজীর শিক্ষা আখ্যা দিতে চান, তবে তা দিতে পারেন। বস্তুতঃ এতো কোন প্রকার সীমানির্ধারণ হয়, এ হচ্ছে মনুষ্যজাতির হিত-সংবর্ধনের অনিবার্য শর্ত। এই শর্তের কথা স্মরণ রেখে গান্ধীজীর আদর্শের অপরিবর্তনীয় তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাবে যে, জনসাধারণকে—শুধু জনসাধারণ কেন, প্রতিটি দুর্বল ব্যক্তিকে সবলেরা যেভাবে শোষণ ও বঞ্চনা করে, তার প্রতি গান্ধীজীর বিরোধ যে কোন সমাজতন্ত্রবাদীর মতই তীব্র। শুধু তাই নয়, তিনি শুধু ধনিক ও সত্তাধারী শ্রেণীর শোষণ ও প্রবঞ্চনা বন্ধ করার প্রযত্ন করেই ক্ষান্ত হতে চান না। বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধিহীনদের কাছে থেকে যে অনুচিত লাভ পায়, তিনি তারও প্রতিকার করতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ শোষণ ও প্রবঞ্চনার প্রতিরোধ করার যে কোন সত্যাগ্রহী পদ্ধতির হদিস পেলে তিনি যে কোন প্রকারের দুর্বলের উপর যে কোন প্রকারের সবলের শোষণ একদিনের জন্যও বরদাস্ত করবেন না।

শোষণ ও প্রবঞ্চনা বন্ধ করার প্রশ্নের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং প্রায়শঃ মনে করা হয় যে, এ দুই একই বস্তু। গান্ধীবাদ বনাম সমাজতন্ত্রবাদের আলোচনায় বেশীর ভাগ উত্তাপের সঞ্চার হয় এই ব্যাপারটি নিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, এই বিষয়ে গান্ধীজীর অভিমত যে কোন নৈষ্ঠিক সাম্যবাদীর চেয়েও উগ্র। তাঁর আদর্শ হচ্ছে কোন মানুষের কাছে কোন প্রকারের পরিগ্রহ বা সঞ্চয় হওয়া উচিত নয়। তিনি যে সম্পত্তির ব্যক্তিগত পরিগ্রহ বরদাস্ত করেন, তার কারণ এ নয় যে তাঁর মনে সম্পত্তি বা পরিগ্রহের প্রতি মোহ আছে অথবা মনুষ্যজাতির উৎকর্ষের জন্য তিনি সম্পত্তি-সঞ্চয়কে অপরিহার্য মনে করেন। এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিগত পরিগ্রহ বাড়ান ও সঞ্চয় করার প্রথার অবসানের জন্য এ যাবৎ তিনি কোন সত্যাগ্রহী পন্থার খোঁজ পান নি। আমার মনে হয়, সকল মতের সমাজতন্ত্রবাদীরাই মনুষ্যজাতির সুখের জন্য ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করা ও তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে স্বীকার করেন। গান্ধীজী একে একটা আদর্শ বলে গণ্য করেন না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আজকের খাবার জোগাড় করা ও কালকের খাবারের জন্য কাল আবার মাথার ঘাম পায়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত হবার আদর্শে কোন সমাজতন্ত্রবাদীর বিশ্বাস না হলে কি হবে, গান্ধীজীর এর প্রতি অটুট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু এ তো হল আদর্শের কথা। বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে সমস্যার পর্যালোচনা করে গান্ধীজী একথা বুঝেছেন যে, এখনই মনুষ্যজাতি পরিগ্রহ বর্জন করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে—এমন কল্পনা করা যায় না। আমরা তাই শুধু এই কথা নিয়েই চিন্তা করতে পারি যে, ধন-সম্পত্তির ভাণ্ডার প্রত্যক্ষতঃ আজ যাদের হাতে আছে, তারা কি মনোভাবে চালিত হয়ে সেসব নিজেদের কাছে রাখবে অথবা কোন্ শর্তে এসব তাদের কাছে রাখতে দেওয়া যেতে পারে। তাই গান্ধীজীর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কোন সম্পত্তি ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিমণ্ডলী, যার হাতেই থাক এবং প্রচলিত আইন অনুসারে বা বেআইনী ভাবে, যে কোন প্রকারে তারা সে সম্পত্তির মালিক হক না কেন, নিজের উপভোগের জন্য নয়, বরং সমাজের তরফ থেকে সমাজের কল্যাণার্থেই তারা কেবল সে সম্পত্তি নিজের কাছে রাখতে পারবে। অর্থাৎ তারা নিজেদের ঐ সম্পত্তির ট্রাস্টি, ন্যাসী বা সংরক্ষক মনে করবে।

এই 'ট্রাস্টি' শব্দটির জন্য কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ

হচ্ছে এই যে, লোকে এখনও একথা বুঝতে অভ্যস্ত হয় নি যে, গান্ধীজী যখন যে কথা বলেন, তখন তার অন্তর্নিহিত অর্থের উপর পুরোপুরি জোর দিয়েই সে কথা বলে থাকেন। আমাদের ভুল হচ্ছে এই যে, গান্ধীজীর উক্তিকেও আমরা রাজনীতিক বক্তাদের বক্তৃতার সমপর্যায়ভুক্ত করি। ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞরা একাধিকবার একথা বলেছেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের অবস্থিতি ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এবং তাদের ন্যাসী রূপে। তবে আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে যে, এই উক্তি অনুযায়ী আচরণের চেষ্টা তাদের বিন্দুমাত্র ছিল না। সুতরাং এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এই ধরনের ভাষা প্রয়োগ করার পিছনে তাদের গোপন উদ্দেশ্য ছিল অহংকারপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর শব্দ দ্বারা আমাদের প্রতারণা করা। গান্ধীজীর প্রতিও এই সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, ধনিকদের পক্ষাবলম্বনের জন্য তিনি এই জাতীয় দম্ভপূর্ণ বিভ্রান্তিকর উক্তি করেন। আগে একবার এরকম হয়েছেও।

গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী যখন ঘোষণা করলেন যে, হরিজনদের হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক করার প্রচেষ্টা তিনি প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধ করবেন, তখন বিশেষ কেউ তাঁর কথায় গুরুত্ব আরোপ করে নি। অনেকে তো ভাবল যে, এ হচ্ছে বাক্যবিন্যাস-কলার এক নবতম অলঙ্কারের নিদর্শন। তাঁকে কিন্তু নিজ উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করতে হয়েছিল। এইভাবে তিনি যখন বলেন যে, যার কাছে যা সম্পত্তি আছে তার মালিক সে নয়, সে শুধু ন্যাসী, তখন তাঁর এ কথাকেও বাণীর অলঙ্কারমাত্র মনে করা হয়। বিরুদ্ধ সমালোচকদের মনে হয়তো এই জাতীয় কোন অস্পষ্ট ধারণা বিদ্যমান যে আইনের সহায়তায় গঠিত ন্যাসী ও ধর্মীয় বিধানে সৃষ্ট ন্যাসীর মধ্যে কর্তব্যের প্রকারভেদ আছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যাসী যদি সম্পত্তির আসল মালিকদের প্রতি যথোচিত দায়িত্ব পালন না করে স্বয়ং তার উপর ন্যস্ত সম্পত্তি উপভোগ করে, তাহলে কি আর এমন ক্ষতি আছে?

গান্ধীজী কিন্তু এবংবিধ কোন পার্থক্য মানেন না। গান্ধীজীর স্বভাবই এমন নয় যে, কোন আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার সুবিধা-সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও তার তাত্ত্বিক মীমাংসায় বসে যাবেন। তিনি মনে করেন যে, স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দিনাতিপাত করতে হলে যতটুকু না হলে নয়, তাছাড়া বাদবাকী যাবতীয় অধিকারের উপভোগ অপরের অনুমতি ব্যতিরেকে করা যায় না।

তবে সে অনুমতি দুর্বলতার কারণে দেওয়া হয়েছে না অজ্ঞতার কারণে পাওয়া গেছে, সে কথা অপ্রাসঙ্গিক। তবে দুর্বলতা দূরে গিয়ে তার স্থানে শক্তির উদয় হলে এবং অজ্ঞানের বদলে জ্ঞানের উন্মেষ হলে সেই অতিরিক্ত সম্পদের উপর ন্যাসীরূপে ছাড়া অন্য প্রকারে আধিপত্য বজায় রাখা অসম্ভব। সুতরাং আমাদের কাজ হচ্ছে জনসাধারণকে বলবান ও জ্ঞানবান করে তোলা এবং এর জন্য কোন্ ধরনের শক্তির সাধনা করা দরকার একথা বিচার করলে আমরা বুঝতে পারব যে, জনসাধারণের ভিতর এইভাবে যে শক্তি সৃষ্টি করতে হবে, তাকে হতে হবে অহিংসাময়। অবশ্য একথা তখনই ওঠে যখন আমরা চাইব যে আজকের বিত্তহীনদের হাতে সম্পদ আসামাত্র তারা যেন বর্তমান ধনিক সম্প্রদায়ের মত পাপাশয় বা অত্যাচারী না হয়ে ওঠে। আর গান্ধীজীর দাবি হচ্ছে এই যে হিংস শক্তি সৃষ্টি করা অপেক্ষা অহিংস শক্তি সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে এক্ষেত্রে এ বিষয়ে আর এর চেয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যায় না। কারণ, গান্ধীজীও এ আদর্শে বিশ্বাসী, তাঁর সহকর্মীর দল এ আদর্শকে প্রত্যক্ষ আচরণে পরিণত করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও করে চলেছেন

(হরিজন-সেবক, ২৯-৫-১৯৩৭)

॥ ৪ ॥

এত সব লেখার পর পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণের পৃষ্ঠভূমিকায় গান্ধীজীর বর্তমান কার্যকলাপের বিশ্লেষণ করা বোধ হয় সমীচীন হবে। কংগ্রেস বা প্রত্যক্ষ রাজনীতির সম্পর্ক পরিহার করেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। মগনবাড়ীতে বসে শুধু গ্রামোদ্যোগের বিভিন্ন দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাদের পুনঃ সংগঠিত করার কাজে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি তৃপ্তি মানলেন না। তাঁর মনে বরং ডাক তার আদি সকল প্রকারের যোগাযোগের সম্পর্করহিত বর্ষায় গভীর কর্দমাক্ত 'সেগাঁও'-এ গিয়ে বসবাস করার ইচ্ছা জাগল। দেশের যেসব বিকট সমস্যা কংগ্রেস, পণ্ডিতসমাজ এবং সরকারের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ, তার অহিংসাত্মক সমাধান-পদ্ধতি আবিষ্কারের এই প্রক্রিয়া গান্ধীজী গ্রহণ করেছেন। কেউ যদি এই অনুযোগ করেন যে, জটিল ও বিরাট সমস্যা-সমূহের সমাধান আবিষ্কার করার প্রচেষ্টায় তিনি জলাঞ্জলি দিয়েছেন, তবে বলতেই হবে যে এ স্বভাব গান্ধীজীর রীতি-বিরুদ্ধ। তবুও লোকে মনে করতে

পারে এবং এ কথা ভেবে আত্মতুষ্টি বোধ করতে পারে যে, গান্ধীজী এবার কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিচ্ছেন। গান্ধীজী যে এইভাবে দেশের জটিল সমস্যা-সমূহের সমাধানের সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন, এই কল্পনাই অনেকের কাছে অত্যন্ত অসঙ্গত ও অলীক মনে হবে। তথাপি গান্ধীজীর কাছে তো এই হচ্ছে একান্ত স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত রীতি। তিনি আশা রাখেন যে গ্রামবাসী—বিশেষতঃ সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে অধিষ্ঠিত বলে অখ্যাত দেশবাসীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনা করে এইসব সমস্যার অহিংস সমাধানের হদিস পাওয়া যাবে।

তিনি নিজের আশেপাশে গ্রামীণ হরিজনদের একত্র করেছেন। তিনি যদি এদের মাটী চষে ধান উৎপন্ন করতে শেখাতে পারেন, যদি এদের ভিতর নিজ প্রয়োজনীয় দুধ ও গুড় যোগাড় করার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারেন এবং যদি এদের লেখাপড়া শিখিয়ে সমসাময়িক ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত করাতে পারেন ও ওদের গ্রামকে নোংরা আবর্জনা ও তার থেকে সৃষ্ট রোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন, তবে কি আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে যে, সেগাঁও-এর বাসিন্দারা মনুষ্যমাত্রের (ফলতঃ নিজেদের) ভিতর সুপ্ত শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে? সুতরাং একথা একেবারে অসম্ভব নয় যে, কোনদিন হয়ত এই গ্রামেরই অধিবাসীরা সরকার ও সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে। কিন্তু এর জন্য তো মনোরথকে বহুদূর পর্যন্ত ছুটাতে হবে। এ কাজ যে কত কঠিন, গান্ধীজী সে সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু ভক্তিবিনম্র চিত্তে তিনি এই কথা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ যা অসম্ভব মনে করে, ঈশ্বর তা সম্ভব করতে পারেন। কারণ তাঁর কাছে তো অসম্ভব বলে কিছুই নেই। যাঁর কৃপায় 'মূকং করোতি বাচালম্ পঙ্গুম্ লঙ্ঘয়তে গিরিম্', সেই সত্য অহিংসা অর্থাৎ প্রেমরূপী পরমেশ্বরের উপর গান্ধীজীর অটল শ্রদ্ধা আছে।

গান্ধীজীর কার্যপদ্ধতির অপর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে আমি এ প্রসঙ্গের অবসান করব। একথা তো কেউ বলবেন না যে, আন্দোলন সংগঠিত করা এবং জনসাধারণকে এক পতাকা-তলে সমবেত করার রীতি সম্বন্ধে গান্ধীজী অনভিজ্ঞ। পরন্তু যখনই তিনি কোন আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন, তখনই সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি নানাবিধ প্রশ্ন সম্বন্ধে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচারের নীতিকে

ধীরভাবে বুঝতে চাই, তাহলে তাঁর আন্দোলন ও গণসমাবেশের কার্যক্রমের যে বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই চলে আসছে, তার কথা আমরা যেন কখনও না ভুলি। এ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ কোন অন্যায়ের প্রতিকারার্থে জনসাধারণকে কোন এক নিশ্চিন্ত পথে পরিচালিত করার জন্য তিনি প্রস্তুত না হন, ততক্ষণ সেই অন্যায় আচরণের জন্য তাঁর মনে হাজার দুঃখ হলেও তিনি জনসাধারণের মনকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন না। প্রত্যক্ষভাবে অন্যায়ের প্রতিকারে অবতীর্ণ না হয়ে শুধু নামমাত্র আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ভরান ও সংগ্রামের নামে তুবড়িবাজি দেখানর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। যখনই গান্ধীজী কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন, এবং সে সম্বন্ধে জনমত জাগ্রত করবার প্রয়াস করেন, ও তার জন্য যখন কোন চিত্তাকর্ষক কর্মসূচীর কথা বলেন, বুঝতে হবে যে এবার নিশ্চয় প্রয়োজন বুঝলে গান্ধীজীর মনে এই লক্ষ্যাভিমুখে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করার কথা উদিত হয়েছে। এই মনোভাব সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এই জাতীয় অন্যায় সম্বন্ধে মৌন থাকা ও অপরকেও নীরব থাকার উপদেশ দেওয়াই তাঁর স্বভাব। এর জন্য তিনি তাঁর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হবার ঝুঁকিও নিয়ে থাকেন।

আমার মতে গান্ধীজীর 'অনুগামীদের' নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যরত থাকার পক্ষে এই পর্যন্তই যথেষ্ট হওয়া উচিত। আজ দেশের সামনে অতীব গুরুগম্ভীর, মহত্বপূর্ণ অত্যন্ত জটিল ও সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধিত সমস্যা উপস্থিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ জাতীয় সমস্যার হাত এড়ান যাবে না। আমাদের মধ্যে অধিক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান কেউ কেউ প্রথমে এর প্রত্যক্ষ অনুশীলন করে এতে বিশেষজ্ঞ হবেন। আর বাদবাকীদের বাধ্য হয়ে এইসব বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরোক্ষ রীতিতে নিজ মত স্থির করতে হবে। আসলে তো বিশেষজ্ঞ নামে খ্যাত অধিকাংশ বিদ্বানদের মতও বেশীর ভাগ পরোক্ষ আধারের উপর গঠিত হয়। বিশ্বে আজ এমন কোন চতুর বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নেই, যিনি জগদ্বাসীর দুশ্চিন্তার কারণ কূট প্রশ্নসমূহের একেবারে সঠিক ও সংশয়-রহিত সমাধান দিতে পারেন বা এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্তভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। বস্তুতঃ বুক ফুলিয়ে আজ যে মত জাহির করা হয়, দুই মাস পর তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। সুতরাং এই জাতীয় প্রশ্নের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় বিচার অসার, অহেতুক কালক্ষেপণকারী ও অকার্যকারী হয় এবং এমন কি এর ফলে

কেউ কেউ আরও সংকটাবর্তে পড়ে যায়। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ জাতীয় আলোচনার বুনিয়াদই হয় অপ্রত্যক্ষ ও অপূর্ণ জ্ঞান। এই প্রকারে তর্কাতর্কি করে বুদ্ধিভ্রষ্ট হবার চেয়ে গান্ধীজীর মত 'আমার পক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপই যথেষ্ট' মনে করা বরং অনেক কাজের। এ ছাড়া মানুষ যখন কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে অতি দ্রুত নিজ মত স্থির করে, তখন বুঝতে হবে যে, তার বুদ্ধির বিকাশও অনেক আগে থেকেই রুদ্ধ হল। আজ আমরা যে প্রশ্নের সমাধান করতে পারব না, সে সম্বন্ধে চটপট্ কোন সিদ্ধান্ত না করাই ভাল।

গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতি ও তাঁর 'গঠনমূলক কার্যক্রমের' প্রতি আজ বহু বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির শ্রদ্ধা নেই। তাঁদের কাছে এসব আকর্ষক বা উৎসাহবর্ধক মনে হয় না। কিন্তু তার আর উপায় কি? তাঁদের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে অনন্তকাল যাবৎ তর্ক করা বা কারও বহুবিধ দোষের প্রতি সদা অঙ্গুলি নির্দেশ করা, দুইই-অহেতুক। তাঁদের প্রতি বিন্দুমাত্র রুষ্ট না হয়ে তাঁদের নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করার স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত। তাঁদের মনে যদি এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, গান্ধীজীর মত ও পথ খণ্ডন না করে তাঁরা থাকতে পারেন না, তবে তাঁদের সে অধিকারও আছে মনে করে তাঁদের উপর কুপিত হওয়া চলবে না। কারণ আমাদের হৃদয়ে তো এই আশা থাকা উচিত যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সত্য ও অহিংসার পরিণাম সপ্রমাণ করে আমরা তাঁদের জয় করব।

সর্বশেষে আমি এইটুকু নিবেদন করতে চাই যে গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যদি 'গান্ধীবাদ' শব্দটিকে জীবিত রাখতে হয়, তবে আমাদের অন্ততঃ এইটুকু বোঝা উচিত যে এই শব্দটি হচ্ছে এক কার্যপদ্ধতির সূচক, কোন ব্যক্তি-বিশেষ দ্বারা প্রতিপাদিত সমাজ-ব্যবস্থার এক বিশেষ কাঠামোসূচক এ নয়।

হরিজন-সেবক, ৫-৬-১৯৩৬

পরিশিষ্ট—২

গান্ধীজীর সাম্যবাদ

গান্ধীজী তাঁর সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী সুহৃদদের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রায়ই এই দাবি করে থাকেন যে, তিনি তাঁদের চেয়েও উঁচুদরের সাম্যবাদী বা সমাজবাদী। লক্ষ্য তো সকলেরই এক। কিন্তু তাঁদের উপায় ও কর্মপদ্ধতিতে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজব্যবস্থাকে হিংসা ও অসত্যের শক্তিতে পরিবর্তন করার জন্য গান্ধীজীর কোন আগ্রহ নেই। কারণ তিনি বেশ জানেন যে, এতে কোটি কোটি মূক ভারতবাসীর কোন প্রকার মঙ্গল হবে না। আগা খাঁ-প্রাসাদে বন্দী থাকাকালীন তিনি সাম্যবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। প্রত্যেক বিষয়ে তিনি শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে চিন্তা করে থাকেন। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে এবং ইতস্ততঃ কিছু সাম্যবাদী সাহিত্য পড়ে সাম্যবাদ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়েছিল, গান্ধীজী তাতে তৃপ্ত হন নি। তাই তিনি মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করলেন এবং এ ছাড়া এঙ্গেলস্, লেনিন ও স্টালিনের রচনাবলীও পাঠ করলেন। এসব পড়ার পর তাঁর মনে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল যে, তাঁর কল্পিত সাম্যবাদই বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের কল্যাণসাধনে সমর্থ। তাঁর আশ্রমে এবং তাঁর প্রেরণায় গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহে একটিমাত্র আদর্শ পালন করা হয়। এ হচ্ছে "প্রত্যেককে তার প্রয়োজনানুসারে দিতে হবে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে তার যোগ্যতানুসারে কাজ নিতে হবে।"

সুতরাং বলতে হবে যে, গান্ধীজীর আদর্শে চালিত আশ্রমসমূহই এখন একমাত্র স্থান, যেখানে ভারতবর্ষের গ্রামগুলির অবস্থা মনশ্চক্ষুর সামনে রেখে সাম্যবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। সেবাগ্রাম আশ্রমে এ কথা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, আশ্রমবাসীরা গ্রামের বাসিন্দাদের অভিরুচির উপরই সেখানে থাকবে। একজন কলহপ্রিয় গ্রামবাসী একবার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও জ্বালানী কাঠের জন্য আশ্রমের কয়েকটা গাছ কেটে ফেলে। আর একজন ক্ষতিপূরণ নেওয়ার পরও তার ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আশ্রমের যে রাস্তা গিয়েছিল, তা বন্ধ করে দেয়। এর জন্য কোন প্রকার আইনের শরণ নেওয়া হয় নি। শুধু এইটুকুই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ওখানে আশ্রম-বাসীদের অবস্থিতি তাদের সেবার জন্য এবং তারা যদি না চায়, তবে তাঁরা

অন্যত্র চলে যাবেন। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা তাদের ঝগড়াটে ভাইটিকে সোজা রাস্তায় নিয়ে এল।

সবরমতী আশ্রমের বোনেরা নিজেদের রান্নাঘরকে সর্বসাধারণের রান্নাঘরে পরিণত করে ও তার সঞ্চালন-ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হন নি, আর সকলের সন্তানদেরও তাঁরা নিজ পরিবারে গ্রহণ করে মানুষ করতে প্রস্তুত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরও অপরের হেফাজতে দেন। পারিবারিক বন্ধন অটুট রেখে নারীজাতির চতুর্দিকের কারা-প্রাচীর ভেঙ্গে তাদের মুক্তি দেবার এই অদ্ভুত বিপ্লবে অরাজকতার নাম-গন্ধও ছিল না। তালিমীসঙ্ঘের সর্বসাধারণের পাকশালায় শতাধিক ব্যক্তি আহার করেন। সেখানে খাবার পর জনৈক বন্ধু রসিকতা করে বলেন: "গান্ধীজী একে পাকশালা বললে কথাটা লঘু হয়ে যায়, কিন্তু কমিউনিস্টরা একে 'কমিউন' আখ্যা দিলে অমনি তা সকলকে প্রভাবিত করে।"

ইংরেজ লেখক এডিসনের সৃষ্ট জনৈক বৃদ্ধ সামন্তচরিত্র বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল যে, যে-নাটকের প্রতিটি পঙক্তি সে বুঝতে পারছে, তা আবার বিয়োগান্তক হয় কেমন করে।"

॥ আর্থিক সাম্যের আসল অর্থ ॥

গান্ধীজীর বিগত মাদ্রাজ সফরকালে গঠনমূলক কর্মীদের এক সম্মেলনে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, "আর্থিক সাম্য বলতে আপনি যথার্থ কি বোঝেন? আপনার মতে বৈধ ন্যাসবাদ কাকে বলা যেতে পারে?"

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "আর্থিক সাম্য বলতে আমি এ বুঝি না যে, প্রত্যেককে নিক্তিতে মেপে সমান দিতে হবে। আমার আর্থিক সাম্যের সোজা অর্থ হচ্ছে এই, প্রত্যেক নরনারী যেন প্রয়োজনমত পায়। একটা হাতের কাছের উদাহরণ দিই। শীতকালে আমার দোশালা দরকার হয়, আর আমার নাতি কানুর কোনরকম গরম কাপড়ের প্রয়োজন হয় না। আমার ছাগলের দুধ, কমলালেবু এবং অন্যান্য ফলমূল চাই। অথচ কানুর সাধারণ আহার্যে হয়ে যায়। কানুকে দেখে আমার ঈর্ষা হয়; কিন্তু তাতে আর লাভ কি? কানু তরুণ যুবা আর আমি ৭৬ বৎসরের বৃদ্ধ। আমার খাবার খরচও কানুর চেয়ে বেশী। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমাদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য বিদ্যমান। হাতির খোরাক পিঁপড়ের হাজার গুণ; কিন্তু এটা অসাম্যদ্যোতক নয়। সুতরাং আর্থিক সাম্যের সঠিক অর্থ হচ্ছে,

প্রত্যেককে তার প্রয়োজনমত দেওয়া। মার্কসও এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একা যদি কেউ চারটি সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব বহনকারী ব্যক্তির সমান দাবি করে, তাহলে সে আর্থিক সাম্যের আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করছে বলতে হবে।”

তারপর গান্ধীজী বললেন “রাজা ও দীন দরিদ্র প্রজার অবস্থার মধ্যে যে আকাশপাতাল পার্থক্য, তাকে যেন কেউ এই কথা বলে বরদাস্ত না করেন যে, একের প্রয়োজন অপরের চেয়ে অধিক। এ অজুহাত বৃথা এবং একে আমার যুক্তির ব্যঙ্গরূপ বলতে হবে। আজকের ধনী-নির্ধনের পার্থক্য দেখে হৃদয়ে আমি অসীম বেদনা অনুভব করি। বিদেশী আমলাতন্ত্র এবং শহরের দেশী বাসিন্দারা মিলে গ্রামের গরীবদের শোষণ করেছেন। অন্ন-উৎপাদনকারী গ্রামবাসীরা স্বয়ং ক্ষুধায় প্রাণত্যাগ করে। তাদের ঘরে দুধ হয়; অথচ তাদের ছেলেপিলেদের মুখে একবিন্দু দুধ পড়ে না। কী লজ্জার কথা! প্রত্যেকের জন্য পুষ্টিকর আহার্য, সুন্দর বাসস্থান, শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।”

আর্থিক সাম্য বলতে গান্ধীজী এই বুঝতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দরিদ্রদের প্রয়োজনপূর্তির পর অপরে এ রকম অধিকার পেতে পারে। আগের কাজ আগে করতে হবে।

॥ বৈধ ন্যাসবাদ ॥

“আজকের ধনিকগোষ্ঠীকে শ্রেণী-সংগ্রাম ও স্বেচ্ছায় যাবতীয় ধনসম্পদের ন্যাসী হওয়া—এই দুই পন্থার একটি বেছে নিতে হবে। মালিকানা বজায় রাখার অধিকার তাঁদের থাকবে। নিজ স্বার্থে নয়, দেশের মঙ্গলের জন্য অপরের শোষণ না করে রাষ্ট্রীয় ধনবৃদ্ধি মানসে নিজ বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার উপযোগ করার অধিকারও তাঁদের থাকবে। তাঁদের সন্তানসন্ততি যদি যোগ্য হয়, তবে তারাও ঐ সম্পত্তির রক্ষক হতে পারবে।”

অবশেষে গান্ধীজী মন্তব্য করলেন, “মনে করুন কাল যেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেল এবং স্বাধীন ভারতে পুঁজিপতিদের নিজ নিজ সম্পদের বৈধ ন্যাসী হবার সুযোগ দেওয়া হল। কিন্তু তখন উপর থেকে এরকম কোন বিধান তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। নীচের থেকে এর সৃষ্টি হবে। দেশবাসী যখন ন্যাসবাদের কথা বুঝতে পারবে এবং দেশে যখন এর অনুকূল আবহাওয়া তৈরী হবে, জনসাধারণ তখন স্বয়ং গ্রাম-পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে এরকম আইন রচনা করবে ও

তা পালন করবে। নীচের থেকে এ জাতীয় বিধান প্রবর্তিত হলে আনন্দে একে সকলে বরণ করে নেবে। উপর থেকে চাপিয়ে দিলে এ জড়পদার্থের মত ভারী বোধ হবে।"

॥ পার্থক্য কোথায় ? ॥

প্রশ্ন : আর্থিক সাম্যের আদর্শে উপনীত হবার জন্য আপনার এবং সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রীদের পন্থার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

উত্তর : সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তাঁরা এখনই আর্থিক সমানতা সৃষ্টির জন্য কিছু করতে সক্ষম নন। তাঁরা শুধু এর জন্য প্রচার করতে পারেন। এর জন্য তাঁরা জনসাধারণের মনে বৈরীভাব ও বিদ্বেষ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার কার্যক্রমে বিশ্বাসী। তাঁরা বলেন যে রাজসত্তা হাতে পেলে তাঁরা জনসাধারণকে দিয়ে সাম্যের সিদ্ধান্ত পালন করাবেন। আমার পরিকল্পনায় রাষ্ট্র শুধু প্রজাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবে। কাউকে হুকুম দেওয়া বা নিজ আদেশ জবরদস্তি করে কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া সে রাষ্ট্রের কাজ হবে না। ঘৃণার সাহায্যে নয়, প্রেমের শক্তির দ্বারা আমি জনসাধারণকে আমার কথা বোঝাব এবং অহিংস পন্থায় আমি আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করব। সারা সমাজ সমতানুবর্তী না হওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চেষ্ট থাকব না। সাম্যের প্রয়োগ আমি নিজের উপর দিয়ে আরম্ভ করব। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে পঞ্চাশটি মোটরগাড়ী তো দূরের কথা, যদি আমি মাত্র দশবিঘা জমিরও মালিক হই, তবুও মৎকল্পিত আর্থিক সমানতাকে মূর্ত করতে পারব না। এর জন্য আমাকে অতীব দরিদ্র হতে হবে। বিগত পঞ্চাশ বৎসর বা তার পূর্ব থেকে আমি এই চেষ্টাই করে আসছি। এই কারণে আমার দাবি হচ্ছে এই যে, আমি গোঁড়া কমিউনিস্ট। ধনবানদের মোটরে চড়া ও তাদের কাছ থেকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নেওয়া ইত্যাদি আমি যা করে থাকি তা শুধু তাদের কাজে লাগিয়ে নেবার জন্য। এতে আমি তাদের বশীভূত হই না। সর্বসাধারণের হিতার্থে প্রয়োজন বোধ করলে নিমেষে আমি এদের ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি।

প্রশ্ন : ধনবানদের দরিদ্রের প্রতি স্বীয় কর্তব্য বোঝাবার জন্য সত্যাগ্রহের স্থান কোথায় ?

উত্তর : এক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের স্থান ততটুকুই যতটুকু বিদেশী শাসকদের বেলায় প্রযোজ্য। সত্যাগ্রহ এমন একটি শক্তি, যা সর্বত্র প্রয়োগ করা চলতে

পারে। পরিবার থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে এর উপযোগ হতে পারে। মনে করুন, কোন জমিদার যেন তাঁর প্রজাদের শোষণ করেন এবং তাদের খুব মাথার ঘাম পায়ে ফেলা রোজগার নিজে আত্মসাৎ করেন। তারা এর বিরোধিতা করলে জমিদারমশাই বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে জবাব দেন যে, তাঁর স্ত্রীর জন্য এত দরকার, ছেলেপিলেদের জন্য অত চাই ইত্যাদি। এই অবস্থায় ঐসব প্রজা এবং তাদের পক্ষাবলম্বী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কর্তব্য হবে জমিদারমশাই-এর পত্নীর কাছে অনুরোধ করা যে, তিনি যেন তাঁর স্বামীকে বোঝান বা তাঁর কাজের বিরোধিতা করেন। তিনি হয়তো বলতে পারেন যে পতিকর্তৃক শোষণ দ্বারা অর্জিত অর্থে তাঁর প্রয়োজন নেই। ছেলে-পিলেরাও একথা বলতে পারে যে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ তারা স্বয়ং পরিশ্রম করে রোজগার করে নেবে।

ধরুন জমিদার তবু কারও কথায় কর্ণপাত করেন না এবং তাঁর গৃহিণী এবং সন্তানসন্ততিও প্রজাদের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গেই সহমত হন। তবুও প্রজাদের হার মানা চলবে না। দরকার পড়লে তারা গ্রাম ছাড়বে; কিন্তু জমিদারের কাছে স্পষ্ট ভাষায় একথা বলতে ছাড়বে না যে, যারা জমি চাষ করে তারাই জমির মালিক। মালিক তো আর স্বয়ং সব জমি চাষ করতে পারবেন না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত প্রজাদের ন্যায়সঙ্গত দাবির সামনে নতি স্বীকার করে চাষের জন্য তাদের জমি দিতেই হবে। হতে পারে যে পুরানো রায়তের বদলে জমিদার নূতন রায়ত বসাবেন। সে ক্ষেত্রে নবাগত রায়তরা নিজেদের ভুল বুঝে জমিদারের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করা পর্যন্ত তারা অহিংস উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। এইভাবে সত্যাগ্রহ দ্বারা জনমত সৃষ্টি করা যেতে পারে। সমাজবিজ্ঞানের যাবতীয় তত্ত্ব এর ভিতর রয়েছে এবং সেইজন্য শেষ পর্যন্ত এ অজেয় প্রমাণিত হবে। হিংসা এ পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে সত্যকার বিপ্লবের রূপায়ণের জন্য সমাজকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়।

সত্যাগ্রহের সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি পালিত হওয়া অপরিহার্য: (১) বিরোধী পক্ষের প্রতি সত্যাগ্রহীর বিন্দুমাত্র ঘৃণা থাকবে না। (২) সত্যাগ্রহীর দাবি যথার্থ ও সত্য হবে। (৩) নিজ আদর্শের জন্য সত্যাগ্রহীকে শেষ পর্যন্ত অসীম দুঃখবরণে প্রস্তুত থাকতে হবে।

হরিজন-সেবক ৩১-৩-১৯৪৬

পরিশিষ্ট—৩

"আমি সমাজতন্ত্রী, কিন্তু অন্য ধরনের।"

(১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে পাঁচগণিতে আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিশারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে গান্ধীজী বিধানসভা, সমাজতন্ত্রবাদ, অহিংসা ইত্যাদি একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেন। সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তার প্যারেলালজী লিখিত বিবরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে।)

গান্ধীজী: আমার সমাজতন্ত্রবাদী বন্ধুদের ত্যাগ ও আত্মসংযম বৃত্তি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেও তাঁদের ও আমার পদ্ধতির মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য, তা আমি কখনও গোপন করি নি। তাঁরা প্রকাশ্যভাবে হিংসা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিশ্বাসী। অথচ আমার কাছে অহিংসাই সবকিছু।"

এরপর আলোচনার মোড় সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ফিরল। মাঝখানে শ্রীযুক্ত ফিশার বলেন, "তাঁরা তো আপনার মতই সমাজতন্ত্রবাদী।"

গান্ধীজী বলেন, "আসল সমাজতন্ত্রবাদী হচ্ছি আমি, ওরা নয়। ওদের কারও কারও জন্মের আগে থেকেই আমি সমাজতন্ত্রবাদী। জোহানস্‌বার্গের জনৈক উগ্র সমাজতন্ত্রবাদীকে আমি স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলাম যে, আমিও সমাজতন্ত্রবাদী। তবে এখন তার উল্লেখ করে কোন লাভ নেই। ওদের সমাজতন্ত্রবাদ অবলুপ্ত হয়ে গেলেও আমার এই দাবি বলবৎ থাকবে।"

"আপনার সমাজতন্ত্রবাদ বলতে আপনি কি বোঝাতে চান?"

"আমার সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ হচ্ছে 'সর্বোদয়'। আমি এমন কি মূক, বধির ও অন্ধদের পদানত করে উপরে উঠতে চাই না। ওদের সমাজতন্ত্রবাদে বোধ হয় এদের কোন স্থান নেই। ভৌতিক উন্নতিই ওদের একমাত্র লক্ষ্য। যেমন আমেরিকা চায় যে, তার প্রতিটি নাগরিকের কাছে যেন একখানি মোটরগাড়ী থাকে। আমার লক্ষ্য কিন্তু এ নয়। আমি আমার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাতন্ত্র্য চাই। ইচ্ছা হলে নভোমণ্ডলে দ্যুতিমান জ্যোতিষ্কের কাছে পৌঁছাবার স্বাধীনতাও আমার থাকা চাই। তবে তার মানে এ নয় যে, আমি এসব করবই। আর কারও সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্য নেই। সেখানে আপনার নিজের বলতে কিছু নেই, এমন কি নিজ-শরীরও নয়।”

“একথা ঠিক যে সমাজতন্ত্রবাদেরও প্রকারভেদ আছে। আমার সুসংস্কৃত সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক জিনিসের উপর রাষ্ট্রের অধিকার থাকা উচিত নয়। কিন্তু রাশিয়ায় এ অধিকার আছে। সেখানে আপনার দেহের উপরও সত্যি সত্যি আপনার কোন অধিকার নেই। বিনাদোষে যে কোন মুহূর্তে আপনাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। তারা আপনাকে যেখানে খুশি পাঠিয়ে দিতে পারে।”

“আপনার সমাজতন্ত্রবাদে কি আপনার সন্তানসন্ততির উপর রাষ্ট্রের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না? নিজের ইচ্ছামত তাদের শিক্ষা দেবার অধিকারও কি কারও এখানে থাকবে না?”

“সকল রাষ্ট্রই এ করে থাকে। আমেরিকাতেও এই চলছে।”

“তাহলে তো রাশিয়া ও আমেরিকায় বিশেষ পার্থক্য নেই।”

“আপনি তো আসলে স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী।”

“সমাজতন্ত্রবাদ যদি স্বৈরতন্ত্র নাও হয়, তবে একে অন্ততঃ নিষ্কর্মা লোকেদের পাণ্ডিত্যের কচকচি বলতে হবে। আমি তো নিজেকে কমিউনিস্টও বলে থাকি।”

“না, না, একথা বলবেন না। নিজেকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে আপনি বিপদ ঘটাবেন। আমি, আপনি, জয়প্রকাশবাবু প্রমুখ প্রত্যেক সমাজতন্ত্রবাদী চাই স্বাধীন ও মুক্ত বিশ্ব। কমিউনিস্টদের লক্ষ্য কিন্তু তা নয়। তাঁরা এমন ব্যবস্থা প্রবর্তনে অভিলাষী, যা শরীর ও মন উভয়কেই গোলাম করে ফেলে।”

“মার্কস সম্বন্ধেও কি আপনার এই অভিমত?”

“কমিউনিস্টরা নিজেদের খেয়াল-খুশিমাফিক মার্কসবাদকে ভেঙ্গেচুরে ঢেলে সেজেছে।”

“লেনিন সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?”

“লেনিন এর সূত্রপাত করেছিলেন এবং স্ট্যালিন একে পূর্ণ করেছেন। কমিউনিস্টরা যখন আপনার কাছে আসে তখন তাদের লক্ষ্য থাকে কংগ্রেসে অনুপ্রবেশ করা এবং অবশেষে কংগ্রেসকে দখল করে এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্বীয় সার্থসিদ্ধিমানসে কাজে লাগান।”

"সমাজতন্ত্রবাদীরাও তো এই কথা বলে। আমার সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদ থেকে এমন কিছু পৃথক নয়। এ হচ্ছে এতদুভয়ের মধুর সমন্বয়। সাম্যবাদ বলতে আমি যা বুঝি তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদের স্বাভাবিক বিকাশের পরিণাম।

"কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। এক সময়ে দু'য়ের পার্থক্য করা কঠিন ছিল। আজ কিন্তু সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের ভিতর পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান বিদ্যমান।"

"আপনি কি তাহলে স্ট্যালিন-মার্কা সাম্যবাদ চান না?"

"ভারতীয় কমিউনিস্টরা কিন্তু ভারতবর্ষে স্ট্যালিন-মার্কা সাম্যবাদই স্থাপনা করতে চান। আর তার জন্য অন্যায়ভাবে আপনার নাম ভাঙ্গাতে চান।"

"ওরা ওতে সফল হবে না।"

হরিজন-সেবক ৪-৮-১৯৪৬

পরিশিষ্ট—৪

জড়বাদ ও আধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য

আধ্যাত্মবাদী ও জড়বাদী উভয়েই শুদ্ধ একত্বে (অদ্বৈতে) বিশ্বাসী বলে বিশ্বচরাচর সম্বন্ধীয় বিধান সম্বন্ধে উভয়েই যখন একজাতীয় ভাষা প্রয়োগ করে, তখন বিস্মিত হবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে তফাত এইটুকু যে আধ্যাত্মবাদী যেখানে "আত্মা" বা "চৈতন্য" শব্দের প্রয়োগ করে, জড়বাদী সেখানে "প্রকৃতি" অথবা "জড় বস্তু" শব্দটি ব্যবহার করে। এর থেকে পাঠকদের হয়ত এই কথা মনে হবে যে, উভয় মতবাদের মধ্যে পরিভাষা ছাড়া মূলতঃ অপর কোন পার্থক্য নেই। বস্তুতঃ "মার্কসের ন্যায়শাস্ত্র (অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি) এবং জড়দর্শনের (দার্শনিক জড়বাদ) প্রমুখ লক্ষণ" সম্বন্ধে স্ট্যালিন যে নিম্নোদ্ধৃত বিধান দিয়েছেন, তা থেকে প্রতীয়মান হবে যে, যেখানে সেখানে তিনি "প্রকৃতি" শব্দটির ব্যবহার করেছেন, সেখানে সত্য, চৈতন্য, পরমাত্মা বা আত্মা শব্দ ব্যবহার করলে সে বিধান গান্ধীপন্থীদেরও মনঃপূত হবে। স্ট্যালিন লিখেছেন :

"দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মুখ্য লক্ষণ নিম্নরূপ :

(ক) দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রকৃতিকে এক পরস্পর সম্বন্ধিত ও সুসংহত (ইন্টিগ্রেটেড) একক্ (ইউনিট) বলে বিবেচনা করে। এর যাবতীয় বস্তু ও দৃশ্যমান ঘটনা পরস্পর সম্বন্ধিত, পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের উপর প্রভাববিস্তারকারী হয়ে থাকে।

এইজন্য দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মতে প্রকৃতির কোন ঘটনাকে চতুষ্পার্শ্বের ঘটনা-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। কারণ প্রাকৃতিক ক্ষেত্রের যে কোন দৃশ্যমান ঘটনাকে চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে পৃথকভাবে দেখলে তা আমাদের কাছে অর্থহীন বলে প্রতীয়মান হবে। পক্ষান্তরে কোন ঘটনাকে চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিবেচনা করে তার অধ্যয়ন করলে, সে ঘটনা বোঝা যায় এবং তার ব্যাখ্যাও করা যায়।

(খ) দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মনে করে যে প্রকৃতি স্থাবর ও গতিহীন নয়। এ ছাড়া প্রকৃতিকে প্রগতিহীন অপরিবর্তনীয় আখ্যা দেওয়া অনুচিত। পরন্তু প্রকৃতি সদাই গতিমান এবং পরিবর্তনশীল। প্রতিনিয়ত এ নবনব রূপ ধারণ

করে ও এর নিত্য নবীন বিকাশ হয়। প্রতি লহমায় এর কিছু-না-কিছু নবীন রচনা ও বিকাশ হয় এবং এর কিছু-না-কিছু বিসর্জন, বিলয় ও নাশ হয়ে থাকে।

(গ) দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি .....বিশ্বাস করে যে, উদ্বর্তনের ধারা অত্যল্প ও প্রায় অদৃশ্য সূক্ষ্ম সংখ্যাত্মক পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে প্রত্যক্ষ ও মৌলিক পরিবর্তনের জন্ম দেয়—গুণাত্মক পরিবর্তনের কারণ হয়। এই গুণাত্মক উদ্বর্তন ক্রমশঃ বা ধীরগতিতে না হয়ে অতীব দ্রুত এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় উল্লম্ফন করার মত হয়ে থাকে। এ পরিবর্তন অবশ্য অকস্মাৎ হয় না। বহুদিনের অদৃশ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং ধারাবাহিক সংখ্যাত্মক পরিবর্তনের যোগফলের পরিণামস্বরূপ এইরূপ দ্রুতগতি পরিবর্তন ঘটে থাকে।

এই কারণে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বিশ্বাস করে যে, প্রগতির গতি চক্রবৎ নয় এবং তাই বারংবার পূর্বস্থিতির পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। এর গতি হচ্ছে সম্মুখাভিমুখী এবং উর্ধ্বগামী। এর ফলে পুরাতন গুণাত্মক স্থিতির পরিবর্তে নবীন গুণাত্মক স্থিতির জন্ম হয় এবং এই বিকাশক্রম ক্রমশঃ সরলতা পরিহার করে অধিকতর জটিলতার পথে চলে এবং নিম্নাবস্থা থেকে উচ্চাবস্থার প্রতি ধাবিত হয়।

(ঘ) দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বিশ্বাস করে যে, প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার মধ্যে একটা স্বভাবসিদ্ধ স্ববিরোধ আছে। কারণ নেতিমূলক (নেগেটিভ) ও ক্রিয়াত্মক (পজিটিভ) উভয় মুখেই এদের গতি থাকে এবং সবকিছুরই ভূত ও ভবিষ্যৎকাল হয়। সবকিছুরই বিনাশ এবং নবীন সৃষ্টি হয়। নেতি-মূলক ও ক্রিয়াত্মক গতির মাঝে, ধ্বংসোন্মুখ এবং প্রত্যাসন্ন জন্মবস্তুর ভিতর, ভূত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে, বিলুপ্তিমুখী এবং বিকাশোন্মুখ অবস্থার ভিতর যে বিরোধ বা সংঘর্ষ হয়, সেই সংঘর্ষই হচ্ছে বিকাশক্রম এবং সংখ্যাত্মক (বা রূপাত্মক) থেকে গুণাত্মক পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত বিধান ও শক্তি।"

উপরি-উক্ত যাবতীয় বিধানে "প্রকৃতির" বদলে "আত্মা" শব্দ প্রয়োগ করলে তা আত্মবাদীরা মেনে নিতে পারে: কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত এর পরবর্তী বিধান সম্বন্ধে তাঁদের জড়বাদীদের সঙ্গে মতদ্বৈধতা হবে:

"নিম্ন দশা থেকে উচ্চাবস্থায় বিকাশের প্রক্রিয়া দৃশ্যমান ঘটনার সুসংবদ্ধ অভিব্যক্তি রূপে হয় না। এর অন্তর্নিহিত শক্তি হচ্ছে বস্তু এবং ঘটনাবলীর স্বভাবসিদ্ধ বিরোধী লক্ষণের অভিব্যক্তি। এই স্ববিরোধের ভিত্তিতে

ক্রিয়াশীল পরস্পর বিরোধী প্রবণতার 'সংঘর্ষের' পরিণামবশতঃ এই রূপান্তর ঘটে থাকে।"

একথা অন্ততঃ স্বীকার করতেই হবে যে উপরি-উক্ত বিধান ঘোষণা করার কালে জড়বাদী তাঁদের জ্ঞানের সীমার বাইরের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিরীক্ষা এবং তার থেকে পরিণাম আবিষ্কারের শক্তি এতই সীমিত যে, তাঁদের পক্ষে দৃঢ়তা সহকারে একথা বলা সম্ভব নয় যে আপাতদৃষ্টিগোচর "সংঘর্ষ" ও "স্ববিরোধের" পিছনে দৃশ্যমান ঘটনার সুসংবদ্ধ অভিব্যক্তির কোনরকম অস্তিত্ব নেই। তাঁতের মাকু যেমন ডান থেকে বাম এবং বাম থেকে ডান-দিকে উল্‌টেপাল্‌টে ধাবিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যবস্থিত রূপে বস্ত্রবয়ন করে থাকে, এই তথাকথিত "সংঘর্ষ" ও "স্ববিরোধ" সম্বন্ধেও অনুরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশ্বচরাচরের যাবতীয় কর্মপ্রবৃত্তির পিছনে যদি কোন স্বাভাবিক সুসংবদ্ধতা না থাকত, তা হলে "থিসিস" ও "অ্যান্টিথিসিসের" কোন "সিন্থেসিসের" সম্ভব হত না।

পরিশিষ্ট—৫

সাম্যবাদ ও সাম্যবাদী

—মো. ক. গান্ধী

আমার পথ

বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় আমার প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা একাধারে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য। সৌভাগ্য এইজন্য যে, আমার বক্তব্য পশ্চিমে অধ্যয়ন ও বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। দুর্ভাগ্য এই কারণে যে, এর সঙ্গে সঙ্গে হয় একে অজ্ঞাতে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে অথবা ইচ্ছা করে এর বিকৃতি সাধিত হচ্ছে। প্রতিটি সত্য স্বয়ংক্রিয় এবং তার এক অন্তর্নিহিত শক্তি বিদ্যমান। সুতরাং এমন কি যখন আমার বক্তব্যকে প্রভূতভাবে বিকৃত করা হয় তখনও আমি অবিচল থাকি। জনৈক সহৃদয় ইউরোপীয় বন্ধু আমাকে একটি সতর্কবাণী পাঠিয়েছেন। তিনি যে সংবাদ পাঠিয়েছেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে যে স্বেচ্ছায় বা আকস্মিকভাবে আমাকে রাশিয়ায় ভুল বোঝা হচ্ছে। বন্ধুটির পাঠান সংবাদ নিম্নরূপ:

"বার্লিনস্থ রাশিয়ার প্রতিনিধি ক্রেসটিনস্কি গান্ধীকে (?) সরকারী অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য ও 'এই অবকাশে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বলশেভিক মতবাদের প্রচারকার্য শুরু করার জন্য' পররাষ্ট্র-মন্ত্রী কর্তৃক আদিষ্ট হবেন। এ ছাড়া গান্ধীজীকে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানানোর দায়িত্বও ক্রেসটিনস্কিকে দেওয়া হবে। এশিয়ার নিপীড়িত জনসাধারণের জন্য প্রচারমূলক সাহিত্য-প্রকাশনার উদ্দেশ্যে তিনি অর্থসহায়তাও দিতে পারবেন। তাঁর (গান্ধীর না মস্কোর?) আদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্রদের জন্য ওরিয়েন্টাল ক্লাব ও সেক্রেটারিয়েট স্থাপনা করা ও গান্ধীর নামে একটি টাকার থলি দেওয়ার অধিকারও ক্রেসটিনস্কিকে দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিন জন হিন্দুকে এ কার্যে নিযুক্ত করা হবে। 'রাল' নামক রাশিয়ার সংবাদপত্রে ১৮ই অক্টোবর এইসব খবর প্রকাশিত হয়েছে।"

আমি যে জার্মানী ও রাশিয়া সফরে আমন্ত্রিত হতে পারি এই সংবাদের উৎস সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিবরণ থেকে একটা হদিস পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য আমি আদৌ এজাতীয় কোন আমন্ত্রণ পাই নি এবং ঐ দুই মহান দেশ দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। আমি ভাল

ভাবেই জানি যে, আমি যে সত্যের প্রতিনিধি, ভারত এখনও তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নি। এর কার্যকারিতা পুরোমাত্রায় প্রমাণিতও হয় নি। ভারতবর্ষে আমার কাজ এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে। এই অবস্থায় আমার পক্ষে বিদেশে কোন কিছু করতে যাওয়া একেবারেই অসময়োচিত হবে। আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভারতবর্ষে যদি প্রমাণ করার মত সাফল্য অর্জন করে তাহলেই আমি পুরোমাত্রায় সন্তুষ্ট হব।

আমার পথ স্পষ্ট। হিংসাত্মক উদ্দেশ্যসাধনে আমাকে ব্যবহার করার যে-কোন প্রয়াস অবশ্যই ব্যর্থ হবে। আমার কর্মপদ্ধতিতে কোন গোপনীয়তা নেই। সত্য ছাড়া আমি অপর কোন কূটনীতির কথা জানি না। অহিংসা ছাড়া আমার কোন অস্ত্র নেই। জ্ঞাতসারে আমি কিছু সময়ের জন্য পথভ্রষ্ট হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য নয়। তাই সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে আমি চলাফেরা করি এবং কেবল এরই সীমার মধ্যে আমাকে কাজে লাগাতে হবে। ইতিপূর্বেও একাধিকবার আমাকে বে-আইনী ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি যতদূর জানি প্রত্যেকবারই সেসব প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে!

বলশেভিক মতবাদ যে ঠিক কি, সে সম্বন্ধে আমি এখনও অজ্ঞ। আমি এ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করে উঠতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত এতে রাশিয়ার কল্যাণ হবে কি না আমি তা জানি না। তবে একথা আমি অবশ্যই জানি যে, এই মতবাদ হিংসানির্ভর ও ঈশ্বরকে অস্বীকারকারী হওয়ার জন্য আমাকে আকৃষ্ট করতে অক্ষম। সাফল্যের কোন সংক্ষিপ্ত হিংসাত্মক পন্থা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমার প্রতি দৃষ্টিদানকারী বলশেভিক বন্ধুদের উপলব্ধি করতে হবে যে প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যকে আমি যতই প্রশংসা করি ও তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হই না কেন, এমন কি মহত্তম লক্ষ্যসাধনের জন্য হিংসাত্মক পন্থাগ্রহণের আমি আপসহীন বিরোধী। তাই হিংসপন্থী ও আমার মধ্যে কোন সাধারণ মিলনভূমি নেই। তবে আমার অহিংসার নীতি আমাকে যে কেবল সন্ত্রাসবাদী ও অপরাপর হিংসাত্মক পন্থায় বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করে না তা-ই নয়, বরং আমাকে তাঁদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য করে। তবে এই মেলামেশার একমাত্র উদ্দেশ্য হল আমার মতে তাঁদের যে ভ্রান্তি তা থেকে তাঁদের নিবৃত্ত করা। কারণ অভিজ্ঞতা আমার ভিতরে এই বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি সৃষ্টি করছে যে অসত্য ও হিংসার ভিতর থেকে

কদাচ স্থায়ী মঙ্গলের জন্ম হতে পারে না। আমার বিশ্বাস ভ্রম বলে প্রতিপন্ন হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে এ ভ্রম মনোমুগ্ধকর।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-১২-১৯২৪

॥ ২ ॥

রুশ সাম্যবাদ

আমি যতদূর জানি বলশেভিক মতবাদে হিংসার প্রয়োগকে কেবল যে নিষিদ্ধ করা হয় নি তা-ই নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রথার উচ্ছেদ এবং রাষ্ট্রের মালিকানায় সামগ্রিক ভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এর অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগের সমর্থন করা হয়। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে কোনরকম দ্বিধা না করেই আমি বলব যে এই শাসনব্যবস্থা বর্তমান রূপে দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কারণ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে হিংসার ভিত্তিতে স্থায়ী কোন কিছু গড়ে তোলা যায় না। সে যাই হক না কেন, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না যে বলশেভিক আদর্শের পিছনে অসংখ্য নরনারীর শুদ্ধতম স্বার্থত্যাগ রয়েছে, যাঁরা এর জন্য তাঁদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন এবং লেনিনের মত মহামানবের আত্মোৎসর্গে পুষ্ট কোন আদর্শ বৃথা যেতে পারে না। লেনিন এবং অন্যান্য বলশেভিক আদর্শবাদীদের মহৎ আত্মত্যাগের উদাহরণ চিরোজ্জ্বল থাকবে এবং কালক্রমে এই আদর্শকে ত্বরান্বিত ও শুদ্ধ করে তুলবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১১-১৯২৮

পশ্চিমের সমাজবাদ ও সাম্যবাদ এমন কতকগুলি ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, যা আমাদের ধ্যানধারণা থেকে মূলতঃ পৃথক। এই জাতীয় একটি ধারণা হল মানবপ্রকৃতি মূলতঃ স্বার্থপর—তাঁদের এই বিশ্বাস। আমি এই ধারণার সমর্থক নই। কারণ আমি জানি যে মানুষ ও পশুর মধ্যে মূল পার্থক্য হল এই যে মানুষ তার অন্তরস্থিত চিৎশক্তির আহ্বানে সাড়া দিতে পারে এবং পশুর মত ষড়রিপুর আকর হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনে এর ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। স্বার্থপরতা ও হিংসা মানুষের পশু-প্রকৃতির লক্ষণ, তার অমর চৈতন্যশক্তির প্রতীক নয়। এইজন্য মানুষ এর ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম। হিন্দুধর্মের মূল ধ্যান-ধারণাও এই এবং এই সত্য আবিষ্কারের পিছনে হিন্দু-ধর্মের বহু বৎসরের তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন রয়েছে। এই কারণে আমাদের দেশে আত্মার গূঢ় রহস্য আবিষ্কারের জন্য শরীরপাতকারী ও প্রাণ-

উৎসর্গকারী সাধুসন্তের আবির্ভাব হলেও পশ্চিমের মত পৃথিবীর সুদূরতম অথবা উচ্চতম অঞ্চল আবিষ্কারের জন্য প্রাণদানকারী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নি। তাই আমাদের সমাজবাদ বা সাম্যবাদের ভিত্তি হওয়া উচিত অহিংসা, এবং শ্রম ও পুঁজি, জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে একাবয়ব সহযোগিতা।

অমৃতবাজার প ত্রিকা, ২-৮-১৯৩৪

রুশীয় ধরনের সাম্যবাদ অর্থাৎ যে সাম্যবাদ জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, ভারতবর্ষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। হিংসা ছাড়া যদি সাম্যবাদ আসে তবে তাকে স্বাগত জানান হবে। কারণ তখন জনসাধারণের তরফে এবং জনসাধারণের জন্য ছাড়া কেউ কোন সম্পত্তির মালিক হবে না। লক্ষপতির কাছে লাখ লাখ টাকা হয়ত থাকবে, কিন্তু সে সবই জনসাধারণের জন্য। সাধারণের স্বার্থে যখনই প্রয়োজন রাষ্ট্র সেইসব সম্পত্তির দায়িত্ব নিতে পারবে।

হরিজন, ১৩-৩-১৯৩৭

শেষ অবধি সাম্যবাদের অর্থ কি? এর অর্থ হল শ্রেণীহীন সমাজ ও এ আদর্শ বাঞ্ছনীয়ও বটে। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য যখন হিংসার সহায়তা নেওয়া হয়, তখনই কেবল আমি এর সঙ্গ বর্জন করি। সমান হয়েই আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করি; কিন্তু এযাবৎকাল আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধ করে এসেছি। অসাম্য ও 'উচ্চ-নীচের' ধারণা পাপ। তবে বন্দুকের সঙীন উঁচিয়ে মানবহৃদয় থেকে পাপ দূর করায় আমি বিশ্বাসী নই। ও পন্থায় মানুষের মন সাড়া দেয় না।

হরিজন, ১৩-৩-১৯৩৭

॥ ৩ ॥

কমিউনিস্টদের প্রতি একটি নিবেদন

[বোম্বাইয়ে গান্ধীজী শ্রমিকদের একটি সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কয়েকজন তরুণ কমিউনিস্ট গান্ধীজীর সেই বক্তৃতায় বাধা দান করেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী হিন্দিতে যে বক্তৃতা দেন তার সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।—ম. দে.]

ভারতবর্ষে যে কমিউনিস্ট আছেন তা আমি জানতাম। কিন্তু মীরাট

জেলের বাইরে তাঁদের কারও সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, অথবা তাঁদের কোন বক্তৃতাও আমি শুনি নি। দুই বৎসর পূর্বে উত্তরপ্রদেশ সফর করার সময় আমি মীরাটের বন্দীদের সঙ্গে আগ্রহ করে দেখা করি এবং এইভাবে তাঁদের কিছুটা জানতে সমর্থ হই। আজকে সন্ধ্যায় তাঁদের একজনের বক্তব্য শুনেছি। এর ভিত্তিতে আমি তাঁদের বলতে চাই যে, শ্রমিকদের জন্য তাঁরা স্বরাজ অর্জন করতে চান বলে দাবি করলেও তাঁদের সে যোগ্যতা আছে কিনা এবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এখানকার তরুণ কমিউনিস্টদের কেউ জন্মগ্রহণ করার বহু পূর্বে আমি শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষা করা আমার কর্তব্য বলে বিবেচনা করতে শুরু করেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার অধিকাংশ সময় আমি তাঁদের সেবায় নিয়োগ করেছি। আমি তাঁদের সঙ্গে থেকেছি এবং তাঁদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়েছি। কেন যে আমি শ্রমিকদের তরফে কথা বলার দাবি করছি আপনাদের তাই তা বুঝতে হবে।…… আপনাদের আমি আমার কাছে আসতে ও আপনাদের পক্ষে যতটা সম্ভব খোলাখুলিভাবে সব কথা আমার সঙ্গে আলোচনা কারার অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিজেদের আপনারা কমিউনিস্ট বলে দাবি করছেন। কিন্তু আপনারা কেউ কমিউনিজমসম্মত জীবনযাপন করেন বলে তো মনে হচ্ছে না। আপনাদের আমি জানাতে চাই যে আমি 'কমিউনিজম' শব্দটির শ্রেষ্ঠ অর্থের আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।……দেশকে যদি আপনারা স্বমতে আনতে চান তাহলে পূর্বোক্ত উক্তির প্রতি আপনাদের প্রতিক্রিয়া যুক্তিসহকারে সপ্রমাণ করতে হবে। জোরজবরদস্তি করে আপনারা এতে সফলকাম হবেন না। দেশকে আপনাদের স্বমতে আনতে আপনারা ধ্বংসলীলা শুরু করতে পারেন। কিন্তু কতজনকে এভাবে ধ্বংস করবেন? দুই এক কোটি নিশ্চয় নয়। লক্ষ লক্ষ লোক আপনাদের অনুবর্তী হলে দুই এক হাজার ব্যক্তিকে আপনারা হত্যা করতে পারেন। আজ কিন্তু আপনারা মুষ্টিমেয় বেশী নন। আমি আপনাদের বলব যে, পারলে আপনারা কংগ্রেসকে আপনাদের মতে দীক্ষিত করুন এবং এর দায়িত্ব নিন।…… আপনাদের অভিমত সর্বপ্রকারে ব্যক্ত করার অধিকার আপনাদের আছে। সুসংবদ্ধভাবে নিজের কথা বলতে পারলে যে-কারও কথাই ধৈর্য ধরে শোনার মত সহনশীলতা ভারতবর্ষের আছে।

সন্ধি হওয়ায় শ্রমিকদের কোন ক্ষতি হয় নি। আমি দাবি করি যে, আমার কোন কাজ কখনও শ্রমিকদের ক্ষতির কারণ হয় নি—হতে পারেও না। কংগ্রেস যদি সম্মেলনে নিজের কোন প্রতিনিধি পাঠায় তবে সেই প্রতিনিধি শ্রমিক কৃষকদের স্বরাজ ছাড়া অপর কোন স্বরাজ চাইবেন না। কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টি হবার বহু পূর্বে কংগ্রেস স্থির করেছিল যে, শ্রমিক কৃষকদের স্বরাজ না হলে স্বরাজের কোন অর্থ হবে না। উপস্থিত শ্রমিকদের মধ্যে আপনারা কেউ-ই হয়ত মাসে কুড়ি টাকার কম পারিশ্রমিক পান না। আমি যে স্বরাজপ্রাপ্তির প্রয়াস করছি, তা কেবল আপনাদের জন্য নয়। আমি সেইসব লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী ও বেকারের জন্য স্বরাজ পেতে চাই যাঁরা আজ একবেলা পেট ভরেও খেতে পান না এবং একটুকরো শুকনো রুটি ও একচিমটে নুন দিয়ে যাঁদের দিন চালাতে হয়। তবে আমি আপনাদের প্রতারণা করতে চাই না। আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ নেই। তাঁদের ক্ষতি করার কথা আমি ভাবতে পারি না। তবে আত্মনিগ্রহ বরণ করে আমি তাদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতে চাই। আমি তাঁদের হৃদয় গলাতে চাই যাতে তাঁরা তাঁদের অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি ন্যায়বিচার করেন। তাঁরাও মানুষ এবং তাঁদের কাছে আমার আবেদন ব্যর্থ যাবে না। জাপানের ইতিহাসে বহুসংখ্যক পুঁজিপতির নিদর্শন পাওয়া যায়। বিগত সত্যাগ্রহের সময় বেশ কয়েক জন পুঁজিপতি যথেষ্ট ত্যাগ বরণ করেছেন—কারাবরণ করেছেন ও অন্যবিধ নিগ্রহ সহ্য করেছেন। তাঁদের কি আপনারা শত্রু করে দিতে চান? একই লক্ষ্য পূর্তির জন্য তাঁরা আপনাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করুন—এ কি আপনারা চান না? ভগবান আপনাদের বুদ্ধি ও প্রতিভা দিয়েছেন। এদের কাজে লাগান। নিজেদের যুক্তিবাদী মানসিকতার পথে বাধা সৃষ্টি না করার জন্য আপনাদের কাছে মিনতি করছি। ঈশ্বর আপনাদের সহায়ক হোন।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৩-১৯৩১

॥ ৪ ॥

শ্রেণী-সংগ্রাম কি পরিহার করতে পারেন ?

প্রশ্ন: শ্রমিক, কৃষক ও কারখানার মজদুরদের কল্যাণসাধন যদি আপনার কাম্য হয়, তাহলে কি আপনার পক্ষে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিহার করা সম্ভবপর ?

উত্তর: অবশ্যই আমার পক্ষে সম্ভবপর, যদি জনসাধারণ অহিংস-পদ্ধতির শরণ নেন। এমন কি কর্মকৌশল (Policy) হিসাবেও অহিংসাকে গ্রহণ করালে কি পরিমাণ সুফল পাওয়া যায় বিগত বার মাসের ইতিহাস তার যথেষ্ট প্রমাণ রেখে গেছে। আর জনসাধারণ যখন একে আচরণের নীতি হিসাবে গ্রহণ করবে, শ্রেণী-সংগ্রাম নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়বে। আহমেদাবাদে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এর অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে এবং এটি একটি স্থির সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হবার পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান। অহিংস প্রক্রিয়ার শরণ নিলে আমরা পুঁজিপতিদের ধ্বংস কামনা করব না, ধ্বংস চাইব পুঁজিবাদের। নিজের পুজি সৃষ্টি, বজায় রাখা ও বৃদ্ধি করার জন্য পুঁজিপতিকে যাঁদের উপর নির্ভর করতে হয় নিজেকে তাঁদের ন্যাসী-রূপে বিবেচনা করার জন্য আমরা পুঁজিপতিদের আহ্বান জানাব। শ্রমিককেও যে পুঁজিপতির পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তার কোন অর্থ নেই। পুঁজি যদি শক্তি হয়, শ্রমও তাহলে তা-ই, উভয় শক্তিকেই ধ্বংসাত্মক অথবা সর্বজনাত্মক ভাবে প্রয়োগ করা চলতে পারে। উভয়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মাত্র শ্রমিক আর পুঁজিপতির ক্রীতদাস হয়ে না থেকে তাঁর অংশীদার হবার অবস্থা অর্জন করবে। তবে শ্রমিক যদি একমাত্র মালিক হতে চান, তবে সম্ভবতঃ স্বর্ণডিম্ব-প্রসবকারী রাজহংসীটিকেই হত্যা করবেন। বুদ্ধি এবং এমন কি সুযোগের অসাম্য সম্ভবতঃ সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত থাকবে। নদীর তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দা চিরকালই ঊষর মরুভূমির বাসিন্দার তুলনায় শস্য-উৎপাদনের অধিকতর সুযোগ পাবেন। তবে অসাম্য থাকলেও অপরিহার্য সাম্য দেখতে যেন ভুল না হয়। পশু-পাখীদের মতই প্রতিটি মানুষেরই জীবনধারণের উপকরণ পাওয়ার সমান অধিকার আছে। এবং যেহেতু প্রতিটি অধিকারের সঙ্গে সেই পর্যায়ের কর্তব্যও যুক্ত ও তার সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে তার উপর যে কোন

আক্রমণ প্রতিরোধ করার দায়িত্ব, সুতরাং এই মৌলিক প্রাথমিক সাম্য বজায় রাখার উপায় ও কর্তব্যই শুধু মানুষের থাকে। সেই পর্যায়ের এই কর্তব্য হল আমার নিজের হাত-পা দিয়ে পরিশ্রম করা এবং প্রতিকার হল আমাকে যে আমার পরিশ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত করতে চায় তার সঙ্গে অসহযোগ করা। আর আমি যদি পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে মৌলিক সাম্য উপলব্ধি করে থাকি এবং এটা করাই উচিত, তাহলে পুঁজিপতির ধ্বংস আমার কাম্য হবে না। তাঁকে পরিবর্তিত করার জন্য আমি প্রয়াস করব। তিনি অন্যায় করলে তাঁর সঙ্গে আমার অসহযোগ তাঁর চোখ খুলে দেবে। আর আমি অসহযোগ করলে অপর কেউ যদি আমার স্থান নেয় তাহলেও আমার ভয় পাবার কারণ সৃষ্টি হবে না। কারণ আমার সহকর্মীর উপর আমি এই প্রভাব বিস্তার করার আশা রাখি যাতে তিনি আমার নিয়োগকর্তার অন্যায় কার্যের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন। শ্রমিক সমাজকে এইভাবে প্রস্তুত করা অবশ্যই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে সঙ্গে সঙ্গে এইটাই নিশ্চিততম উপায় বলে অবশ্যম্ভাবীরূপে দ্রুততম উপায়ও বটে। একথা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, পুঁজিপতির ধ্বংসের অর্থ শেষ পর্যন্ত শ্রমিকেরই সর্বনাশ। আর যেহেতু কোন মানুষই এত খারাপ নয় যে সে চিকিৎসার অতীত, সেই রকম ভাবে কোন মানুষই এতটা পূর্ণ বা শুদ্ধ নয় যে সে যাকে ভুলবশতঃ সম্পূর্ণ পাপী মনে করে তাকে ধ্বংস করার অধিকার তার আছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৩-১৯৩১

॥ ৫ ॥

শ্রমিকদের সাধারণতন্ত্র

লাল কোর্তা বাহিনীর কয়েকজন প্রতিনিধি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের কাজে দীর্ঘকাল ধরে (গান্ধীজীর) মন খুলে কথাবার্তা বলেন। তাঁরা বুঝিয়ে বলেন যে গান্ধীজীর কোন দৈহিক ক্ষতি করা কদাচ তাঁদের উদ্দেশ্য নয় এবং তাঁর জীবন ও স্বাস্থ্য অপর সকলেরই মত তাঁদের কাছেও প্রিয়। তাছাড়া বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ তাঁদের নীতিও নয়। তবে এই সন্ধির প্রতি বিরোধে তাঁরা অটল। কারণ এই সন্ধি তাঁদের

লক্ষ্য—শ্রমিক ও কৃষকদের স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী ভারতবর্ষের আদর্শে তাঁদের নিয়ে যাবে না।

স্নেহমণ্ডিত কণ্ঠে গান্ধীজী তাঁদের বললেন, "আমার প্রিয় তরুণদল, বিহারে গিয়ে দেখ—দেখতে পাবে শ্রমিক ও কৃষকদের সাধারণতন্ত্র সেখানে কেমনভাবে ক্রিয়াশীল। দশ বছর পূর্বে যেখানে ভয় ও দাসত্বের রাজত্ব ছিল, এখন সেখানে সাহস বীরত্ব ও অন্যায়ের প্রতিরোধ ক্রিয়াশীল। পুঁজিকে বিলুপ্ত করা অথবা ধনী কিংবা পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করা যদি লক্ষ্য হয় তাহলে কখনও আপনারা তাতে সফলকাম হবেন না। আপনাদের যা নিশ্চিতভাবে করতে হবে তাহল পুঁজিপতিদের কাছে শ্রমিকদের শক্তির পরিচয় দেওয়া এবং তাহলে তাঁদের জন্য যাঁরা পরিশ্রম করেন পুঁজিপতিরা তাঁদের ন্যাসী হতে সম্মত হবেন। যথেষ্ট খাদ্য, বাসগৃহ, পরিধেয় বস্ত্র এবং আত্মসম্মানবিশিষ্ট মানুষ যেটুকু সাচ্ছন্দ্যে থাকেন তার থেকে বেশী কিছু আমি শ্রমিক কৃষকদের জন্য চাই না। এই অবস্থা সৃষ্টি হবার পর অবশ্য তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা মেধাবী তিনি অবশ্যই অপরের তুলনায় অধিক সম্পদ সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন। তবে আমি কি চাই তা আমি আপনাদের বলেছি। আমি চাই যে দরিদ্রদের ন্যাসী হিসাবে সম্পত্তির ধনীরা তাঁদের ধন-রক্ষণাবেক্ষণ করবেন অথবা দরিদ্রের জন্য সেই সম্পত্তি দিয়ে দেবেন। আপনারা কি জানেন যে টলস্টয়ফার্ম স্থাপন করার সময় আমি আমার সব সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছিলাম? রাস্কিনের "আন্টু টু দিস লাস্ট" গ্রন্থ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং আমার ফার্মকে আমি তার অনুকরণে গড়ে তুলেছিলাম। এবার নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি আপনাদের কৃষকও শ্রমিকদের সাধারণতন্ত্রের একরকম 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।' আর ধন না শ্রম—কোন্‌টাকে আপনারা বেশী গৌরবজনক মনে করেন? সাহারার মরুভূমিতে গাড়ী গাড়ী টাকা নিয়ে যদি আপনারা আটকা পড়েন তবে সে টাকা আপনাদের কোন্ কাজে লাগবে? কিন্তু যদি কাজ করতে পারেন তাহলে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে না। তাহলে কি করে সম্পদকে শ্রমের চেয়ে অধিকতর কাম্য বলা যায়? আপনারা নিজের চোখে আহমেদাবাদের শ্রমিকসঙ্ঘের কাজকর্ম দেখুন। তাহলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে তাঁরা নিজেদের এক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করছেন।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৪-১৯৩১.

॥ ৬ ॥

তরুণ কমিউনিস্টের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর

[মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিপিবদ্ধ নিম্নোক্ত আলোচনা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময় গান্ধীজী যখন বিলাতে যান তখন হয়।]

শ্রীমতী নাইডু…সেদিন একদল তরুণ ভারতীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে… গান্ধীজীর পরিচয় করিয়ে দেন।……

এইসব তরুণদের অধিকাংশই তাঁদের মাতৃভূমি থেকে মোটামুটি নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন এবং তাই তাঁদের ভিতর একটা প্রচণ্ড ব্যগ্রতা ছিল। আমার মনে হয়, তাঁদের প্রত্যেকেই গান্ধীজীকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের এবং দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য গান্ধীজীর এত উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও কেন যে তিনি তাঁদের মতবাদে বিশ্বাসী হচ্ছেন না—এটা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। বাবা (সরোজিনী নাইডুর কনিষ্ঠ পুত্র এবং দলটির নেতা) বললেন, "আপনার ভাষা বুঝতে আমাদের প্রায়ই অসুবিধা হয়। কারণ আপনি কেবল একটি জাতির রূপান্তর ঘটাচ্ছেন না, ইংরাজী ভাষারও পরিবর্তন সাধন করছেন। তাই প্রায়ই আমরা দেখি যে আপনি বলছেন এক আর জনসাধারণ বুঝছে আর এক। তাই আমরা দেখতে এসেছি যে আমাদের বাহ্য পার্থক্যের অন্তরালে কোন সাধারণ মিলনভূমি আছে কি না?" এই কথা বলে কয়েকদিন পূর্বে তারা যে প্রশ্নমালা গান্ধীজীর কাছে পেশ করে গিয়েছিলেন তার আলোচনা শুরু করলেন। এর কয়েকটি প্রশ্ন ও গান্ধীজীর জবাব নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম প্রশ্ন ছিল:

"ভারতীয় রাজন্যবর্গ, জমিদার, কলকারখানার মালিক, মহাজন ও অন্যান্য মুনাফাখোরেরা সঠিক কিভাবে ধনী হচ্ছেন বলে আপনি মনে করেন?"

"বর্তমানে জনসাধারণকে শোষণ করে।" গান্ধীজী জবাব দিলেন।

তাঁদের পরবর্তী প্রশ্ন হল, "ভারতবর্ষের শ্রমিক ও কৃষকদের শোষণ না করে কি এইসব শ্রেণী ধন সঞ্চয় করতে পারেন?"

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "কিছুটা পারেন।"

"যেসব সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকের শ্রমের ফলে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাঁদের

তুলনায় অধিকতর সাচ্ছন্দ্য সহকারে জীবন যাপন করার কোন সামাজিক যুক্তি কি এইসব শ্রেণীর আছে?”

“কোন যুক্তি নেই,” গান্ধীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উত্তর দিলেন। তারপর ব্যাখ্যা করে বলতে লাগলেন, “সমাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা হল এই যে সমান হয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করলেও অর্থাৎ সমান সুযোগের অধিকার আমাদের থাকলেও সবার সমান যোগ্যতা থাকে না। স্বাভাবিক কারণেই এটা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ সকলেরই উচ্চতা একই রকম হতে পারে না বা সবার গায়ের রঙ অথবা বুদ্ধি ইত্যাদি এক সমান হয় না। সুতরাং স্বভাবতই কারও অধিক রোজগার করার যোগ্যতা থাকবে এবং অপরের কম। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেশী থাকবে নিজেদের প্রতিভাকে তাঁরা এই কাজে লাগাবেন। করুণাদ্রব চিত্তে যদি তাঁরা তাঁদের প্রতিভার নিয়োগ করেন তাহলে রাষ্ট্রের সেবা করবেন। এই জাতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব ন্যাসীরূপে, অন্য কোন শর্তে নয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আমি বেশী রোজগার করতে দেব, তাঁর প্রতিভাকে আমি পঙ্গু করে রাখব না। তবে তাঁর অধিকতর উপার্জনের অধিকাংশ রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে হবে—যেমন বাবার সব ছেলের রোজগার পরিবারের সাধারণ অর্থভাণ্ডারে যায়। একমাত্র ন্যাসী হিসাবেই তাঁরা আয় করতে পারবেন। হতে পারে এ লক্ষ্যসাধনে আমি শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হব। তবে এরই জন্য আমি প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। এবং মৌলিক অধিকারের ঘোষণাপত্রেও এটা অন্তর্নিহিত রয়েছে।”

এর থেকে সুবিধাভোগী শ্রেণীর বাঞ্ছনীয় রূপান্তরকরণের উপায় স্বরূপ “শ্রেণী-সংগ্রাম” সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হল।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন না যে কৃষক ও শ্রমিকেরা যাতে সমাজের পরগাছা শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার বোঝা বত্তার হাত থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে পারে তার জন্য আথিক ও সামাজিক স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের শ্রেণী-সংগ্রাম চালান যুক্তিযুক্ত?

উঃ না। আমি স্বয়ং তাঁদের হয়ে একটি বিপ্লব মূর্ত করছি। তবে এ বিপ্লব অহিংস।

প্রঃ উত্তরপ্রদেশে খাজনা কম করার জন্য আপনি যে আন্দোলন চালিয়েছেন তার দ্বারা হয়ত কৃষকদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে—কিন্তু এর দ্বারা সমস্যার মূলে আঘাত হানা যাবে না।

উঃ ঠিক কথা। তবে সবকিছুই একসঙ্গে করা যায় না।

প্রঃ তাহলে ন্যাসবাদ আপনি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন? কেবল বুঝিয়ে?

উঃ কেবল মুখের কথায় বুঝিয়ে নয়। আমি আমার পদ্ধতির শরণ নেব। কেউ কেউ আমাকে আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আখ্যা দিয়েছেন। সে আখ্যা মিথ্যা হতে পারে। কিন্তু নিজেকে আমি বিপ্লবীই মনে করি—অহিংস বিপ্লবী। আমার পদ্ধতি হল অসহযোগ। সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা বাধ্যতামূলক সহযোগিতা ছাড়া কেউ ধনসম্পত্তি জমা করতে পারে না।

এতে অবশ্য যুবকেরা পূর্ণমাত্রায় সন্তুষ্ট হলেন না। বর্তমানে কোন কোন শ্রেণী যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তার মূল সম্বন্ধেই তাঁরা প্রশ্ন তুললেন। "পুঁজিপতিদের কে ন্যাসী করেছে? কেন তাঁরা একটা কমিশন পাবার অধিকারী হবেন এবং কিভাবে আপনি এই কমিশন নির্ধারণ করবেন?"—এই হল তাঁদের প্রশ্ন। গান্ধীজী ব্যাখ্যা করে বললেন, "অর্থ তাঁদের হাতে রয়েছে বলে তাঁরা কমিশন পাবেন। তবে ন্যাসী তাঁদের কেউ করেননি। আমিই তাঁদের ন্যাসী হিসাবে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজ যাঁরা নিজেদের মালিক বলে মনে করেন তাঁদের আমি ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের অধিকারে মালিক থাকবেন না, এ যাবত যাঁদের তাঁরা শোষণ করেছেন তাঁদের অধিকারে মালিক হতে বলছি। কি হারে তাঁরা কমিশন নেবেন তা আমি বলে দেব না, যা উচিত তা-ই নিতে বলব। উদাহরণ-স্বরূপ অর্থাৎ যাঁর একশত টাকা আছে, তাঁকে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বাকী পঞ্চাশ টাকা শ্রমিকদের দিতে বলব। তবে যাঁর এককোটি টাকা আছে, তাঁকে হয়ত বলব যে আপনি এর শতকরা একভাগ মাত্র নিজের জন্য রাখুন। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমি যে কমিশন দিতে চাই তা কোন নির্দিষ্ট হারে হবে না। কারণ তাহলে মারাত্মক অবিচার হবার সম্ভাবনা থাকবে।"

পরবর্তী প্রশ্নগুলি ছিল ভারতীয় পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে গান্ধীজীর মনোভাব সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গে তিনি কোন প্রথা ও তার সঙ্গে সম্বন্ধিত মানুষের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করলেন। এই সুযোগে তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কৃষি ও আর্থিক

কর্মসূচি সম্বন্ধে বললেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, "রাজা-মহারাজ ও জমিদারেরা ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু আপনার সমর্থক হলেন জনসাধারণ। আর জনসাধারণ এইসব রাজা ও জমিদারদের নিজেদের শত্রু বলে মনে করেন। জনসাধারণ ক্ষমতা পাওয়ার পর যদি এইসব শ্রেণীর ভাগ্য নির্ধারণ করেন তখন আপনার মনোভাব কি হবে?"

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "জনসাধারণ আজকে জমিদার ও অন্যান্য মুনাফাকারীদের শত্রু বিবেচনা করেন না। তবে এইসব শ্রেণী তাঁদের উপর যে অবিচার করে আসছেন তার চেতনা জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। পুঁজিপতিদের জনসাধারণ নিজেদের শত্রু বিবেচনা করুন—এ শিক্ষা আমি তাদের দিই না। আমি বলি যে জনসাধারণ স্বয়ং নিজেদের শত্রু। অসহযোগ কখনও জনসাধারণকে একথা বলেনি যে ইংরেজ অথবা জেনারেল ডায়ার খারাপ। বলেছিল যে এরা সবাই একটি প্রথার শিকার। সুতরাং সেই প্রথাকে ধ্বংস করতে হবে—ব্যক্তিগুলিকে নয়। এইজন্যই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় এত উদ্দীপ্ত জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা অবাধে বিচরণ করতে পারেন।"

আবার তাঁরা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করা আরম্ভ করলেন, "কোন প্রথাকে আক্রমণ করাই যদি আপনার কাম্য হয় তাহলে ভারতের পুঁজিপতি ও ইংরেজ পুঁজিপতির মধ্যে কোন পার্থক্য হতে পারে না। অতএব জমিদারদের খাজনা দেওয়া বন্ধ করার আন্দোলন কেন শুরু করেন না?"

গান্ধীজী বললেন, "জমিদার কেবল একটি প্রথার দাস। ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার প্রয়োজন নেই, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব। তবে জমিদারদের খাজনা দিতে আমরা মানা করিয়াছিলাম এইজন্য যে এই টাকা থেকে তাঁরা সরকারকে দেন। তবে যতক্ষণ তাঁরা প্রজাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করছেন জমিদার বলেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই।"

প্রঃ কৃষক ও শ্রমিকেরা যাতে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য নিরূঢ় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য আপনার নির্দিষ্ট কর্মসূচি কি?

উঃ কংগ্রেসের মাধ্যমে আমি যে কর্মসূচির রূপায়ণ করছি, তা-ই আমার কর্মসূচি। আমার স্থির বিশ্বাস যে এর ফলে তাঁদের আজকের অবস্থা স্মরণাতীত কালের তুলনায় নিঃসন্দেহে ভাল হয়েছে। তাঁদের ভৌতিক

অবস্থার কথা অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমি বলছি না। তাঁদের ভিতর যে প্রভূত জাগৃতি এসেছে এবং তার ফলে অবিচার আর শোষণের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে আমি তার প্রতি ইঙ্গিত করছি।

প্রঃ কৃষকদের যে পাঁচশ কোটি টাকার ঋণ তার হাত থেকে তাঁদের মুক্তি দেবার জন্য কোন্ উপায়ের কথা ভাবছেন ?

উঃ ঋণের সঠিক পরিমাণ কেউ জানেন না। এমতাবস্থায় কংগ্রেস ক্ষমতা পেলে যেমন বিদায়ী বিদেশী সরকারের কাছ থেকে ভারতীয় সরকারকে যে দায়-দায়িত্ব নিতে হবে তা পরীক্ষা করে দেখবে বলে আসছে তেমনি এইসব তথাকথিত দায়-দায়িত্ব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১১-১৯৩১

॥ ৭ ॥

গণতন্ত্র—যথার্থ ও মেকী

জনতাকে প্ররোচিত করার মত সহজ ব্যাপার আর কিছু নেই। এর সহজ কারণ হল এই যে জনতার মন বা পূর্ব চিন্তা বলে কোন কিছুর বালাই নেই, উন্মত্ত উত্তেজনার মধ্যে জনতা কাজ করে। আবার অনুতাপ করেও শীঘ্র।··· গণতন্ত্রের উদ্বর্তনের জন্য আমি অসহযোগের প্রয়োগ করছি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৯-১৯২০

নিজ ইচ্ছা চাপিয়ে দেবার জন্য দৈহিক শক্তি প্রয়োগের সঙ্গে আমার কল্পনার গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিবিহীন।

দি এপিক ফাস্ট, পৃঃ ১০২ (১৯৩২ সংস্করণ)

আমার মতে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র কেবল নাম সর্বস্ব। তবে এর ভিতর অবশ্যই যথার্থ গণতন্ত্রের বীজ রয়েছে। কিন্তু এ আকার হবে কেবল তখনই যখন যাবতীয় হিংসা পরিহাস করা হবে এবং দুর্নীতি হবে অদৃশ্য। উভয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। প্রত্যুত দুর্নীতি হিংসারই একটি নিদর্শন। ভারতবর্ষকে যদি যথার্থ গণতন্ত্র গড়ে তুলতে হয় তাহলে হিংসা ও অসত্যের সঙ্গে কোনরকম আপোস করা চলবে না।

হরিজন, ৩-৯-১৯৩৮

গণতন্ত্র এবং হিংসা একসঙ্গে চলতে পারে না। যেসব রাষ্ট্র আজ নামে গণতান্ত্রিক তাদের হয় খোলাখুলি স্বৈরতন্ত্রী হতে হবে আর নচেৎ যথার্থ গণতান্ত্রিক হবার জন্য তাদের সাহসিকতা সহকারে অহিংস হতে হবে। অহিংসা কেবল ব্যক্তির পক্ষে আচরণ করা সম্ভব। ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে কদাচ সম্ভব নয়—এ জাতীয় উক্তি করা যুক্তিবিহীন।

হরিজন ১২-১১-১৯৩৮

॥ ৮ ॥

শ্রমিককে নিজ মর্যাদা উপলব্ধি করতে হবে

আমি যে স্বপ্ন সাকার করতে চাই তাতে ব্যক্তিগত মালিকদের সম্পত্তি নষ্ট করা হবে না। আমি চাই এর উপভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে যাতে যাবতীয় দারিদ্র্য এবং তার পরিণামস্বরূপ অসন্তোষ ও আজকে ধনী ও নির্ধনদের জীবনযাত্রা ও পরিবেশের মধ্যে যে ঘৃণ্য ও কুৎসিত বৈষম্য বিদ্যমান, তার নিরাকরণ হয়। দরিদ্রদের একথা বুঝতে দিতে হবে যে তাঁরা জমিদারদের অংশীদার—তাঁদের ক্রীতদাস নন, যাঁকে জমিদারদের অঙ্গুলিহেলনে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হবে ও সময়ে অসময়ে জমিদারের সব রকমের দাবি মেটাতে হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১১-১৯২৯

কখনও আমি এমন কথা বলি নি যে যতদিন শোষণ ও শোষণের ইচ্ছা বজায় থাকবে ততদিন শোষণকারী ও শোষিতের মধ্যে সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে। আমি শুধু এই কথা বিশ্বাস করি না যে পুঁজিপতি ও জমিদারেরা সবাই স্বভাবতই অপরিহার্য ভাবে শোষণকারী এবং এও বিশ্বাস করি না যে তাঁদের এবং জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যে কোন মৌলিক অথবা অপুনর্মিলনীয় বিরোধ বিদ্যমান। যাবতীয় শোষণের মূলে রয়েছে শোষিতের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা বাধ্যতামূলক সহযোগিতা। একথা স্বীকার করতে আমাদের যতই কুণ্ঠা থাকুক না কেন, আসল কথা হচ্ছে এই যে জনসাধারণ যদি শোষণকারীর নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে তাহলে কোন রকম শোষণক্রিয়া চলবে না। কিন্তু স্বার্থ এসে মাঝখানে দাঁড়ায় এবং যে শৃঙ্খল আমাদের বেঁধে রেখেছে আমরা তাকেই আঁকড়ে ধরি। এর

অবসান প্রয়োজন। জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিলুপ্তি কাম্য নয়, কাম্য হল তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের বর্তমান সম্বন্ধের পরিবর্তন সাধন করে একে অধিকতর সুস্থ ও শুদ্ধ করা।

অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩-৮-১৯৩৪

ভূমিকর্ষণকারীরা যে মুহূর্তে তাঁদের শক্তি উপলব্ধি করবেন জমিদারির পাপ নির্বীর্য হয়ে পড়বে। কৃষকেরা যদি বলেন যে তাঁদের নিজেদের ও ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ভালভাবে খাওয়া-পরা ও শিক্ষা দেওয়ার মত যথেষ্ট মজুরি না দেওয়া হলে তাঁরা ক্ষেতে কাজ করবেন না, তাহলে জমির মালিক বেচারী কি করতে পারেন? শ্রমিক যা উৎপাদন করেন আসলে তার মালিক তিনিই। মেহনতকারীরা যদি কেহ বুদ্ধি সহকারে মিলিত হন তাহলে তাঁরা অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হবেন। এই কারণে আমি শ্রেণী-সংঘর্ষের প্রয়োজনীয়তা দেখি না। একে অপরিহার্য মনে করলে আমি এর প্রচার ও শিক্ষাদানে দ্বিধা করতাম না।

হরিজন, ৫-১২-১৯৩৬

সমস্যাটা এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর সঙ্গে লড়িয়ে দেবার নয়, এ হল শ্রমিকদের তাদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। ধনবান ব্যক্তির সংখ্যা এ জগতে তো একেবারেই নগণ্য। শ্রমিকরা নিজেদের শক্তি উপলব্ধি করার পরও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবেন। শ্রমিকদের ধনীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার অর্থ শ্রেণী-বিদ্বেষ ও তার থেকে উদ্ভূত যাবতীয় কু-পরিণামকে স্থায়ী করা। এ সংঘাত এক দুষ্টচক্র এবং যে-কোন উপায়ে একে পরিহার করতে হবে। দুর্বলতা ও হীনমন্যতার স্বীকৃতি এ। শ্রমিক তাঁর নিজের মর্যাদা উপলব্ধি করা মাত্র অর্থ যথাযোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ শ্রমিকদের জন্য ন্যাস হিসাবে থাকবে। কারণ শ্রম টাকার চেয়েও বড়।

হরিজন, ১৯-১০-১৯৪৫

॥ ৯ ॥

কমিউনিস্টদের জন্য সূত্র

প্রঃ কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরোধ করছেন। কিভাবে আমরা তাঁদের কার্যকলাপের প্রতিরোধ করতে পারি?

উঃ হাঙ্গামা বাধানোকে তাঁরা (কমিউনিস্টরা) যেন তাঁদের পেশা করে

তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে আমার বন্ধুও আছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার ছেলের মত। কিন্তু মনে হয় ন্যায়-অন্যায় অথবা সত্য-মিথ্যার মধ্যে তাঁরা কোন পার্থক্য করেন না। তাঁরা অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এই অভিযোগের ভিত্তি আছে বলে মনে হয়। তাছাড়া তাঁরা রাশিয়ার কাছ থেকে নির্দেশ নেন বলে মনে হয় এবং ভারতবর্ষের বদলে রাশিয়াকে তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিকতার উৎসস্বরূপ বিবেচনা করেন। বাইরের এক দেশের উপর নির্ভরতাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। আমি এমনকি একথাও বলেছি যে আমাদের বর্তমান খাদ্যসঙ্কটে আমরা এমন কি রাশিয়ার গমের উপরও ভরসা করব না। বিদেশের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে আমাদের দেশের মাটির কাছ থেকে যা পাওয়া যেতে পারে তাতে কাজ চালাবার মত যোগ্যতা ও সাহস আমাদের থাকা চাই। তা না হলে স্বাধীন দেশ হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখার যোগ্যতা আমাদের থাকবে না। বিদেশী আদর্শবাদ সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। তার যতটুকুর আমি অঙ্গীকরণ করতে পারব এবং ভারতবর্ষের পটভূমিকায় গ্রহণ করতে পারব, ততটুকুই কেবল আমি নেব। কিন্তু তার অধীন হতে অস্বীকার করব।

সুতরাং কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে আমার সূত্র হল—বরং আমি তাঁদের হাতে মৃত্যুবরণ করা পছন্দ করব, কিন্তু প্রত্যাঘাত করব না।

হরিজন, ৬-১০-১৯৪৬

॥ ১০ ॥

অমি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট

[মাদ্রাজের গঠনকর্মী সম্মেলনে গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আর্থিক সাম্যের লক্ষ্য অর্জনের পথে তাঁর শিক্ষা এবং কমিউনিস্ট ও সামাজবাদীদের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কোনখানে। প্রশ্নটির উত্তরদান প্রসঙ্গে গান্ধীজী বললেন, "আমি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট," তারপর তিনি বলতে লাগলেন:]

সমাজবাদী ও কমিউনিস্টরা বলেন যে আজকে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁরা কিছু করতে পারবেন না। তাঁরা কেবল এর স্বপক্ষে প্রচার-কার্য চালাবেন এবং এর জন্য বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ও বাড়িয়ে যাওয়ার নীতিতে

তাঁরা বিশ্বাসী। তাঁরা বলেন যে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হাতে পেলে তাঁরা জোর করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করবেন। আমার পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে জনসাধারণের ইচ্ছাকে মূর্ত করার জন্য—তাদের কোন কিছু করার নির্দেশ দিতে অথবা করতে বাধ্য করার জন্য নয়। বিদ্বেষের পরিবর্তে প্রেমশক্তি জাগ্রত করে জনসাধারণকে আমার মতে দীক্ষিত করে অহিংস উপায়ে আমি আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করব। সমগ্র সমাজকে স্বমতে আনয়ন না করা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব না, নিজেকে দিয়ে অবিলম্বে আরম্ভ করব।

বলাই বাহুল্য যে আমি যদি পঞ্চাশটি মোটরগাড়ি অথবা এমন কি দশ বিঘা জমিরও মালিক হই তবে আমার আদর্শের আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার আশা করতে পারব না। এর জন্য আমাকে দীন হতেও যে দীন তার পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে যেতে হবে। গত পঞ্চাশ বছর বা তারও অধিক কাল যাবৎ আমি সেই চেষ্টাই করে আসছি। এবং তাই যদিও আমি ধনীদের দেওয়া মোটর গাড়ি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকি তবুও নিজেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট বলে দাবি করি। এসবের কোন প্রভাব আমার উপর পড়ে না এবং জনসাধারণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে এক মুহূর্তের মধ্যে আমি এসব ছেড়ে দিতে পারি।

হরিজন, ৩১-৩-১৯৪৬

॥ ১১ ॥

সত্যাগ্রহের অস্ত্র

ধরুন কোন জমির মালিক তাঁর চাষীদের শোষণ করেন এবং তাঁদের পরিশ্রমের ফল নিজে আত্মসাৎ করে তাঁদের তা থেকে বঞ্চিত করেন। এই নিয়ে চাষীরা অনুযোগ করা সত্ত্বেও জমির মালিক সে কথায় কর্ণপাত না করে যদি এই আপত্তি তোলেন যে তাঁর স্ত্রীর জন্য এই চাই। সন্তান-সন্ততিদের জন্য এত চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। চাষীরা অথবা যাঁরা তাঁদের পক্ষাবলম্বন করেছেন ও যাঁদের প্রভাব আছে তাঁরা ভূ-স্বামীর স্ত্রীর কাছে আবেদন জানাবেন যাতে তিনি তাঁর স্বামীকে বোঝান। তাঁর স্ত্রী সম্ভবতঃ বলতে পারেন যে নিজের জন্য তিনি স্বামীর শোষণের অর্থ চান

না। সন্তানেরাও অনুরূপভাবে বলতে পারেন যে তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় অর্থ নিজেরাই রোজগার করে নেবেন।

আরও ধরে নিন যে তিনি কারও কথায় কর্ণপাত করলেন না অথবা তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা চাষীদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হলেন। কিন্তু তাহলেও চাষীরা পরাজয় স্বীকার করবেন না। বললে তাঁরা চলে যাবেন, তবে একথা বুঝিয়ে দেবেন যে জমির মালিক তিনিই যিনি চাষ করেন। জমির মালিক বরং সব জমিতে চাষ করতে পারবেন না এবং তাই তাঁকে চাষীদের ন্যায়সঙ্গত দাবির কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে। হতে পারে যে জমির মালিক অন্য চাষী নিয়ে এলেন। সে অবস্থায় নবাগত চাষীরা নিজের ভুল বুঝতে পেরে উচ্ছেদ করা চাষীদের সমর্থক না হওয়া পর্যন্ত হিংসা-বিবর্জিত আন্দোলন চলতে থাকবে। এইভাবে সত্যাগ্রহ হল জনমতকে শিক্ষিত করার একটি প্রক্রিয়া। সমাজের যাবতীয় উপাদানই এর আওতায় পড়ে এবং শেষ অবধি নিজেকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। হিংসা এই প্রাক্রয়ায় বাধা সৃষ্টি করে এবং সমগ্র সামাজিক কাঠামোতে যথার্থ বিপ্লব-সাধনকে বিলম্বিত করে।

সত্যাগ্রহের সাফল্যের জন্য নিম্নোক্ত শর্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যক: (১) বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি সত্যগ্রহীর অন্তরে কোন বিদ্বেষ থাকবে না; (২) সত্যাগ্রহের কারণ হবে সত্য ও যথার্থ; (৩) নিজ আদর্শের পরিপূর্তির জন্য সত্যাগ্রহী শেষ পর্যন্ত কষ্টবরণে প্রস্তুত থাকবেন।

হরিজন, ৩১-৩-১৯৪৬

॥ ১২ ॥

অধিকার না কর্তব্য?

এমন একটি গুরুতর অন্যায়ের কথা আজ আলোচনা করতে চাই যা সমাজকে দূষিত করছে। পুঁজিপতি ও জমিদারেরা তাঁদের অধিকারের কথা বলেন, শ্রমিক বলেন তাঁর অধিকারের কথা, রাজন্যবর্গ রাজত্ব করার তাঁদের দৈবী অধিকারের দোহাই দেন, আর রায়ত বলেন এর প্রতিরোধ করার অধিকারের কথা। সকলেই যদি কর্তব্যের কথা না বলে কেবল অধিকারের কথা বলেন তাহলে চরম গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

অধিকারের উপর জোর না দিয়ে সবাই যদি নিজের কর্তব্য করেন তাহলে অবিলম্বে মানবজাতির ভিতর শৃঙ্খলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজাদের রাজত্ব করার দেবদত্ত অধিকার ও রায়তদের প্রভুর প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশের বিনম্র কর্তব্য বলে কোন কিছু নেই। সমাজের মঙ্গলের পরিপন্থী বলে যেমন এই জাতীয় বংশানুক্রমিক অসাম্যের নিরাকরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি এযাবত যেসব লক্ষ লক্ষ মানুষ পদদলিত অবস্থায় ছিলেন তাঁদের নির্লজ্জ অধিকার-চেতনাও ঐ একই কারণে অধিকতর না হলেও সম-পরিমাণ ক্ষতিকারক। দেবদত্ত অথবা অন্য জাতীয় অধিকারের জনকয়েক দাবিদারের তুলনায় শেষোক্ত ধরনের অধিকার-চেতনা সম্ভবতঃ জনসাধারণের অধিকতর ক্ষতি সাধন করবে। বিশেষ অধিকারের দাবিদার পূর্বোক্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বীর বা ভীরুর মৃত্যু বরণ করতে পারেন। তবে এই অল্প কয়েকজনের মৃত্যুতে পরম সুখময় পরিতৃপ্তির সুশৃঙ্খল জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে না। সেই জন্য অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ উপলব্ধি করা উচিত। আমি বলতে চাই, যে-অধিকার সুষ্ঠুভাবে পালিত কর্তব্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট হয় নি, তা পাবার উপযুক্ত নয়। এসব অধিকার হবে জবরদখলের মত—যত শীঘ্র বর্জন করা যায় ততই মঙ্গল। যে হতভাগ্য পিতামাতা সন্তানের প্রতি নিজ কর্তব্য না করে তাদের আনুগত্য দাবি করেন, তিনি অবজ্ঞা ছাড়া আর কোন কিছুর অধিকারী নন। লম্পট স্বামীর পক্ষে তাঁর নিষ্ঠাবতী স্ত্রীর কাছ থেকে সর্ববিষয়ে আনুগত্য আশা করা ধর্মীয় বিধানের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে যেসব সন্তান-সন্ততি তাদের কর্তব্য-পরায়ণ পিতামাতার অবাধ্যতা করে তাদের অকৃতজ্ঞ বিবেচনা করা হবে এবং তারা পিতামাতার চেয়ে নিজেদের ক্ষতিই করবে বেশী। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। মালিক ও শ্রমিক, জমিদার ও রায়ত, রাজন্যবর্গ ও তাঁদের প্রজা অথবা হিন্দু ও মুসলমানের ক্ষেত্রে এই সহজ অথচ বিশ্বজনীন বিধান প্রয়োগ করলে দেখতে পাবেন যে বর্তমানে ভারতবর্ষ ও বিশ্বের অন্যত্র জীবনযাত্রা ও কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খল অবস্থা, তার শরণ না নিয়েই জীবনের সর্বক্ষেত্রে চরমতম সুখপূর্ণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। আমি যাকে সত্যাগ্রহের বিধান আখ্যা দিই, তার উৎস হল কর্তব্য-সম্পাদন দ্বারা অধিকার-প্রাপ্তির নীতিতে।

হরিজন, ৬-৭-১৯৪৭

পরিশিষ্ট ৬

মার্কসবাদের গতিপ্রকৃতি

মূলতত্ত্ব জড় পদার্থ—

"আমরা স্বয়ং যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতে বাস করি, তাই হচ্ছে একমাত্র সত্য।...আমাদের চিন্তা ও চৈতন্য যতই অতীন্দ্রিয় মনে হক না কেন, আসলে তা মস্তিষ্ক অর্থাৎ এক দৈহিক অঙ্গরূপী জড়পদার্থ সম্ভূত। বস্তু মনের সৃষ্টি নয়, পক্ষান্তরে মনই হচ্ছে বস্তুর সর্বোচ্চ সৃষ্টি। (মার্কস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৯)

"জড়-পদার্থের **একমাত্র** গুন, যার স্বীকৃতি দার্শনিক জড়বাদের সঙ্গে সম্বন্ধিত, তা হচ্ছে **প্রত্যক্ষ বাস্তব হবার** গুণ—আমাদের মনোরাজ্যের বাইরে থাকার গুণ। (লেনিন, মেটিরিয়ালিজম অ্যাণ্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম্। ভাভিলোভ কর্তৃক "লেনিন এণ্ড ফিলজফিক্যাল প্রবলেমস অফ মডার্ণ ফিজিক্স—পুস্তিকায় (মস্কো) ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দ, ২২ পৃঃ উদ্ধৃত।)

"ভাববাদীদের বক্তব্য হল: সত্যকার অস্তিত্ব শুধু আছে আমাদের চৈতন্যের এবং প্রকৃতিরূপী জড় জগতের অস্তিত্ব আমাদের চেতনা, অনুভূতি, ভাবজগৎ ও বোধশক্তি সাপেক্ষ। মার্কসীয় জড়বাদী দর্শনের বিশ্বাস এর বিপরীত। এর মতে জড় পদার্থ, প্রকৃতি এবং আমাদের সত্তা হচ্ছে আমাদের চেতনা বহির্ভূত এবং চিৎশক্তি নিরপেক্ষ এক প্রত্যক্ষ বিষয়মুখ ব্যাপার। সর্বপ্রকার অনুভূতি, ভাব ও চেতনার গঙ্গোত্রী হওয়ায় জড়পদার্থই হচ্ছে প্রাথমিক তত্ত্ব। জড়পদার্থ এবং সত্তার প্রতিফলন বলে চৈতন্যের কথা এর পর এবং বস্তুতঃ এর ভিতর থেকেই তার সৃষ্টি। মস্তিষ্ক জড়পদার্থের বিকাশক্রমের এক সুপরিণত অবস্থা। আর মস্তিষ্কই তো চিন্তাসৃষ্টির অঙ্গ। সুতরাং ভ্রান্তি না করে কেউ চিন্তাকে জড় পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। (স্ট্যালিন, ডায়লেক্‌টিক্যাল এণ্ড হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্, মস্কো, ১৯৫১, পৃঃ ১৮)

দার্শনিক জড়বাদ

"ভাববাদীরা জগৎকে অসীম ভাবরাজ্য, "বিশ্বজনীন শক্তি," বা "চৈতন্য" স্বরূপ বিবেচন করে। মার্কসের দার্শনিক জড়বাদের বিশ্বাস এর বিপরীত।

এর মতে বিশ্বের মূলাধার হচ্ছে বস্তু : **জড়পদার্থ** এবং পৃথিবীতে যে বিভিন্ন প্রকারের বস্তু দেখা যায়, তা হচ্ছে গতিশীল জড়পদার্থের বিভিন্নরূপ। মার্কসবাদের মতে দ্বান্দিক পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত বিভিন্ন বস্তুর ভিতর পারস্পরিক সম্বন্ধ ও পরস্পর নির্ভরশীলতা হচ্ছে গতিশীল জড়পদার্থের বিকাশের নিয়মের অঙ্গীভূত এবং এর জন্য কোন বিশ্বজনীন চৈতন্য-সত্তাকে টেনে আনার প্রয়োজন নেই।"

"ভাববাদ একথা স্বীকার করে না যে পৃথিবী ও বিধান সমগ্ররূপে জানা সম্ভব। ভাববাদ আমাদের জ্ঞানের যথার্থতায় বিশ্বাস করে না ও বিষয়মুখ সত্যকে স্বীকৃতি দেয় না। ভাববাদ মনে করে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞানের কাছে অজ্ঞেয় স্বয়ম্ভূ পদার্থে পরিপূর্ণ। মার্কসীয় দার্শনিক জড়বাদের ধারণা এর বিপরীত। এর মতে বিশ্ব ও বিশ্ব-বিধান সকলই সম্পূর্ণ ভাবে জানা সম্ভব এবং প্রয়োগ ও অনুশীলনের দ্বারা প্রাকৃতিক বিধান সম্বন্ধে আমরা যে গুণার্জন করি, তা প্রামাণিক ও বিষয়মুখ সত্যের সমতুল্য। জগতে এমন কিছুই নেই, যা জানা সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত যে সব জিনিস আমরা জানি না, তাও ক্রমে বিজ্ঞান ও অনুশীলনের দ্বারা প্রকাশিত হবে ও জানা যাবে। (স্ট্যালিন, ডয়েলেকটিক্যাল এণ্ড হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্। মস্কো, ১৯৫১। যথাক্রমে পৃ: ১৬ ও ২৮)

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা

"উৎপাদন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত পণ্য-বিনিময় ব্যবস্থাই যাবতীয় সমাজ-ব্যবস্থার আধার-শীলা—এই নীতি থেকে ইতিহাসের জড়বাদী ধারণার সূচনা। কিভাবে কোন্ পণ্য উৎপাদন করা হয় ও কোন্ পদ্ধতিতে তার বিনিময় হয়, তারই উপর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সব সমাজের বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের প্রত্যেকটিতে উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন ও তৎসহ সমাজকে শ্রেণী বা বর্গে বিভক্তকরণ কার্য নির্ভর করে। এই ধারণা অনুযায়ী যাবতীয় সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মূল কারণ খোঁজার জন্য ক্রমবর্ধমান প্রজ্ঞা-দৃষ্টিসম্পন্ন শাশ্বত সত্য ও ন্যায় বিচারে বিশ্বাসী মানব-মনের শরণ নেবার প্রয়োজন নেই। এর সন্ধান পাওয়া যাবে উৎপাদন ও বিনিময়-পদ্ধতির ভিতর। সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কারণ সে যুগের **অর্থনীতিতে** খুঁজে পাওয়া যাবে, **দর্শনশাস্ত্রে** নয়।

বর্তমান সামাজিক কাঠামো অযৌক্তিক ও অবিচারে পূর্ণ এবং যুক্তি অর্থহীন ও সৎকার্য যে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে—এই বোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবার কারণ হচ্ছে এই যে, এসব নীরবে উৎপাদন ও বিনিময়-পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন চলেছে, তার বাহ্য প্রকাশ এবং যে অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে পূর্বতন সামাজিক কাঠামো গড়া হয়েছিল, তা আর পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। এর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ধরে নিতে হবে যে, এইসব ভ্রষ্টাচার থেকে ত্রাণ পাবার উপায়ও অল্পাধিক বিকশিত অবস্থায় নবীন উৎপাদন-পদ্ধতির ভিতর নিহত আছে। মন এ উপায়ের আবিষ্কার (invention) করে না, মনের সাহায্যে উৎপাদনের প্রচলিত বাস্তব অবস্থা থেকে তাকে শুধু খুঁজে বার করতে (discover) হয়। (এঙ্গেলস্, এন্টি-ড্যুরিং, মস্কো, ১৯৪৭। পৃঃ ৩৯৬-৯৭)

ধর্ম ও ঈশ্বর

"ধর্ম জনগণের কাছে আফিং-এর মত" (মার্কস)।

"মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে যেসব বাহ্য শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে, প্রত্যেক ধর্মই মানুষের মনে তার অলীক বিচ্ছুরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিচ্ছুরণে পার্থিব শক্তি সমূহই অপার্থিব শক্তির রূপ ধারণ করে।"

"এ কথা এখনও সত্য যে মানুষ কোন কিছু স্থির করে, আর ভগবান (অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বাহ্য শক্তি) তা তছনছ করে দেয়।" (এঙ্গেলস্, এন্টি-ড্যুরিং, মস্কো, ১৯৪৭। যথাক্রমে পৃঃ ৪৭০ ও ৪৭২)

"সমাজের সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া কোন কিছুই রহস্যময়, ধারণাশক্তির অতীত বা আশাতীত থাকিবে না।...কমিউনিস্ট পদ্ধতির সংগঠন ও শক্তিবৃদ্ধির ফলে ধর্ম এমন আঘাত পাবে যে, হৃতশক্তি আর পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না।...পুঁজিবাদের ধ্বংসকারী সমাজ হইতে সকল প্রকারের শ্রেণীভেদ ও শ্রেণী-সংগ্রামমুক্ত সমাজে রূপান্তরের ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই সকল ধর্ম ও সকল সংস্কার বিলুপ্ত হইবে। (বুখারিন, হারল্ড লাস্কি কর্তৃক "কমিউনিজম্" পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।)

নীতিশাস্ত্র

"মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞানতঃ শেষ পর্যন্ত তাদের শ্রেণীগত অবস্থার ভিত্তি, অর্থাৎ যে আর্থিক বন্ধনের আধারের উপর তাদের উৎপাদন ও

বিনিময়-প্রক্রিয়া চলে, তার উপর থেকেই নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের ধারণাবলী গঠন করে।"

"যে মুহূর্ত থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার সূত্রপাত হল, তখনই সেসব সমাজে এই নৈতিক বিধান গৃহীত হল, যে 'চুরি করা মহাপাপ।' শুধু এই জন্যই কি এই নিয়ম এক শাশ্বত নৈতিক বিধানরূপে স্বীকৃত হবে? কখনই না। যে সমাজে চুরির কারণ দূরীভূত করা হয়েছে এবং যখন এক পাগল ছাড়া আর কেউ চুরি করে না, তখনও যে নীতিশাস্ত্র-শিক্ষক, 'চুরি করা মহাপাপ' রূপী পবিত্র ও শাশ্বত বিধান ঘোষণা করবেন, তাকে লোকে কি বিদ্রূপ করবে না?"

"নৈতিক জগতেরও ইতিহাস এবং জাতিগত পার্থক্যের উর্ধ্বে এক স্থায়ী নিয়ম আছে—এই অছিলায় যে কোন প্রকারের শাশ্বত, চূড়ান্ত ও চিরকালের অপরিবর্তনীয় কোন নৈতিক বিধান আমাদের উপর চাপাবার প্রচেষ্টা হওয়া মাত্রই আমরা তার বিরোধিতা করব। (এঙ্গেলস্, এন্টি-ড্যুরিং, মস্কো, ১৯৪৭। যথাক্রমে ১৪০ ও ১৪১ পৃঃ)

রাষ্ট্রের স্বরূপ

"এ (রাষ্ট্র) বরং বিকাশের একটি বিশেষ অবস্থায় সমাজের পরিণতি। এতে করে এই কথা স্বীকৃত হয় যে সমাজের ভিতর এমন একটি স্ববিরোধী অবস্থা এসেছে, যার নিরাকরণ সম্ভবপর নয়। সমাজে এমন একটি ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বরূপী ভাঙ্গন ধরছে, যার অবসান ঘটান সমাজের পক্ষে অসাধ্য। ভিন্নমুখী আর্থিক স্বার্থের বনিয়াদের উপর দণ্ডায়মান এইসব শ্রেণীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব যাতে তাদের এবং সমগ্র সমাজকে অনর্থক সংগ্রামে ব্যাপৃত না রাখে, সেই কারণে এই সংঘর্ষকে কথঞ্চিত ক্ষীণশক্তি করার জন্য ও একে "আইনের" গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখার জন্য আপাতদৃষ্টিতে সমাজের উর্ধ্বে বিরাজিত এক শক্তির প্রয়োজন ঘটে। সমাজ থেকে উদ্ভূত অথচ সমাজের উর্ধ্বে বিরাজিত এবং ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় সমাজ হতে ভিন্নরূপধারী এই শক্তিই হচ্ছে রাষ্ট্র (এঙ্গেলস্' দি অরিজিন অফ দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি এণ্ড স্টেট।)

"মার্কসের মত হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর সামঞ্জস্য স্থাপন করা যদি সম্ভব হত, তবে রাষ্ট্রের উদ্ভব বা অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হত না।...

মার্কসের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে এক বিশেষ শ্রেণী দ্বারা **শাসনের** যন্ত্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর **জুলুম করার** হাতিয়ার, রাষ্ট্র এমন 'বিধি-ব্যবস্থা' রচনা করে, যা শ্রেণীসমূহের বিরোধকে কিঞ্চিৎ মাত্রায় উপশমিত করে অত্যাচারকে আইনসঙ্গত ও স্থায়ী রূপ দান করে।"

"শুধু নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী রাজতন্ত্রেই নয়, চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনেও বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার সত্যকার তাৎপর্য হচ্ছে—শাসক সম্প্রদায়ের কোন্ ব্যক্তিটি জনসাধারণের উপর অত্যাচার ও দমননীতি চালাবে, তাই কয়েক বৎসর অন্তর স্থির করা।"

"আমেরিকা থেকে সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড বা নরওয়ে ইত্যাদি যে কোন পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে চালিত দেশের কথাই ধরুন না কেন, সর্বত্র একথা প্রতীয়মান হবে যে 'রাষ্ট্রের' আসল কাজ চলে পর্দার অন্তরালে এবং এ কাজ চালায় বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, চ্যানসেলারী ও জেনারেল স্টাফ।" (লেনিন, স্টেট এণ্ড রিভলিউশান, মস্কো, ১৯৪৭। যথাক্রমে ১৩, ৫৬, ও ৫৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।)

শ্রেণী-সংগ্রাম

"রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে মার্কসীয় পন্থায় শ্রেণী-সংগ্রামের নীতি প্রয়োগ করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে সর্বহারাদের **রাজনৈতিক শাসনের** স্বীকৃতি এবং তাদের একনায়কত্ব অর্থাৎ জনগণের সশস্ত্র শক্তির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরিত অন্য নিরপেক্ষ শাসন-ক্ষমতা বুঝায়। বুর্জোয়াদের অপরিহার্য মরীয়া প্রতিরোধ দমনক্ষম এবং নবীন অর্থ-ব্যবস্থা রূপায়ণে প্রত্যেকটি শোষিত ও শ্রমজীবী জনতাকে সুসংগঠিত করণক্ষম **শাসক শ্রেণীতে** পরিণত সর্বহারারাই শুধু বুর্জোয়া উচ্ছেদ কার্যে সফলকাম হতে পারে। (লেনিন, স্টেট এণ্ড রিভলিউশান, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ৩৩)

"...সুতরাং ভূমির আদিম গোষ্ঠীগত মালিকানা ব্যবস্থার বিলুপ্তির পর ইতিহাসের প্রতিটি ছত্রই হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের বিবরণ। এ সংগ্রাম শোষক ও শোষিত, শাসক ও শাসিত শ্রেণীর ভিতর সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। তবে এই সংগ্রাম এখন এমন এক স্থিতিতে এসে উপনীত হয়েছে যে, চিরকালের জন্য সমগ্র সমাজকে শোষণ, অত্যাচার ও

শ্রেণী-সংগ্রামের হাত থেকে মুক্তি না দিয়ে এই শোষিত ও সর্বহারাদের পরিত্রাণের আর অন্য কোন পথ নেই।"

"সর্বহারাদের বিকাশের সাধারণ পর্বায়গুলি বর্ণনা করা কালীন আমরা বর্তমান সমাজের ভিতর অল্লাধিক প্রচ্ছন্নরূপে যে গৃহযুদ্ধ চলেছে, তা লক্ষ্য করেছি। এর পর এই যুদ্ধ প্রকাশ্য বিপ্লবের রূপ ধারণ করে এবং হিংস উপায়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর মূলোৎপাটনের পর সর্বহারাদের রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। (মার্কস ও এঙ্গেলস্ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, মস্কো, ১৯৩৮, পৃঃ যথাক্রমে ১৫ ও ১৭)

সর্বহারার একনায়কত্ব

"রাষ্ট্র হচ্ছে শক্তির এক সংগঠিত রূপ। এ হচ্ছে এক বিশেষ শ্রেণীকে দমন করার উদ্দেশ্যে হিংসার এক প্রতিষ্ঠানরূপী অভিব্যক্তি। তা হলে সর্বহারারা কোন্ শ্রেণীকে দমন করবে? স্বভাবতই শোষক অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীকে। শোষকদের প্রতিরোধ-শক্তিকে জয় করার জন্যই শ্রমিকদের কাছে একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই শোষক-দমন কার্যের পরিচালনা ও জারী রাখার কাজ করতে পারে শুধু সর্বহারারাই। কারণ সর্বহারারাই হচ্ছে একমাত্র শ্রেণী, যারা সুসংগত ভাবে বিপ্লবী এবং বুর্জোয়া উন্মূলন সংগ্রামের সকল শ্রমজীবীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে শুধু এই শ্রেণী।

......সোশালিস্ট নামে আখ্যাত ঐ সব পাতি বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদীরা শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী-সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখে। এরা এমন কি সমাজ-তান্ত্রিক সংস্কারকেও এক স্বপ্নালু দৃষ্টিতে দেখে থাকে। শোষক শ্রেণীর শাসন উচ্ছেদ করা এদের লক্ষ্য নয়। এরা ভাবে যে নিজ লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন সংখ্যা-গরিষ্ঠদের কাছে এই সব সংখ্যালঘিষ্ঠ শোষকরা নীরবে আত্মসমর্পণ করবে।"

"তাকেই শুধু মার্কসবাদী বলা হবে, যে শ্রেণী-সংগ্রামের গণ্ডিকে **সর্বহারার একনায়কত্ব** পর্যন্ত **প্রসারিত** করেছে। (লেনিন, স্টেট এণ্ড রিভলিউশান, মস্কো, ১৯৪৭, যথাক্রমে ৩২ ও ৪৩ পৃঃ)

হিংসার অপরিহার্যতা

"নূতনের সম্ভাবনা বিশিষ্ট প্রতিটি পুরাতন সমাজের ধাত্রী (midwife) হচ্ছে শক্তি (force)।" (মার্কস, ক্যাপিট্যাল, ১ম খণ্ড, ১৯৫৩, পৃঃ ৬০৩)

"কমিউনিস্টরা তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গোপন করতে চায় না। তারা

প্রকাশ্য ভাবে এ কথা ঘোষণা করে যে, বলপ্রয়োগে যাবতীয় প্রচলিত সামাজিক অবস্থার উচ্ছেদ দ্বারাই শুধু তাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণী কম্পমান হয়ে উঠুক।" (মার্কস ও এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, মস্কো, ১৯৪৮, পৃঃ ৯১)

"আত্মাবলুপ্তির পথে এ (বুর্জোয়া রাষ্ট্র) সর্বহারার রাষ্ট্র বা একনায়কত্ব দ্বারা অতিক্রম করে যাওয়া চলতে পারে না। সর্বমান্য নিয়ম হচ্ছে এই যে, শুধু মাত্র হিংস বিপ্লব দ্বারাই এ পরিবর্তন ঘটা সম্ভব।...মার্কস এবং এঙ্গেলসের সমগ্র মতবাদের মূল কথা হচ্ছে এই যে জনগণকে ধারাবাহিক ভাবে এই, শুধুমাত্র এই হিংস বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করতে হবে।"

"মার্কসের আদর্শ হচ্ছে এই যে শ্রমিকবর্গকে অবশ্যই 'চালু রাষ্ট্রযন্ত্রকে' ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে, এর নিয়ন্ত্রণাধিকার পাবার চেষ্টায় আবদ্ধ থাকলে চলবে না।" (লেনিন, স্টেট এণ্ড রিভলিউশান, মস্কো, ১৯৪৭, যথাক্রমে পৃঃ ২৯ ও ৪৭)

অতিরিক্ত মূল্য (Surplus value)

"প্রমাণ করা হল যে, বকেয়া শ্রমকে আত্মসাৎ করাই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রমিক শোষণ প্রক্রিয়ার মূল কথা। পুঁজিবাদী তার শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে বাজারের অন্যান্য পণ্যের মত পূরা মূল্য দিয়েও খরিদ করে। তবুও সে যে দাম দেয়, তার চেয়েও বেশী মূল্য শ্রমিকদের কাছ থেকে আদায় করে। আর এই অতিরিক্ত মূল্যই শেষ পর্যন্ত সেই মূল্যরাশি সৃষ্টি করে, যার থেকে নিয়ত বর্ধনশীল হারে পুঞ্জীভূত পুঁজি বিত্তবান শ্রেণীর হস্তগত হয়।" (এঙ্গেলস্, এন্টি-ড্যুরিং, মস্কো, ১৯৪৭। পৃঃ ৪৫)

রাষ্ট্রের আত্মাবলুপ্তি (Withering away)

"শ্রমিকসমাজ তাদের অগ্রগতির পথে প্রাচীন বেসামরিক সমাজের পরিবর্তে এমন এক সঙ্ঘ গঠন করবে, যা শ্রেণী-বিভেদ এবং তজ্জনিত বিরোধ দূর করবে এবং তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে আর বিশেষ কিছু থাকবে না। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে বস্তুর বেসামরিক সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধের সরকারী নাম।" (মার্কস, পভার্টি অফ ফিলজফি, ১৯৩৫, পৃঃ ১৪৭)

"বহুকাল যাবত নৈরাজ্যবাদীরা 'জনগণের রাষ্ট্রের' কথা বলে আসছেন। অবশ্য প্রুধোঁর বিরুদ্ধে লিখিত মার্কসের বই এবং তদনন্তর কমিউনিস্ট

ম্যানিফেস্টো স্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করেছে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে রাষ্ট্র স্বয়ং গলে যাবে (dissolve) এবং অদৃশ্য হবে। তাই রাষ্ট্র-বিরোধীদের বলপ্রয়োগে দমন করার, সংগ্রাম ও বিপ্লবকালে ব্যবহৃত হবার এক সাময়িক সংগঠন বলে স্বাধীন জনগণের রাষ্ট্রের কথা বলা একেবারে অর্থহীন। সর্বহারারা যতদিন রাষ্ট্র **ব্যবহার করে,** বুঝতে হবে স্বাধীনতার জন্য তার উপযোগ হচ্ছে না। এর ব্যবহার হচ্ছে বিরোধীদের দমনের জন্য এবং যখনই স্বাধীনতার কথা বলার সময় আসে, স্বভাবতই তখন আর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না।" (এঙ্গেলস্, ক্রিটিক অফ দি গথা প্রোগ্রাম, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ৫৪-৫৫)

কমিউনিস্ট সমাজে যখন পুঁজিবাদের প্রতিরোধ শক্তি সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়, (আর এ সম্ভব শুধু কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থাতেই), যখন পুঁজিবাদের আর চিহ্নমাত্র থাকে না, যখন আর কোন শ্রেণীই থাকে না (অর্থাৎ উৎপাদনের সামাজিক সাধনের ক্ষেত্রে যখন আর সমাজের সদস্যদের ভিতর কোন রকম পার্থক্য থাকে না), **শুধু** তখনই 'রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পায়' এবং 'স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব' হয়। শুধু তখনই সত্যকার পূর্ণ গণতন্ত্র, সার্বজনীন গণতন্ত্র সম্ভবপর হয় ও তার প্রতিষ্ঠাও হয়। আর শুধু সেই অবস্থাতেই গণতন্ত্র **আত্মাবলুপ্তির** পথে যাবে। এর সহজ কারণ হচ্ছে এই যে, পুঁজিবাদের দাসত্ব-নিগড় থেকে মুক্তি পেয়ে পুঁজিবাদী শোষণের অবর্ণনীয় বিভীষিকা, বর্বরতার হাত থেকে ত্রাণ পেয়ে জনগণ ক্রমশঃ বহু শতাব্দী যাবত প্রচলিত ও সহস্র সহস্র বৎসর যাবত অসংখ্য কেতাবে লিপিবদ্ধ সামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রাথমিক নিয়মাবলী পালনে **অভ্যস্ত হবে**। শক্তি প্রয়োগ বিনাই তারা তখন ঐ সব প্রথা পালনে অভ্যস্ত হবে। এর জন্য তাদের বাধ্য করতে হবে না বা তাদের উপর হুকুমজারী করতে হবে না। এর জন্য রাষ্ট্র নামে আখ্যাত বাধ্যতা আদায়ের **বিশেষ যন্ত্রটিরও প্রয়োজন হবে না**।" (লেনিন, স্টেট এণ্ড রিভলিউশান, মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ১০৪-৫)

কেন্দ্রীকরণ

"বুর্জোয়াদের হাত থেকে বলপ্রয়োগে ক্রমে ক্রমে সব পুঁজি কেড়ে নেওয়া, রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত সর্বহারাদের হাতে উৎপাদনের সকল যন্ত্র এনে কেন্দ্রিত করার ও যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে যাবতীয় উৎপাদন-ক্ষমতা

বৃদ্ধির জন্য সর্বহারারা তাদের রাজনৈতিক আধিপত্যকে কাজে লাগাবে। (মার্কস ও এঙ্গেলস' কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, মস্কো, ১৯৩৮, পৃঃ ৭০)

"শোষকদের প্রতিরোধ-শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য এবং কৃষক, পাতি বুর্জোয়া, প্রায় সর্বহারা ইত্যাদি সকল শ্রেণীর জনগণকে সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা রচনার কার্যে নিয়োগ করার জন্য সর্বহারারা হিংসা আধারিত শক্তির কেন্দ্রিত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রক্ষমতা চায়।" (লেলিন, স্টেট এণ্ড রিভলিউশান, মস্কো ১৯৩৭ পৃঃ ৩১)

লৌহ সংগঠন

"দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে দলভেদ মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কমিউনিস্ট-দিগের লক্ষ্য ক্ষমতা লাভ, কাজেই এইসব বিলাসিতা মানিয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।" (স্ট্যালিন, ল্যাস্কি কর্তৃক "কমিউনিজম" পুস্তকের ৮৯ পৃ-ায় উদ্ধৃত)

"তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুবর্তীগণ যেখানেই সুবিধা করিতে পারিবেন এবং যেখানেই প্রচারকার্যের সুযোগ পাইবেন, সেখানেই তাঁহারা পুঁজিবাদ ও তাহার মিত্রশক্তি যে কোন ধরণের সংস্কার-পন্থীদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন···কমিউনিস্ট ছাত্রদিগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার শেষ হওয়া একান্ত আবশ্যক ; উপযুক্ত নির্দেশ পাইলে এবং সুসংগঠিত হইলে তাঁহারা পার্টির সকল কাজ করিতে পারিবেন।" (১৯২০ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় বিশ্ব-কংগ্রেসের ঘোষণা। ল্যাস্কি কর্তৃক "কমিউনিজম" পুস্তকের ১১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)

জাতীয়তার বিরুদ্ধে

"শ্রমিক সমাজের দেশ বলে কোন কিছু নেই। যা তাদের নেই, তা আবার আমরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেব কি করে?" (মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, মস্কো, ১৯৪৮, পৃঃ ৬৭)

ব্যক্তির স্থান

"···কারণ কমিউনিজমে অর্থনীতির শক্তি লোপ করা হয় না। পক্ষান্তরে অর্থনীতি বরং মানুষের সর্বেসর্বা প্রভু হয়ে ওঠে এবং এইভাবে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার পরিপূর্ণ বিসর্জনের পথ প্রস্তুত হয়।"

"সময়ই সবকিছু এবং এখন আর মানুষের মূল্য নেই। মানুষ খুব বেশী হলে সময়ের মূর্ত প্রতীক। এখন আর বৈশিষ্ট্যের (Quality) কথা নয়, সংখ্যা-শক্তিই (Quantity) হচ্ছে সর্ব বিষয়ের মূলাধার।" (মার্কস, রেনে ফুলপ মিলার কর্তৃক 'ডি হিউম্যানাইজেশান ইন মডার্ণ সোসাইটি' পুস্তকের যথাক্রমে পৃঃ ৯ ও ১০-এ উদ্ধৃত।)

পরিশিষ্ট ৭

মার্কস ও গান্ধী

তুলনা চলে সাধারণতঃ সাদৃশ্য বা অন্ততঃ আপাত সাদৃশ্য বিশিষ্ট বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গে। মার্কস ও গান্ধীর ভিতর তুলনা তাই অযৌক্তিক নয়। কারণ উভয়ের লক্ষ্যই ছিল দীনতম ব্যক্তিটির কল্যাণসাধন। তবে এই মত ও পথ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে ছিল সুদূস্তর ব্যবধান।

মার্কস মূলতঃ শিল্প-বিপ্লবের অবদান। বিশেষজ্ঞদের মতে শিল্প বিপ্লবের আয়ুষ্কাল ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ—এই একশত বৎসর। আর্করাইট ও হারগ্রিভের স্পিনিং জেনি থেকে শুরু করে জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত এঞ্জিন এবং তার নানাবিধ প্রয়োগের দ্বারা এই শিল্প বিপ্লবের একশত বৎসরে আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন শুরু হয় শিল্পের ক্ষেত্রে। বলা বাহুল্য মানুষ ও পশুর শ্রম আধারিত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আসার এই প্রক্রিয়া আদৌ সহজ সরল অথবা বেদনা ও অশ্রুবিবর্জিত ছিল না। স্পিনিং ফ্রেম আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই এর জনক এবং আর্করাইটকে সেই সব লোকদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় যাঁরা এই কারণে কর্মচ্যুত করেছিলেন। ফলে আর্করাইটকে তাঁর কর্মস্থল প্রেস্টন ত্যাগ করতে হয়। শুধু তাই নয় ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হারগ্রিভের স্পিনিং জেনি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্করাইটের চোরলের সুতাকাটার কলে অগ্নিসংযোগ করা হয় ঐ একই কারণে। সুতরাং শিল্প বিপ্লবের ফলে মাথা পিছু উৎপাদন বা শিল্পপতিদের রোজগার বেড়ে গেলেও ইংলণ্ডে অসংখ্য শ্রমিকদের যে স্বেদ ও অশ্রু ঝরাতে হচ্ছিল তার ছোট্ট নিদর্শন এই ঘটনা। এছাড়া কলের জন্য কারখানা-শহর গড়ে উঠল ও পল্লীর উন্মুক্ত পরিবেশের স্বাধীন শিল্পী ও কারিগরদের পেটের জ্বালায় সে শহরের বস্তিতে এসে বাস করে কল-কারখানায় বাধ্যতামূলক ভাবে মজুরী বিক্রয়কারী শ্রমিক হতে হল। কাজের পরিবেশ ও উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক পরিবর্তনও সাধারণ মানুষের কাছে কম বেদনাদায়ক হয় নি। শ্রমের বাজারে চাহিদার চেয়ে বেশী জোগান হওয়াতে মজুরী, কাজের সময় ও পরিবেশের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যে শোষণ হত তা তো অধিকন্তু।

ইউরোপের সমাজ ও অর্থব্যবস্থার উপরোক্ত পরিস্থিতিতে কার্ল হেনরিখ

মার্কসের জন্ম (৫ই মে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর যৌবনের উন্মেষ হয়েছে জার্মানীর মত আর এক শিল্প বিপ্লবের স্পর্শে প্রভাবিত দেশে। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন এবং আদর্শবাদী হৃদয় ও খোলা চোখ-কানের অধিকারী হওয়ায় স্বভাবতই দীন-দরিদ্রের বেদনা তাঁর হৃদয়ে অনুরণন জাগাল এবং সেই অনুরণনের প্রভাব পড়ল তাঁর লেখনীতে —নিপীড়িতের প্রতি সহানুভূতিতে যা হয়ে উঠল সূচিমুখ। এর জন্য তিনি স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে প্যারিসে গেলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সে দেশও ছাড়তে বাধ্য হলেন একই কারণে। তাই উনত্রিশ বৎসরের আদর্শ-বাদী যুবক মার্কসের পক্ষে তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও সহকর্মী এঙ্গেলসের সঙ্গে মিলিতভাবে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" লিখে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের নকীব হিসাবে পুঁজিপতিদের সতর্ক করে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

নিজস্ব পদ্ধতিতে দীনতম ব্যক্তিটির কল্যাণসাধনের প্রয়াসের বিপ্লবের আবাহন করার কাজ বন্ধ রইল না এবং জার্মানীর প্রয়াস ব্যর্থ হতে মার্কসকে লণ্ডনে গিয়ে আশ্রয় নিতে হল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে। এর পর থেকে মার্কস শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কর্মী নন—প্রধান তত্ত্ববেত্তা। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব তখন সুসংগঠিত। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সেখানকার মানুষ নূতন উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং এর ফলে সমাজের অন্ততঃ একটা অংশ পুঁজিপতিদের মধ্যে যে সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছে তার মোহে শ্রমিক শ্রেণীর স্বেদ ও অশ্রুকে necessary evil বা অপরিহার্য পাপ বলে ধরে নিয়েছে। মার্কস তাঁর সক্রিয় বিপ্লবী জীবনের চোখ দিয়ে ইংলণ্ডের শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধ্যবসায়ী ছাত্রের মত অধ্যয়ন করলেন এই শোষণের মূলগত কারণ জানতে। অবশ্য দেখা ও পড়ার মাঝখানে মনন যে সেতুরূপে ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। এর পরিণামে জগৎ পেল এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "ডাস ক্যাপিট্যাল", যার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর (১৪ই মার্চ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) পর এঙ্গেলসের সম্পাদনায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শিল্প বিপ্লবের কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় স্বভাবতই মার্কস তার প্রতিবিধান আবিষ্কার করার

প্রয়াসেই আত্মনিয়োগ করেন। মানুষ সাধারণতঃ inductive থেকে deductive-এ যায় অর্থাৎ বিশেষ ঘটনা থেকে তার সর্বসামান্য সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে বলে মার্কসের এই approach বা আবেদন অতীব স্বাভাবিক। মার্কস স্বয়ং বহুস্থলে এই সত্য স্বীকার করে গেছেন এবং তাঁর রচনাবলীও এই সত্যের দ্যোতক।

গুণের কথা বাদ দিলেও মার্কসের রচনা আয়তনের দিক থেকেও বিপুল। আর তার উপর এর এত অসংখ্য টীকা ভাষ্য ও ব্যাখ্যা রচিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে যে সাধারণ একজন পাঠকের পক্ষে সেই সমুদ্র মন্থন করে তাঁর মূল বক্তব্য আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নয়। এবং এক্ষেত্রে একের সঙ্গে অপরের অভিমতের পার্থক্য হবার সম্ভাবনাও তীব্র। তবুও সেই ঝুঁকি নিয়ে বলতে বাধা নেই যে মার্কসের মূল তত্ত্ব হল ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম বা দ্বান্দ্বিক জড়বাদ। জড়বাদ এবং বিশেষ করে তার কাণ্টীয় রূপ নয়, হেগেলীয় ভাষ্য—যার দ্বারা মার্কস গভীরভাবে প্রভাবিত হন—দর্শনশাস্ত্রের এক চিরায়ত অধ্যায়। আমাদের বর্তমান আলোচনা প্রধানতঃ রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের এলাকাভুক্ত বলে জড়বাদ বা মার্কসের কথিত তার দ্বান্দ্বিক বিকাশপদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব না। ইতিহাসের গতিপথে এই দ্বান্দ্বিক জড়বাদের সন্ধানী আলোক প্রক্ষেপ করে মার্কস ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার আবিষ্কার করেন। এই ব্যাখ্যা ঠিক কি ভুল এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সেই কূটতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে আমরা বলতে পারি যে মার্কস মনে করতেন যে আদিম সমাজবাদের পর আসে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক সামন্ততন্ত্র এবং তার থেকে সমাজ ও অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদে উত্তরণ করে। এই পুঁজিবাদের মধ্যে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম ও বিকাশরূপী পুঁজিবাদের স্ববিরোধ বিদ্যমান বলে অবশেষে সর্বহারাদের বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিপতি ও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের অবসান হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। মার্কসবাদের অপর এক মৌলিক তত্ত্ব determinism অর্থাৎ ইতিহাসের গতিপথ স্থির হয়েই আছে—বিপ্লবীর কাজ তাকে কেবল ত্বরান্বিত করা—এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। বলা বাহুল্য তাঁর থিসিস অ্যাণ্টিথিসিস ও সিন্থেসিস তত্ত্ব এবং নেগেশান অফ নেগেশান ইত্যাদি সংক্রান্ত মতবাদ তাঁর এই dynamics বা কর্মনীতির মধ্যে এসে পড়ে, যেমন এসে পড়ে পুঁজি, শ্রম,

মূল্য ও অতিরিক্ত মূল্য সংক্রান্ত তাঁর মতবাদ তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনের মধ্যে।

মার্কসবাদের এই মূল তত্ত্বকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তার যে ফলিত রূপ পাওয়া যায় তাকে নিম্ন প্রকারে ব্যক্ত করা যেতে পারে: (১) প্রচলিত রাষ্ট্রযন্ত্র যেহেতু পুঁজিপতিদের করায়ত্ত তাই, এমন কি আদর্শ সংসদীয় গণতন্ত্রেও সর্বহারারা শোষণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না (অবশ্য শেষ জীবনে মার্কসের এতদ্‌সংক্রান্ত অভিমত কিঞ্চিৎ উদার হয়েছিল)। সুতরাং সর্বহারা শ্রেণীকে বলপ্রয়োগে বা শ্রেণী-সংগ্রামকে ক্রমশঃ অধিক তীব্র করে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে হবে। (২) এই কাজে সর্বহারা শ্রেণীকে সংগঠিত ও পরিচালিত করবে তাদের শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধি কমিউনিস্ট পার্টি। (৩) রাষ্ট্র যেহেতু একশ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর কর্তৃত্ব করার যন্ত্র (জনকল্যাণের যন্ত্র আদৌ নয়) তাই একটি মাত্র শ্রেণী অর্থাৎ সর্বহারাদের প্রতিনিধিস্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টির শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আর এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর শোষণ করার অবকাশ থাকবে না এবং সেই জন্য শেষ অবধি রাষ্ট্রযন্ত্রই নিরর্থক হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। (৪) অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিলোপরূপী লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়তা করবে ভূমি ও শ্রমশিল্পসহ যাবতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ। কারণ একমাত্র এই পন্থাতেই অতিরিক্ত মূল্যের (surplus value) সৃষ্টি হয়ে শ্রমিক সমাজের শোষণ ও তজ্জনিত পুঁজিপতিদের পরিপুষ্টির অবসান ঘটবে। (৫) রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই নয়া ব্যবস্থার অন্তিম লক্ষ্য হল নয়া সমাজ ও নয়া মানুষের সৃষ্টি যা শেষ পর্যন্ত এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পর্যবসিত হবে যার নাম সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি। মার্কসবাদের ফলিত রূপের এই পঞ্চতত্ত্ব ছাড়া আরও অজস্র উপাদান আছে। কিন্তু বর্তমান আলোচনার সংক্ষিপ্ত আয়তনের জন্য তার উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও এই পাঁচটি মূল নীতি সম্বন্ধে, আশা করা যায়, কোন মার্কসবাদীর মতদ্বৈধতা হবে না।

॥ ২ ॥

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বলপূর্বক রাশিয়ার পার্লামেণ্ট ডুমা দখল করে আইনসঙ্গত কেরেনেস্কী সরকারের উচ্ছেদ করে সর্বপ্রথম রাশিয়ায় মার্কসবাদী বিপ্লবের রূপায়ণ হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপের

দেশসমূহ চীন যুগোশ্লাভিয়া ভিয়েৎনাম এবং হালে মার্কসবাদী বিপ্লবের পীঠভূমি কিউবা দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার কোন কোন দেশে কোন না কোন রকমের মার্কসবাদ রূপায়িত হয়েছে। অর্থাৎ গত ৫২ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যার একটা বড় অংশই মার্কসবাদী রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-নীতির প্রভাবাধীন হয়েছে। অবশ্য একথা সত্য যে মার্কসবাদের এই সব ফলিত রূপের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মেরুর ব্যবধান এবং এক গোত্রের মার্কসবাদী অপর গোত্রের গুরুভাই-এর জাতি ও কূল ও বংশ নিয়ে নানা রকম প্রশ্নও তোলেন। কিন্তু জ্ঞাতিবিরোধ-সঞ্জাত সেসব কটুকাটব্য অথবা নিন্দা-সমালোচনায় কান দিয়ে কে নৈকষ্য কুলীন মার্কসবাদী ও কে ভঙ্গ এবং কেন, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না। সমগ্র বিশ্বে মার্কসবাদের ফলিত রূপ নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তার আলোকে আমরা এই কথা বোঝার চেষ্টা করব যে উপরে উক্ত মার্কসবাদের পঞ্চবিধ ফলিত আদর্শ এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কতটা সাকার হয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এর প্রথম লক্ষ্য অংশতঃ সিদ্ধ হয়েছে এবং মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত বিপ্লবের (এখানে চলতি অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে) ফলে বলপ্রয়োগে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হয়েছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা স্বীকার না করলে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে এবং তা হল এই যে রাশিয়া চীন ও ভিয়েৎনাম সহ অধিকাংশ কমিউনিস্ট দেশে মার্কসবাদীরা আদৌ শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা ক্ষমতা দখল করেন নি। এ ক্ষমতা তাঁদের হাতে এসেছে সৈন্যবাহিনীর সহায়তায়, গৃহযুদ্ধের কারণ অথবা আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রে (পূর্ব ইউরোপের বহু দেশের যুক্তফ্রণ্টের ইতিহাস স্মরণীয়) কৃতিত্বের কারণ। কিন্তু সে কর্তৃত্ব সর্বহারা শ্রেণীর হাতে এসেছে কি? লেনিন বলেছিলেন—All power to the Soviets। মাও-এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল কৃষিক্ষেত্র ও কারখানার কমিউনকে সর্বশক্তিমান করা। রাশিয়া ও চীনের অন্তরঙ্গতম সুহৃদও কি এই দাবি করতে পারবেন যে সেই সব দেশে সোভিয়েট বা কমিউন বাঞ্ছিত শক্তিতে পুষ্ট হয়েছে? একমাত্র যুগোশ্লাভিয়াই এর কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম এবং Communism with a human face-এর প্রবক্তা চেকোশ্লোভাকিয়ার ডুবচেক ইত্যাদির প্রয়াস অঙ্কুরে বিনষ্ট না হলে সে দেশে হয়ত অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটত। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা যে পার্টির মাতব্বর,

সেনাবাহিনী সহ আমলা ও technocrat বা যন্ত্রবিজ্ঞানীদের করায়ত্ত এবং সর্বহারা অর্থাৎ সাধারণ কৃষক ও মজুরদের কর্তৃত্ব বিশেষ একটা নেই—এ কথা একটু চোখ খুললেই ধরা পড়বে।

মার্কসবাদ প্রভাবিত দেশে যে নামেই হোক শাসনযন্ত্রের উপর কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদী প্রভাব—একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তা কি সর্বহারাদের শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধি? তা যদি হত তাহলে এইসব কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তার ছাপ থাকত। কোন্ কমিউনিস্ট দেশের শাসকদলের নেতৃবর্গ স্বয়ং শ্রমিক? বড় বেশী হলে তাঁরা declassed বা রূপান্তরিত শ্রমিক—একদা মজুর ছিলেন বর্তমানে ব্যবস্থাপক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমলা ও যন্ত্রবিজ্ঞানীদের মতই সাধারণ শ্রমিকদের থেকে অনেক বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছেন। অবশ্য হো-চি-মিন অথবা তাঁর মত আরও দুই একজন সত্যকার গণনায়ক যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আসেন নি তা নয়। কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম—বিরল ব্যতিক্রমেরই নিদর্শন। এবং এ জাতীয় ব্যতিক্রম ভিন্ন আদর্শের পরিবেশেও দেখা যায়।

আর রাষ্ট্রের আত্মাবলুপ্তিকরণ? তার কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র স্বভাবধর্মে leviathan সদৃশ—এত সর্বব্যাপক সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রযন্ত্রের নিদর্শন অতীত ইতিহাসে নেই। রাশিয়ার কমিউনিস্ট দল গত ত্রিশ বৎসরে রাষ্ট্রের আত্মাবলুপ্তিকরণের কথা উচ্চারণ করেন নি। এবং অন্যান্য মার্কসবাদী দেশের তত্ত্ববেত্তারা ভুলেও আর এর কথা বলেন না। ফলে মার্কসবাদের এই অন্যতম ফলিত তত্ত্ব মার্কসবাদীদের দ্বারাই বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত।

উৎপাদন যন্ত্র অর্থাৎ ভূমি শ্রমশিল্প সহ অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করার যাবতীয় উৎসের রাষ্ট্রীয়করণ নীতিগতভাবে কেবল কমিউনিস্ট নয়, যাবতীয় সমাজবাদী এবং অন্যান্য বহু প্রগতিশীল গোষ্ঠীর দ্বারা স্বীকৃত। কমিউনিস্ট ছাড়াও বহু দেশে পূর্ণতঃ বা অংশতঃ এর রূপায়ণ হয়েছে। এর ফলে শ্রমিক সমাজ আর্থিক ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে ন্যায়বিচার পেয়েছেন এ কথাও সত্য। কিন্তু এই পদক্ষেপের অন্তিম লক্ষ্য—সর্ববিধ শোষণ থেকে শ্রমিক সমাজের মুক্তি—কুত্রাপি সাধিত হয়েছে বলে শোনা যায় নি। এক যুগোশ্লাভিয়া ছাড়া আর কোথাও কলকারখানার পরিচালন ব্যবস্থা অথবা উৎপাদন ও বণ্টনের পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে শ্রমিক সমাজের হাত নেই। শ্রমিক সমাজ বড়

বেশী হলে কারখানার কলের একটি যন্ত্রাংশ মাত্র, বিদেশী কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে যারা উৎপাদন বা বণ্টন কার্যের বিশেষ একটি প্রক্রিয়াকে রূপায়িত করে। প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃহৎ হওয়ার ফলে সাধারণ একজন শ্রমিকের বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা তার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও পরিচালনের ব্যাপারে থই পায় না। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং বুরোক্রাট ও টেকনোক্রাটদেরই একমেব প্রাধান্য, যারা কথা বলেন ও কাজ করেন এমন ভাষা ও পদ্ধতিতে যা কেবল তাঁদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটির কাছেই বোধগম্য। মার্কসবাদ প্রভাবিত দেশসমূহে উৎপাদক শ্রেণীর জন্য যে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে আদৌ তা অনন্য নয়। পশ্চিম ইউরোপ ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দেশে তো বটেই এবং এমন কি রাজনৈতিক কারণে কমিউনিস্টরা আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী ও জাপান প্রমুখ যেসব দেশের বিরুদ্ধে নিত্য বিষোদগার করছেন সেসব দেশের শ্রমিকদের জন্য আয়োজিত সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা কোন অংশে কমিউনিস্ট দেশের তুলনায় কম নয়। মার্কসের অতিরিক্ত মূল্যের মতবাদ যদি সত্য হয় তাহলে একথাও সত্য যে মার্কসবাদ প্রভাবিত দেশের অর্থব্যবস্থায় অতিরিক্ত মূল্য তৈরীর প্রক্রিয়া বন্ধ হয় নি। কারণ সেসব দেশে মূল্যের সবটাই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী পান না। রাষ্ট্র যে অংশ নেয় তার কথা বাদ দিলেও ম্যানেজার, টেকনোক্রাট ও বুরোক্রাটরা এর সিংহভাগ নিয়ে থাকেন। ফলে কেবল মর্যাদার দিক থেকেই নয়, রোজগারের দিক থেকেও একজন সাধারণ শ্রমিক ও ম্যানেজার শ্রেণীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সেই রকমই ব্যবধান যা একটি তথাকথিত পুঁজিবাদী দেশে পরিলক্ষিত হয়। কমিউনিস্ট আদর্শে পরিচালিত কৃষি-খামারগুলি সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

আর নূতন সংস্কৃতি—তার কোন নিদর্শনই কমিউনিস্ট দেশের দূর দিগন্তে দেখা যাচ্ছে না। সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই জানেন যে খোদ রাশিয়ার সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে মাঝে মাঝে সে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় ঘুষ, দুর্নীতি, যৌন উদ্দামতা, বলাৎকার ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। বছর কয়েক পূর্বে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে রাশিয়ার opinion poll জাতীয় একটি ব্যাপারের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যার দ্বারা জানা যায় যে সে দেশে জওহরলাল নেহেরুর পরই যে ভারতীয় বিখ্যাত তিনি হলেন বোম্বাই-এর জনৈক আওয়ারা মার্কা চিত্রতারকা! রুশ কর্তৃপক্ষকে বারংবার সে দেশে

"মার্কিন সংস্কৃতির" আক্রমণের বিরুদ্ধে তরুণ-তরুণীদের সতর্ক করে দিতে হয়—এ সংবাদও আমরা এদেশ থেকে পাই। আর চীনের কথা? সে সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল। কিছুদিন পূর্বে (পরিচয়, চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৭৩-৭৪) বাংলাদেশের শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুপরিচিত নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট গোপাল হালদার মহাশয় এ সম্বন্ধে যা লেখেন তা চক্ষুষ্মান যে-কোন ব্যক্তির চৈতন্যোদয়ের পক্ষে যথেষ্ট। কারও সঙ্গে মতভেদ হলেই রাজনৈতিক কর্মীদের অঙ্গুলিহেলনে তার বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য সেখানকার যুবক-যুবতীরা যেভাবে গণহিস্টিরিয়ার পরিচয় দেন তাতে সেখানকার নূতন সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যে পরে কা কথা কমিউনিস্ট বিপ্লবের অন্যতম রূপকার ও খোদ সে দেশের রাষ্ট্রপতি লিউ সাউ চি এবং এমন কি তাঁর পত্নীকে পর্যন্ত নিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের রেডগার্ড বাহিনী যে হেনস্থা করলেন তাতে চীনের নব্য সংস্কৃতির চরিত্রধর্ম সম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা পাওয়া যায়।

॥ ৩ ॥

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে শিব গড়তে গিয়ে এ অবস্থা হল কেন? Naive রাজনীতি-বিশারদেরা বলবেন যে এর জন্য দায়ী স্ট্যালিন, মাও অথবা আর কেউ। তাঁদের বিশ্বাসভাজন মার্কসবাদীদের হাতে কর্তৃত্ব পড়লে এমনটা আদৌ হত না। কিন্তু সমস্যার এ জাতীয় অতি সরলীকরণ বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ নয়। কারণ স্ট্যালিন, মাও অথবা তাঁদের মত অন্যান্য মার্কসবাদীদের অযোগ্য কিংবা দুরভিসন্ধিপূর্ণ কোনটিই মনে করার হেতু নেই। নিঃসন্দেহে তাঁরা প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনীতিক এবং দীনতম ব্যক্তিটির কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে তাঁদের আন্তরিকতাতেও কোন খাদ নেই। তবুও যে মার্কসবাদের ফলিত রূপ তার ঘোষিত লক্ষ্যের ধারেকাছে উপনীত হতে পারেনি তার কারণ লুকিয়ে আছে স্বয়ং মার্কসবাদ এবং বিশেষ করে মার্কসবাদী নিদানের মধ্যে।

মার্কসবাদের প্রথম fallacy বা হেত্বাভাস হল শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ বলপ্রয়োগে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক প্রচলিত রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের তত্ত্ব। বলপ্রয়োগ অর্থাৎ সশস্ত্র পন্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব অবশ্যই আয়ত্তকরা যায়। কিন্তু সে প্রক্রিয়ার শেষে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব কাস্তে হাতুড়ির মালিক কৃষক-শ্রমিক

শ্রেণীর হাতে যায় না, যায় বন্দুক কামান বোমা মেশিনগানের উপর কর্তৃত্ব-কারী সৈন্যবাহিনী ও তাঁদের গুলি-বারুদ ও রসদ সরবরাহকারী বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পরিচালকদের হাতে। অন্ততঃ এই অর্থে মাও-এর বহুল প্রচারিত উক্তি সত্য যে "বন্দুকের নলই শক্তির উৎস"। যতই চেষ্টা করা যাক না কেন দেশের অধিকাংশ কৃষক-শ্রমিকদের হাতে কোন দিনই এমন অস্ত্র দেওয়া যাবে না যার দ্বারা তারা বর্তমানে যাদের হাতে কামান বন্দুক আছে সেই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সর্বদা টক্কর দিতে পারে। এই রকম অসম্ভব ব্যাপার ঘটানোর প্রস্তুতিপর্বেই এজাতীয় ব্যাপক জনজাগৃতি দেখা দেবে যার ফলে প্রচলিত শাসনের কাঠামো শিথিল হয়ে যাবে। সুতরাং সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্ব কেবল অসম্ভব নয় অপ্রয়োজনীয়ও বটে। সংগঠন ও জনজাগৃতি দ্বারা শোষিত সম্প্রদায়কে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রবুদ্ধ করার সার্থক নিদর্শন দেখিয়েছেন গান্ধীজী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর সংগ্রাম এবং ভারতে প্রথমে বিচ্ছিন্নভাবে চম্পারণ আমেদাবাদ ও খেড়াতে ও পরে সংগঠিতভাবে অসহযোগ থেকে শুরু করে আগস্ট আন্দোলন পর্যন্ত মরে বাঁচার জন্য নিঃশস্ত্র মানুষের লড়াই এই সত্যেরই দ্যোতক।

শ্রেণীসংগ্রাম বা সশস্ত্র বিপ্লব তত্ত্বের আরও কয়েকটি মৌলিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মার্কসের যুগের তুলনায় বর্তমানে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা অর্থাৎ সমগ্র অর্থনীতিই অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতি ও আরও নানাবিধ কারণে। সুতরাং মার্কসের সময় যদিও বা সাদা কালোর মত শোষক ও শোষিতের পার্থক্য করা সম্ভবপর হত (এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে) বর্তমানে তা আদৌ সম্ভব নয়। অবশ্য রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্য গায়ের জোরে যাকে ইচ্ছা শোষণকারী বলে গালাগালি দেওয়া যায় (পশ্চিমবঙ্গে যেমন আজ প্রায়ই হচ্ছে), তবে মার্কস যে রকম বৈজ্ঞানিক ভাবে এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য দেখাবার প্রয়াস করেছিলেন তা আজকে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় কে কার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করবে ?

আজকের পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণই যদি নিই তাহলে দেখব শিক্ষক-ছাত্র, বাসযাত্রী-কনডাক্টর, রেলযাত্রী-রেলওয়ে কর্মচারী, রোগীর আত্মীয়-বন্ধু অথবা নিছক জনসাধারণ বনাম ডাক্তার ও হাসপাতালের কর্মচারীর স্বার্থবিরোধ-

জনিত মতান্তর মনান্তর ও এমন কি সংঘর্ষও লেগে আছে। এছাড়া রয়েছে হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-অবাঙালী এবং আরও নানা রকম স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। এই সব পরস্পরবিরোধী স্বার্থের গোষ্ঠীর কোন্‌টি শোষিত এবং কোন্‌টি শোষণকারী তা কে বলতে পারেন? রাজনীতির ক্ষেত্রের উদাহরণ যদি নিই তবে দেখতে পাব যে সর্বহারার দুঃখে অশ্রু ঝরাবার একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত কর্মীরা পরস্পরের মাথা ফাটাচ্ছেন। "আমরাই একমাত্র সর্বহারাপ্রেমী, ওরা সবাই শোষকশ্রেণীর দালাল"—এই শিশুসুলভ উক্তি স্বদলের লোককে সাময়িকভাবে সন্তুষ্ট করতে পারে। কিন্তু বিচারবুদ্ধিশীল যুক্তিবাদীকে এজাতীয় কথা দিয়ে ভোলানো যাবে না।

তর্কের খাতিরে সাময়িকভাবে নাহয় মেনেই নেওয়া গেল যে বিশেষ একটি মার্কসবাদী দলই সর্বহারার একমাত্র বন্ধু, মার্কসবাদের নাম নিয়ে ক্রিয়াশীল অন্য দলগুলি আসলে শোষণকারীদের এজেন্ট। কিন্তু সেই বিশেষ দলটির দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ হলে তাকে কি বলা হবে? সর্বহারাদেরই কোন্ উপশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম হবে তা? উদাহরণটি যে আদৌ কাল্পনিক নয় তার প্রমাণ হল গত ২৫শে নভেম্বর ও ২৫শে ডিসেম্বর দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি সংবাদ। এর প্রথমটি মহেশতলার সরকারপুল এলাকায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দুই বিধানসভা সদস্যের অনুগামীদের মধ্যে প্রভাবের এলাকা নিয়ে সেখানকার পুরাতন বাসিন্দা ও নবাগত বসতি-স্থাপনকারীদের মধ্যে যে প্রবল সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে তার বিবরণ। দ্বিতীয়টি বর্ধমান জেলার গলসী থানার ডুমুর গ্রামের ঘটনা, যেখানে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট ও তাদের সমর্থিত কৃষক সমিতির একদল সশস্ত্র কর্মী ঐ গ্রামেরই একই দলের সমর্থক এক গৃহস্থের বাড়ী ঘেরাও করে গোলায় আগুন ধরিয়ে দেন। এর পরিণামে গুলি পর্যন্ত চলে এবং মার্কসিস্ট কমিউনিস্টের হাতে নিজের দলের একজন মারাও পড়েন। এতো গেল প্রকাশ্য বিস্ফোরণের দুটি মাত্র উদাহরণ। এছাড়া মার্কসবাদের অনুগামী একই পার্টির নেতৃবৃন্দ সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে যে আপাত অপ্রকট দ্বন্দ্ব-বিবাদ ও ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি চলছে (এবং যার পরিণামে শেষ অবধি সর্বহারাদের কল্যাণকামনায় উৎসর্গীত দলও দুই তিন বা চার টুকরা হয়) তাকে কি আখ্যা দেওয়া হবে?

তবে সাদা কালোর মত শোষণকারী ও সর্বহারারূপী দুই শ্রেণীর স্বার্থ-সংঘাত থাকুক বা না-ই থাকুক, মানুষের সমাজ একেবারে আদর্শ স্থিতিতে

না পৌছানো পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকবেই। প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ পথে এর নিরাকরণ করা উচিত? শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ অস্ত্রবলে অপর পক্ষের কণ্ঠরোধ বা কণ্ঠছেদন অবশ্যই করা যায়। তবে এই প্রক্রিয়ায় বিজয়ী পক্ষই সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ—এমন কথা জোর করে বলা যায় না। লেনিনের উত্তরাধিকারী নির্ধারণের যুদ্ধে ঘটনাচক্রে স্ট্যালিনের বদলে ট্রটস্কী জয়ী হলে রাশিয়ার পরবর্তীকালীন লিখিত ইতিহাসই ভিন্ন রূপ ধারণ করত।

তবু ধরে নেওয়া গেল যে ন্যায়ের পক্ষই শ্রেণীসংগ্রামের ফলে জয়ী হল। কিন্তু এই প্রাথমিক জয়ের পরই কি ইতিহাসের চক্রের আবর্তন বন্ধ হয়ে যাবে? আর কোন স্বার্থবিরোধ বা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ দেখা দেবে না কমিউনিস্ট রাষ্ট্র বা সমাজে? তাহলে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চেভের অভিযোগের কি কোন ভিত্তি নেই—না ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে কোসিগিন ইত্যাদির অভিযোগ মিথ্যা? সুতরাং সমস্যা বা স্বার্থ-সংঘাত যদি তার পরও থাকে তবে তার সমাধানের পথ কি? সেই সনাতন শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয় নিশ্চয়। কারণ যে নেতৃত্ব সশস্ত্র পদ্ধতি ছাড়া দ্বন্দ্ব বা স্বার্থ-সংঘাত নিরাকরণের অপর কোন পদ্ধতি শেখেননি তাঁরা বার বার এরই আশ্রয় নেবেন। এবং এর ফলে সমাজে স্থিতি বা শান্তি কোন দিনই আসবে না। Permanent Revolution-এর ধুয়া তুলে এই নিত্য সংঘর্ষ ও সংঘাতের সমর্থনের তাত্ত্বিক দর্শন আবিষ্কার করার চেষ্টা করলেও বস্তুতঃ এ হবে এক অরাজক অবস্থা। সোজা কথায় জোর যার মুলুক তার অথবা সামরিক কর্তৃত্ব। এ-ই কি মার্কসবাদের লক্ষ্য?

মার্কসবাদের দ্বিতীয় হেত্বাভাস হল শ্রমিক সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টিকে সর্বহারাদের বিপ্লবের একমেব বাহন হবার সনদ দেওয়া। যে নূতন মূল্যবোধ অথবা যে শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিপ্লব, বিপ্লবের প্রতিটি পর্যায়ে—তার রূপায়ণ ও বিপ্লবোত্তর সংগঠন পরিচালনাও এর অন্তর্ভুক্ত—তার প্রতিফলন ও সেই শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশ থাকা দরকার। ক্ষমতার একটি centripetal বা কেন্দ্রাভিগ স্বধর্ম আছে এবং প্রায় কোন রাজনৈতিক কর্মীই এই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সঞ্জাত অপপ্রয়োগের উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। কমিউনিস্ট দেশে কি স্ট্যালিন কি বুলগানিন ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনভ-কোসিগিন অথবা মাও-লিন পিয়াও-এর আমলে শাসক দলে উত্তরাধিকারের জন্য যবনিকার অন্তরালে যে গোপন ষড়যন্ত্র ও পাশা

চালাচালি হয় তা যে তথাকথিত সামন্তবাদী বা পুঁজিবাদী দেশের "প্যালেস ক্যু"-এর তুলনায় কোন অংশে কম নয়—একথা সর্বজনবিদিত। তাই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের যথার্থ সংরক্ষক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে তাঁদের কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্ব দখল করার সময় সক্রিয় হলে চলবে না—সেই ব্যবস্থা পরিচালনাও করতে হবে নিজেদের, কমিউনিস্ট অথবা অপর কোন পার্টি রূপী আমমোক্তারের মারফৎ নয়। এর ফলিত রূপ হল দলবিহীন গণতন্ত্র, যা কাজ করবে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জাগতিক পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন অথবা বুনিয়াদী পর্যায়ের সর্বাধিক ক্ষমতা থাকবে এবং কৃষক-শ্রমিক তার কাযকলাপে সক্রিয়ভাবে প্রত্যক্ষতঃ অংশগ্রহণ করবেন। উচ্চতর পর্যায়ের নির্বাচন হবে পরোক্ষ পদ্ধতিতে। সুতরাং গণ ও গণতন্ত্রের মাঝখানে বিরাজিত ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ব্যবধান-সৃষ্টিকারী পুরোহিতরূপী এই রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না।

রাষ্ট্র শোষণের যন্ত্র এবং মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য তাই এর অবলুপ্তি অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মার্কসীয় পদ্ধতিতে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর (যা আসলে কমিউনিস্ট পার্টি বা কূটকৌশলে নিপুণ তার ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর) একনায়কত্বের ফলে তা আসবে না। রাষ্ট্র হল দণ্ডশক্তি অর্থাৎ বাহ্য নিয়ন্ত্রণের প্রতীক এবং এই প্রতীক তখনই অপসৃত করা সম্ভব হবে মানুষের সমাজে যখন আর বাহ্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। বিপ্লবকে সাকার করে তোলা ও তার রূপায়ণ যখন কৃষক-শ্রমিকরা স্বয়ং স্বতঃআরোপিত কর্তব্য হিসাবে সম্পাদন করবেন এবং অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসগৃহ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা রূপী মানুষের ষড়বিধ মৌলিক প্রয়োজনের পূর্তি যখন জনসাধারণের প্রত্যক্ষ প্রয়াসে হবে তখন এই সব কাজ করার জন্য ব্যবস্থাপক-রূপী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে নূতন সংস্কৃতির ভিত্তি স্বরূপ মানবীয় বিবেককে এবং তাহলেই শুধু রাষ্ট্ররূপী নিয়ন্ত্রণ বা শোষণের যন্ত্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে।

উক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে এ কথা স্পষ্ট হবে যে কেবল রাষ্ট্রীয়করণ রাষ্ট্রবিহীন সমাজ গঠনের পক্ষে যথেষ্ট তো নয়ই, এমন কি শ্রমিক সমাজকে আর্থিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকার দেওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। বুনিয়াদী শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান

অবশ্যই চাই। কিন্তু এ মালিকানা বর্তাবে সমাজের উপর। এক্ষেত্রে সমাজের প্রত্যক্ষ প্রতিভূ হবে রাষ্ট্র নয়—উৎপাদক, বণ্টনকারী, উপভোক্তা ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রতিনিধিত্বে গঠিত স্বয়ংশাসিত সমবায় প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, এই স্বয়ংশাসিত সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পর্যায়ে পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে এর কর্মী ও কর্মচারীদের সক্রিয় ভূমিকা থাকবে। তবে অধিকাংশ শিল্প ব্যবসায় ভোগ্য উপকরণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পড়ে এবং এর কাঁচা মাল গ্রামে উৎপন্ন হয় ও এর উপভোক্তাও স্থানীয় বলে এগুলি কেন্দ্রীত ভাবে উৎপাদন করার প্রয়োজন হবে না। গ্রামের কাঁচামালকে গ্রামের শ্রমশক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে গ্রামেই ভোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত করতে হবে এবং এর সাংগঠনিক দায়িত্ব নেবেন প্রয়োজন মত ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদক স্বয়ং অথবা তাঁদের সমবায় সমিতি।

বলা বাহুল্য অহিংস জনজাগৃতির মাধ্যমে শ্রমিক সমাজের যে বিপ্লব জন্মগ্রহণ করবে এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের দ্বারা আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীত ভাবে যা পরিচালিত হবে তার সাংস্কৃতিক আধার হবে মানবীয়। বিশেষ করে এর রূপায়ণের প্রতিটি পর্যায়ে বুদ্ধি বিবেচনা ও নৈতিক বিবেকের প্রয়োগের প্রয়োজন পড়বে বলে একমাত্র এই পথেই নূতন মানুষ ও নূতন সংস্কৃতির জন্ম সম্ভব যা, কোন আজ্ঞাতন্ত্রের বশংবদ হবে না—হবে স্বাধীন স্বরাট ও স্বনিয়ন্ত্রিত।

॥ ৪ ॥

মার্কসের পদ্ধতিতে তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যে সম্ভব নয়—বরং এটা সম্ভবপর গান্ধীজী-কথিত অহিংসা ও বিকেন্দ্রীকরণের পথে, এ দেখে কেউ যেন এই সিদ্ধান্ত না করেন যে মার্কসীয় দর্শনের মূল্য অকিঞ্চিৎকর। মার্কস তাঁর নিদানের আবিষ্কার করেছিলেন আজ থেকে এক শত বৎসরেরও পূর্বে শিল্প-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে। মানুষের ইতিহাস ১৮৫০ অথবা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পৌঁছেই থেমে যায়নি—প্রকৃতির নিয়মে অখণ্ড গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এবং মার্কসের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া যদি শাশ্বত বিধান হয় তবে সর্বহারার একনায়কত্বরূপী সিন্থেসিসই নূতন থিসিস হয়ে নবীন এক অ্যান্টি-থিসিসের প্রভাবে আর এক সিন্থেসিসের জন্ম দিতে বাধ্য। শিল্প-বিপ্লবের

কাল পর্যন্ত আহরিত জ্ঞান ও তথ্যের সহায়তায় মার্কস সর্বহারার একনায়কত্বের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা সাকার হল বিংশ শতাব্দীতে। তাই মার্কসকে এই শতাব্দীর "পয়গম্বর" আখ্যা দেওয়া অত্যুক্তি নয়।

কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্বের যে সমস্যা, মার্কসের পক্ষে তার অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভবপর হয়নি। পরবর্তী পুরুষ সর্বদাই পূর্ববর্তী পুরুষ থেকে অধিকতর অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী হয়। তাই এর অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন গান্ধীজী। মানুষের চিরন্তন মুক্তিযাত্রারূপী গঙ্গাধারা সর্বহারার একনায়কত্বরূপী মহাদেবের জটাজাল পর্যন্ত পৌঁছে যেখানে পথ হারিয়ে ফেলল, সেখান থেকে তাকে মুক্ত করে আবার বহমান করার কাজ করলেন এই শতাব্দীর ভগীরথ গান্ধী। বিংশ শতাব্দীর মানুষকে মার্কসবাদ থেকে মার্কস-উত্তর একবিংশ শতাব্দীতে উত্তরণের পথের সন্ধান দেবার জন্য গান্ধীজী তাই আগামী শতাব্দীর "পয়গম্বর"।

বিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদের প্রবল প্রতাপ ইতিহাসের শেষ কথা নয়। কংসের রাজত্বকালেই যেমন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃদ্ধি, পুঁজিবাদের মধ্যেই যেমন তার স্ববিরোধের জন্য সমাজবাদের বীজ বিদ্যমান, মার্কসবাদের ফলিত রূপের ভিতরও তেমনি তার স্ববিরোধের জন্য সর্বোদয়ের ভ্রূণ রয়েছে। অহিংসা ও বিকেন্দ্রীকরণ ভিত্তিক গান্ধীর এই সর্বোদয়ের পথে আগামী শতাব্দীতে বিশ্ববাসীকে যে আসতেই হবে তার নিদর্শন ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। তবে তার পূর্বে হয়ত আরও অনেক স্বেদ ও রক্ত ঝরাতে হবে মানুষকে এবং মানুষের ইতিহাসে এই দুঃখের শিক্ষারও মূল্য আছে।

পরিশিষ্ট ৮

অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শ

—সি. অচ্যুত মেনন

ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সার্বজনীন জীবনে গান্ধীজীর অবদান-সমূহের মধ্যে অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণাও পড়ে। আজকাল এবিষয়ে কদাচিৎ কোন কিছু শোনা যায় বা চিন্তা করা হয়। সে কালে এ ব্যাপার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—সঙ্গে সঙ্গে বিতর্কমূলক বিষয়ও ছিল অবশ্য।

সেকালের ৩৫ কোটি ভারতবাসীর কাছে উইনস্টন চার্চিলের সেই কুখ্যাত উক্তি—"অর্ধনগ্ন ফকির" একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিল। ভারতবাসীদের মনে গান্ধীজী সম্বন্ধে ঐ উক্তি যথেষ্ট বিরূপতার সৃষ্টি করেছিল এবং ইউরোপীয় পোশাক ও আচার-ব্যবহারের প্রতি একটা অন্ধ বিদ্বেষেরও জন্ম দিয়েছিল। "অন্ধ" শব্দটি আমি বিচার-বিবেচনা করেই প্রয়োগ করেছি। সেই বিদ্বেষের মূল প্রেরণা স্বাস্থ্যকর ও যথার্থ হলেও তার ভিতর কয়েকটি অন্যায় দিক ও বাড়াবাড়িও ছিল।

শীতকালেও গান্ধীজী কোন জামা পরবেন না, শুধু একটি শাল ব্যবহার করবেন—এই উদাহরণটি নেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এ উদাহরণ এমন নয় যা সাধারণ মানুষ সহজে অনুসরণ করতে পারে। আর এর অনুকরণ করলে কোন লাভও হত না।

গান্ধীজীর ক্ষেত্রে অবশ্য এর যৌক্তিকতা ছিল। কারণ তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের ৩৫ কোটি দরিদ্রের প্রতীক, যাঁদের মুক্তির জন্য তিনি সংগ্রাম করছিলেন। অপর কোন তাৎপর্য ছিল না এর। তাঁর বদলে এমন কেউ যদি একাজ করতেন যিনি সেই মর্যাদা অর্জন করতে পারেন নি তাহলে লোকে তাঁকে বিদ্রূপ করত।

বাকিংহাম প্রাসাদের সংবর্ধনা-সভাতে যাবার সময়ও গান্ধীজী এই একই পোশাক পরেছিলেন। পূরা জগতের দৃষ্টি এই ঘটনার দিকে আকৃষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির ভিতরও চাঞ্চল্য-শিহরণ সৃষ্টি করল। যেসব ঘটনায় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে জনসাধারণের আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধীনতাপ্রেম জেগে ওঠে এটি হল তার মধ্যে অন্যতম।

জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা থেকে এর জন্ম—এই হল এর গুরুত্ব। ভারতের জনগণ ব্রিটিশ রাজত্বের কোন মূল্য দেয় না—এ ছিল তারই ঘোষণা।

তবে অনাড়ম্বর জীবনের মূলতত্ত্ব ভিন্ন। এর আদর্শ হল জনসাধারণ—বিশেষ করে নিপীড়িত ও অত্যাচারিত জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। জীবনের ছলনা, বাহ্যাড়ম্বর ও অহমিকার বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি অংশ এ।

গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার একটি অপরিহার্য শর্ত হল এই যে, যে-জনসাধারণকে আমরা সংগঠিত ও পরিচালিত করতে চাই তাঁদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসা। তাঁদের দুঃখজনক জীবনযাত্রার অনুকরণ-প্রয়াস এরই একটা অঙ্গ।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে সমগ্র ভারতবর্ষ সফর করার সময় গান্ধীজী রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন। তাঁর গুরু গোখলের পরামর্শে তিনি এই ভাবে ভারত সফর করেন। সেই সময় থেকে তিনি স্বয়ং জনসাধারণের কৃচ্ছ্রতামূলক জীবনযাত্রা-পদ্ধতির অনুসরণ করে তাঁদের একজন হবার চেষ্টা করেন।

তাঁর অনুগামীদের মধ্যে কেউ তাঁর মত অতটা যেতে রাজী না হলেও মোতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ ও ভূলাভাই দেশাই-এর মত নেতৃবর্গ যাঁরা রাজার মত বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরাও স্বেচ্ছায় তাঁদের ধন-সম্পত্তির অধিকাংশ ঐ আদর্শের বেদীমূলে উৎসর্গ করেন।

সে যুগে কংগ্রেস যে বিপুল জনসমর্থন পেয়েছিল তার অন্যতম কারণ হল কংগ্রেস নেতৃবর্গের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। আজ কিন্তু কংগ্রেস যে পরিমাণে গান্ধীজীর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শ বর্জন করেছে সেই পরিমাণে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

তবে একথা কেবল কংগ্রেস সম্বন্ধেই সত্য নয়। কেরলের যে কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত শক্তিশালী জনসমর্থন সংগঠিত করেছে তার সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। একথা স্বীকার করতে হবে যে ১৯৪৮—৫০ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি কয়েকটি ভুল করেছিল। তবে সেই আত্মগোপন করে থাকার সময়কার অস্বাভাবিক পরিস্থিতি শত শত কমিউনিস্টকে দরিদ্র ও পদদলিত মানুষদের জীবনযাত্রার ভাগীদার হতে বাধ্য করেছিল।

তাদের ঘরে সেই গরীবের খাদ্য খেয়ে, ছোট্ট তেলের কুপির ম্লান আলোতে পড়াশুনা করে, মাদুর অথবা খালি মেঝেতে শুয়ে এবং আশ্রয়দাতা দরিদ্র পরিবারের শিশুদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে সেই সব কমিউনিস্টরা সেই সময় পার্টির জন্য সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন।

এই যে কাল—স্বয়ং কমিউনিস্টদের মতেই যা তাঁদের সবচেয়ে বড় ভ্রান্তির কাল—এর পর পার্টি পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠে দাঁড়াল। এ এক বাস্তব তথ্য—যদিও আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী।

আজ কিন্তু কমিউনিস্টরাও সেই শিক্ষা ভুলে গেছেন। শোনা যায়, বহু কমিউনিস্ট বিধান-সভা-সদস্যদের মোটরগাড়ী, বড় বড় বাড়ী ও অন্যান্য সম্পত্তি আছে। কোন কোন কমিউনিস্ট তাঁদের ছেলেমেয়েদের বড় বড় পা ব্লক স্কুলে পাঠান। কংগ্রেসেরই মত পরিবর্তন!

রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি যে বিপুল জনসমর্থন পেয়েছিল তার অন্যতম কারণ হল জনগণের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ একাত্মতা। বলশেভিকরা অনশন অথবা প্রার্থনায় বিশ্বাস করতেন না। তবে তাঁরা নিশ্চয় বিশ্বাস করতেন যে, বিপ্লবের সাফল্যের জন্য অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা অপরিহার্য শর্ত।

এদেশের সবরমতী অথবা সেবাগ্রাম আশ্রমের সঙ্গে স্মলনে ও ক্রেমলিনে লেনিনের বাসস্থানের কোন বাহ্য সাদৃশ্য ছিল না। কিন্তু উভয়ের ভিতরে ছিল বিস্ময়কর একরূপতা। বিপ্লবের পর লেনিন ও অপরাপর বলশেভিক নেতৃবৃন্দ সরকারী নেতা রূপে কেমন ভাবে থাকতেন সে সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত।

বিখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক আলবার্ট রীড বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 'লেনিন অ্যাণ্ড হিজ ডুইংস' পুস্তকে তিনি এজাতীয় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

স্মলনেতে লেনিন খেতেন বাঁধাকপি ও বীটের স্যুপ, কাল রুটি, পরিজ ও চা। মনে রাখতে হবে যে রাশিয়ার মত শীতপ্রধান দেশে মাংসবিহীন খাদ্যের কথা চিন্তাই করা যায় না। এ সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে লেনিন এই খাদ্য খেতেন।

কোন কোন দিন এটুকুও খেতে ভুলে যেতেন তিনি। স্ত্রী ক্রুপস্কায়া চা নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে বলতেন, "চা খেতে ভুলো না যেন"। কখনও কখনও

তাঁর চায়ে চিনিও জুটত না। কারণ একজন সাধারণ রুশ নাগরিক যে সীমিত রেশন পেতেন লেনিন তার বেশী নিতেন না।

সাধারণ রুশ সৈনিকের মত লেনিন ও তাঁর স্ত্রী সে সময় লোহার খাটে শুতেন। স্থির হয়েছিল যে দেশের সর্বোচ্চ মাসিক বেতন গড়পড়তা শ্রমিকের আয় মোটামুটি ৬০০ রুবলের বেশী হবে না।

একবার আততায়ী দ্বারা আক্রান্ত হবার পর লেনিনকে কিছু দিনের জন্য হাসপাতালে থাকতে হয়। সুস্থ হয়ে আবার কাজকর্ম শুরু করার সময় চিকিৎসকেরা তাঁকে উচ্চ ভিটমিনযুক্ত আহার্য গ্রহণের পরামর্শ দেন। দৈনন্দিন রেশনে সেসব খাদ্য পাওয়া যেত না, মিলত শুধু কালবাজারে। লেনিন তাই সেসব খেতে অস্বীকার করলেন। রেশনবহির্ভূত কোন জিনিস তিনি খাবেন না বলে জানিয়ে দিলেন।

যাই হোক তাঁর স্ত্রী ও ভগিনী এর একটা উপায় বার করলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় লেনিন যে রুটি খেতেন তা তাঁর কাজ করার টেবিলের ড্রয়ারে রাখা থাকত। তাঁরা ড্রয়ারে বেশী পরিমাণ রুটি রেখে দিতেন। কর্মমগ্নতার জন্য লেনিনের পক্ষে তা খেয়াল করা সম্ভব হত না। লেনিন সম্বন্ধে এ জাতীয় অনেক কাহিনী আছে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে এটা কি সঠিক কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী? কেবল গান্ধীজী এ জাতীয় অনাড়ম্বর জীবনের কথা প্রচার ও আচরণ করলে কোন কোন কমিউনিস্ট যে একে "বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকতা" আখ্যা দিতেন এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু বলশেভিকরা ও তাঁদের নেতা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিনও এতদনুযায়ী আচরণ করেন। একে কি করে "বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকতা" মনে করা যায়?

আসল কথা হচ্ছে এই যে, লেনিন হন অথবা গান্ধীজী, সমাজ পরিবর্তনের জন্য যাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করেন এবং যাঁরা যথার্থই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার তাঁদের পক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হবার প্রক্রিয়ার এই মূল নীতিকে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

অনাড়ম্বর জীবন, সাধারণ মানুষের জীবন, জনসাধারণ থেকে নিজেকে যেসব জিনিস বিচ্ছিন্ন করে তা বর্জন—এসব জীবনের অতীব মূল্যবান

ধ্যান-ধারণা। এছাড়া সমাজ-পরিবর্তনকারীদের পক্ষে সমাজপরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়।

এর পর অবশ্য সময় ও পরিস্থিতি দুই-ই বদলে গেছে। আজকের জীবনে গান্ধীজীর আদর্শকে রূপায়িত করতে হলে এর সময়োচিত কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সেকালে গান্ধীজী যে ধরনের সংগঠন করেছিলেন তার আর দরকার না হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদীরা যখন জনসাধারণকে জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য পেতে দিত না, তখন তার দরকার ছিল। স্বাধীন ভারতে আমরা সরকারকে দিয়ে এসব কাজ করাতে পারি।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অপরিবর্তিত আছে: সমাজপরিবর্তনের একটি আন্দোলন অথবা দলপরিচালনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যদি আপনাদের মনে প্রত্যয় জেগে থাকে তাহলে উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত এর কর্মীদের কোন-না-কোন ধরনের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মান গ্রহণ করতে হবে। স্থান কাল অনুসারে এই মানের পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু এর মূল তত্ত্ব হবে অপরিবর্তনীয়।

ধরুন বিপ্লবে অর্থাৎ সমাজপরিবর্তনে বিশ্বাসী কোন কমিউনিস্ট বিধানসভার সদস্য হলেন। পার্টির পুরা সময়ের কর্মী হবার জন্য তাঁর আয়ের অপর কোন সূত্র নেই। 'সুতরাং বিধানসভার সদস্যরূপে যা পাওয়া যায় তা তিনি অবশ্যই নেবেন। তবে অতিরিক্ত অর্থ-উপার্জন অথবা বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য তাঁর বিধানসভার সদস্যপদকে কাজে লাগান অত্যন্ত অনুচিত। কংগ্রেসকর্মীরা ও কংগ্রেস ঠিক এইটাই করেছিলেন।

আমার আশঙ্কা যে কমিউনিস্টরাও সেই পথে চলেছেন। এইজন্য আমি এই পঙ্‌ক্তিগুলি লিখলাম। গান্ধী-শতবার্ষিকীর এই বছরে আমাদের সার্বজনীন জীবনের এই দিকটি আমরা যেন বিস্মৃত না হই। আমার নম্র অভিমত হচ্ছে এই যে, এমনকি যাঁরা নিজেদের গোঁড়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মনে করেন তাঁদেরও গান্ধীজীর কাছ থেকে বহু কিছু শিক্ষণীয় আছে।

মেনস্ট্রীম, ১৩. ১২. ১৯৬৯

———

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

অনুবাদ

মহাত্মা গান্ধীর	আমার ধ্যানের ভারত
	ছাত্রদের প্রতি
	শিক্ষা
	আমার ধর্ম
	আমার জীবন কাহিনী
	পল্লী পুনর্গঠন
	সত্যাগ্রহ
আইনস্টাইনের	জীবন-জিজ্ঞাসা
আলডুস হাক্সলের	বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি
	এপ এ্যাণ্ড এসেন্স

মৌলিক রচনা

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

সত্যাগ্রহের কথা

গান্ধীজীর গঠনকর্ম

সম্পাদনা

M. K. Gandhi	My Non-violence
Albert Einstein	My Views
শতবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি	গান্ধী-পরিক্রমা
	গান্ধী-রচনা-সম্ভার (দ্বিতীয় খণ্ড)

ভারতবর্ষের মত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মার্কসের অনুগামীরা আজ বহু পন্থে বিভক্ত এবং এদেশের মত বিশ্বের রঙ্গমঞ্চেও মার্কসবাদীরা শুধু বহু মৌলিক সমস্যা সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী অভিমতই পোষণ করেন না, সময়ে একই গুরুর নাম নিয়ে শিষ্যদের প্রচণ্ড সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেও দেখা যায়। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে এবং বিশেষ করে বিপ্লব-পূর্ব সমাজের অবস্থার বিশ্লেষণ এবং বিপ্লবকে মূর্ত করার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মার্কসবাদীরা মোটামুটি একমত। মার্কসীয় তত্ত্ব-দর্শনের মূল কথা অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, শ্রেণী-সংগ্রাম, সশস্ত্র বিপ্লবের পথে সমাজবাদ ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে কি এদেশের কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পর যুযুধান মার্কসবাদীদের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য আছে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রারব্ধ মহাত্মা গান্ধীর পন্থার ভিতর কোথায় পার্থক্য এবং মার্কস ও গান্ধী উভয়ের মূল প্রেরণা মানব-কল্যাণ হওয়া সত্ত্বেও মার্কসবাদকে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে না। উভয় মতবাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সম্ভব, তার মনোজ্ঞ আলোচনা এই গ্রন্থ। বিশ্বের নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুমুখী আবিষ্কার মানব-সমাজের হাতে তার অগ্রগতির উপযুক্ত উন্নততর উপায় নিত্য তুলে দিচ্ছে, তখনও এক শতাব্দীরও পূর্বেকার পুঁথিপত্রকে জ্ঞানের উদ্বর্তনের শেষ কথা বলে মনে করা কি চক্ষু নিমীলিত করে সূর্যকে অস্বীকার করার প্রয়াসের মত অবাস্তবতা নয়—এই কথা সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির প্রতিটি ছাত্রের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে মানব-সমাজের অগ্রগতির পথের সার্থক ইঙ্গিত দেবে এই **গান্ধী ও মার্কস** গ্রন্থ।

দাম : পাঁচ টাকা মাত্র